আধুনিক বাংলা সাহিত্যে দৃষ্টিহীনতা প্রসঙ্গ: চর্চা, অবস্থান ও সমাজমনস্কতার পাঠ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদে
পিএইচ.ডি উপাধি প্রাপ্তির জন্য প্রদত্ত গবেষণাপত্র

গবেষক

সঞ্জীব রজক

রেজিস্ট্রেশন নম্বর: A00CL1600515

তত্ত্বাবধায়ক

ড. ইন্সিতা হালদার

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা- ৭০০০৩২
২০২৩

Certified that the Thesis entitled

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে দৃষ্টিহীনতা প্রসঙ্গ: চর্চা, অবস্থান ও সমাজমনস্কতার পাঠ submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the supervision of Dr. Epsita Halder, Associate Professor, Department of Comparative Literature, Jadavpur University, Kolkata – 700032. And that neither this Thesis nor any part of it has been submitted before for any Degree or Diploma anywhere/elsewhere.

Countersigned by the

Supervisor: **Candidate:**

Dated: **Dated:**

আলাপন

"চোখের আলোয় দেখেছিলেম চোখের বাহিরে।
অন্তরে আজ দেখব, যখন আলোক নাহিরে।।"

পৃথিবীতে এমন অনেক মানুষ ছিলেন যারা চোখের আলোর জগৎ থেকে চিরনির্বাসিত। জীবন ও জগৎকে দেখেছেন অন্তরের আলো দিয়ে। তাদের জীবন আলোকময়। তাদের জীবনের আলো আমাদের জীবনে প্রেরণার উৎস। হোমার, মিলটন, হেলেন কেলার, লুই ব্রেল যেন এক-একটি প্রতিস্পর্ধী আলোর নাম। আমি একজন সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন ব্যক্তি। ছোটোবেলায় পাড়ার এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক বলেছিলেন, দেখতে না পেলে পড়বে কী করে? কথাটা সেদিন বিশ্বাস করতে পারিনি। যদিও সেদিন বিশেষ শিক্ষা আর সাধারণ শিক্ষার পার্থক্য আমি জানতাম না। তবে এটুকু বুঝেছিলাম আমি অন্যদের চেয়ে আলাদা।

একদিন সত্যি এক বিশেষ বিদ্যালয়ে আমার শিক্ষাজীবনের পথ চলা শুরু হলো। তারপর কত উত্থান-পতন বর্ধমান ব্লাইণ্ড এ্যাকাডেমি থেকে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন এবং শেষ পর্যন্ত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। বর্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন পিএইচ.ডি গবেষক। তখন আমি যাদবপুরের বাংলা বিভাগের এম.এ ক্লাসের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র, গবেষণাসন্দর্ভ রচনার অভিজ্ঞতা সেই প্রথম। বাংলা বিভাগের কাফিদার ছত্রছায়ায় প্রথম গবেষণাপত্র লিখতে শিখলাম। তারপর পড়াশোনায় ক্ষান্ত দিয়ে শিক্ষকতার চাকরি বেছে নিলাম। এরপর পরপর দু'বার যাদবপুরের বাংলা ও তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে এম.ফিল-এ ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেয়েও ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু শিক্ষকতার মধ্যেও স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। উচ্চশিক্ষা লাভের স্বপ্ন আমাকে টানছে। তৃতীয় বার সুযোগ আর হাত ছাড়া করিনি,

ভর্তি হয়ে গেলাম। তবে তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে। নিয়ম মাফিক দুটো সেমিস্টার ফুরিয়ে গেল। তারপর এলো তত্ত্বাবধায়ক নির্ধারণের পালা। স্বাভাবিকভাবে বিষয়ের কথা এসে পড়ে। আমার বিষয় 'নির্বাচিত বাংলা ছোটোগল্পে দৃষ্টিহীনদের চর্চা ও অবস্থান: সমাজমনস্কতার পাঠ' বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে-পড়তে, কর্মস্থলে চাকরি করতে-করতে কিছু প্রশ্ন আমাকে বারবার ভাবিত করেছে - প্রতিবন্ধী কারা? দৃষ্টিহীনতা আর অক্ষমতা কি একই? দৃষ্টিহীনরা কি সত্যি অন্যদের চেয়ে আলাদা? তাই এমন একটি বিষয় নির্বাচন করলাম। কিন্তু আমার তত্ত্বাবধায়ক হবেন কে? এমন সময় স্যমন্তকদা এগিয়ে এলেন, অধ্যাপক স্যমন্তক দাস-যার কাছে আমার মাথা নত। সত্যি বলতে কি তিনি আমাকে রক্ষা করলেন।

অধ্যাপক স্যমন্তক দাস (স্যমন্তকদার) ছত্রছায়ায় একদিন গবেষণাপত্র শেষ করলাম। কিন্তু মনের মধ্যে খটকা রয়ে গেল। গবেষণার পথে আরো কিছু দূর এগোতে হবে। তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে পিএইচ.ডির জন্য আবেদন করলাম। সুযোগও এসে গেলো কিন্তু বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি পাওয়া গেল না। তবু শর্ত সাপেক্ষে আমাকে ভর্তি নেওয়া হলো। তখনও জানি না আমাকে আইনের দ্বারস্থ হতে হবে কি না। এমন সময় অধ্যাপনার সুযোগ এসে গেলো। নতুন কর্মস্থলে যোগদানের পর প্রয়োজনীয় অনুমতি পাওয়া গেল। প্রায় তিন বছর পর আমি নিশ্চিন্ত হলাম যে, গবেষণাপত্র জমা দিতে পারব। স্যমন্তক দাস আরো একবার আমাকে নিশ্চিন্ত করলেন আমার তত্ত্বাবধায়ক হওয়ার দায়িত্ব নিয়ে।

একদিন আকস্মিকভাবে স্যমন্তকদা চলে গেলেন, যাকে বলে প্রয়াত হওয়া। আমি অকূল সমুদ্রে পড়লাম। আমার গবেষণার কি হবে? এমন পরিস্থিতিতে তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ আমার পাশে দাঁড়াল। বিভাগীয় প্রধান আমাকে আশ্বস্ত করলেন। বিভাগের পক্ষ

থেকে অধ্যাপিকা ইন্সিতা হালদারকে আমার তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হল। তিনি সাদরে সেই দায়িত্ব স্বীকার করে নিলেন। তার জন্য তার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ।

আমি কখনো লক্ষ্যচ্যুত হইনি। নানান ব্যক্তিগত ও পরিবেশগত ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও গবেষণার প্রস্তুতি চালিয়ে গেছি। পূর্বোক্ত গবেষণার বিষয়টিকে আরো বিশদ ও বিস্তৃত করার উদ্দেশ্যে এবং অমীমাংসিত প্রশ্নগুলিকে একটি তাত্ত্বিক কাঠামোর মধ্যে ধরার তাগিদ থেকে বাংলা সাহিত্যকে নির্বাচন করেছি। বারবার ছুটে গেছি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রিয় গ্রন্থাগারে, কখনো কলেজস্ট্রিটের বইপাড়ায়, কখনো আবার বইমেলা চত্বরে। দৃষ্টিহীন চরিত্র আছে এমন গল্প-উপন্যাস অনুসন্ধানের পাশাপাশি প্রতিবন্ধী চর্চার সঙ্গে যুক্ত নানান ব্যক্তি ও সংগঠনের দ্বারস্থ হয়েছি বারবার। ছুটে গেছি নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন ব্লাইণ্ড বয়েজ এ্যাকাডেমিতে, ব্লাইণ্ড পারসন এ্যাসোসিয়েশনে, কখনো আবার গণেশচন্দ্র এভিনিউে হ্যান্ডিক্যাপড কমিশনারের দপ্তরে। কখনো ফোনে, কখনো সরাসরি কথা বলেছি অধ্যাপক ফাল্গুনি ভট্টাচার্য, *স্পর্শনন্দন* পত্রিকার সম্পাদক সত্যজিৎ মণ্ডল মহাশয় এবং যাদবপুরের এডুকেশন বিভাগের অধ্যাপক বিষ্ণুপদ নন্দ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে। প্রস্তুতি পর্বের অনেকগুলি ধাপ অতিক্রম করে তত্ত্বাবধায়কের পরামর্শ ক্রমে গবেষণাসন্দর্ভটি লেখা শেষ করেছি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যে দৃষ্টিহীনতা প্রসঙ্গ: চর্চা, অবস্থান ও সমাজমনস্কতার পাঠ' শীর্ষক গবেষণাসন্দর্ভটি প্রদত্ত হলো। সাধ্য মতো অনুসন্ধান ও পঠন-পাঠনের ভিত্তিতে গবেষণাপত্রের রূপরেখা নির্মাণের চেষ্টা করেছি। তবু কিছু ভুল-ত্রুটি হয়তো রয়ে গেলো। শেষ কথা বলার ক্ষমতা আমাদের নেই, তা আছে হয়তো মহাকালের।

এবার ঋণ স্বীকারের পালা। আমার পূর্বতন তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক স্যমন্তক দাস মহাশয় তার নানান ব্যস্ততার মধ্যেও গবেষণার প্রতিটি পর্যায়ে আমাকে দিশা দেখিয়েছেন,

তাকে জানাই আমার আন্তরিক প্রণাম। গবেষণার মাঝপথে ইন্সিতাদি আমার তত্ত্বাবধায়ক হওয়ার দায়িত্ব নিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞ করলেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রিয় গ্রন্থাগারিক আমাকে গবেষণার প্রতিটি পর্যায়ে বইপত্র দিয়ে সাহায্য করেছেন তার কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবন্ধী চর্চার সাথে যুক্ত অধ্যাপক বিষ্ণুপদ নন্দ মহাশয় এবং অধ্যাপক মনোজিৎ মণ্ডল মহাশয় আমাকে নানাভাবে তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন তাদের প্রতি রইল আমার প্রণাম। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক সুমিত বড়ুয়া মহাশয় আমাকে নানাভাবে গবেষণা-সন্দর্ভ রচনার ব্যাপারে পরামর্শ দিয়েছেন তার জন্য তাকে জানাই আমার কৃতজ্ঞতা। দৃষ্টিহীনদের সাহিত্যসংস্কৃতি চর্চার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সত্যজিৎ মণ্ডল, তারক হালদার, সৈকত কর মহাশয় আমাকে মূল্যবান সাক্ষাৎকার দিয়ে বাধিত করেছেন। দৃষ্টিহীনদের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন ব্লাইণ্ড বয়েজ অ্যাকাডেমির অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ ঘোষ মহাশয় এবং ব্লাইণ্ড পারসন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নারায়ণ গাঙ্গুলী মহাশয় তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞ করেছেন। প্রতিষ্ঠিত দৃষ্টিহীন ব্যক্তিদের মধ্যে অধ্যাপিকা দেবকি মণ্ডল, শিক্ষক সুরজিৎ বিশ্বাস, শিক্ষক হরিপদ হাজরা, বন্ধু আসিফউজ্জামান আমাকে তাঁদের মূল্যবান মতামত দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন। এদের প্রত্যেককে জানাই আমার শুভেচ্ছা। সুশীল কর কলেজের অধ্যক্ষ মানস অধিকারী মহাশয়কে জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। সুশীলকর কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান রূপা চট্টোপাধ্যায় মহাশয়া আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন তার প্রতি রইল আমার কৃতজ্ঞতা। বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা সুনন্দা হালদার, মুনমুন বিশ্বাস এবং স্বপন সর্দার মহাশয়ের কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপিকা শম্পা দাস আমাকে নানাভাবে উৎসাহ দিয়েছেন তার প্রতি রইল আমার শুভেচ্ছা। কলেজের অন্যান্য সহকর্মীবৃন্দের কাছেও আমি নানাভাবে

কৃতজ্ঞ। আমার নিকটবন্ধু দেবদীপ ধীবর, অমিত কুমার নন্দী এবং বন্ধু ও প্রকাশক অরেন্স মহালদার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমার পাশে দাঁড়িয়েছে তাদের প্রতি রইল আমার শুভেচ্ছা। প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে দীপঙ্কর বৈদ্য, সৌমেন মণ্ডল, প্রজ্ঞা দেবনাথ, পুষ্পিতা মণ্ডল, মধুমিতা গাঙ্গুলী মূল পাঠগুলিকে শ্রুতিমাধ্যমে রূপান্তরিত করতে সাহায্য করেছে, তাদের নবাগত ভবিষ্যতের প্রতি রইল আমার শুভেচ্ছা। আমার সহযোগী শান্তনা হালদার গবেষণার নানা পর্যায়ে আমাকে যথার্থ সহকারীর মতো সহযোগিতা করেছে, তাঁকে জানাই আমার শুভেচ্ছা। আমার একমাত্র কন্যা সহজিয়ার প্রতি রইল আমার ভালোবাসা। আমার পরিবার এবং আমার স্ত্রীর পুরো পরিবার আমাকে নানাভাবে উৎসাহ দিয়েছে ও সহযোগিতা করেছে। আমার মা মীনা রজক ও শাশুড়ি মা শুভ্রা দত্ত এবং অঞ্জনা দত্তের প্রতি জানাই আন্তরিক প্রণাম। সর্বোপরি আমার স্ত্রী, তৃষ্ণার আমার গবেষণার প্রতিটি কাজে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ হস্তক্ষেপ গবেষণাসন্দর্ভটি রচনার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়ে উঠেছিল। তার জন্য রইল আমার কৃতজ্ঞতা ও শুভকামনা। এছাড়া প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আরো অনেকে সাহায্য করেছেন তাঁদের প্রত্যেকের কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। প্রতিবন্ধকতা এমন একটি সাংস্কৃতিক সমস্যা; দু-একটি গবেষণাসন্দর্ভ তার পক্ষে যথেষ্ট নয়, ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে নানান স্তরে কাজ করার ইচ্ছে রইল।

সবশেষে বলি গবেষণাপত্র নির্মাণকল্পের মুদ্রণের পুরো কাজটাই নিজের হাতে করা। অন্যান্য যান্ত্রিক কাজকর্ম করে দিয়ে সাহায্য করেছে বন্ধু অমিত কুমার নন্দী। তা সত্ত্বেও নিজের সব থেকে ভালোটা দিয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করার পরও যদি কিছু যান্ত্রিক ত্রুটি ও অন্যান্য ভুল-ত্রুটি থেকে যায়, সেজন্য অগ্রিম ক্ষমা প্রার্থনীয়।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় — সঞ্জীব রজক
কলকাতা – ৭০০০৩২ — তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে দৃষ্টিহীনতা প্রসঙ্গ: চর্চা, অবস্থান ও সমাজমনস্কতার পাঠ

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

ভূমিকা ১ – ১২

প্রথম অধ্যায়: প্রতিবন্ধকতার নানা দিক ও দৃষ্টিহীনতা ১৩ – ৪৮

১.১ সূচনা

১.২ প্রতিবন্ধকতা বিচারের নানান মাপকাঠি

১.৩ পরিভাষার অনুসন্ধান

১.৪ প্রতিবন্ধকতার সংজ্ঞা ও স্বরূপ

১.৫ প্রতিস্পর্ধীতার প্রকারভেদ

১.৬ দৃষ্টিপ্রতিস্পর্ধীতার সংজ্ঞা ও স্বরূপ

১.৭ জাতিসঙ্ঘের প্রতিবেদন

১.৮ ভারতীয় আইনে প্রতিবন্ধকতা

১.৯ আর পি ডি অ্যাক্ট ২০১৬

১.১০ প্রতিবন্ধকতার কারণসমূহ

১.১১ অক্ষমতাবিদ্যাচর্চা প্রসঙ্গ

১.১২ ক্ষমতার প্রশ্ন

১.১৩ স্বাভাবিকতা ও নিখুঁত শরীরের ধারণা

১.১৪ ভারতীয় পুরাণ ও মহাকাব্যে প্রতিবন্ধকতার ধারণা

১.১৫ বর্তমান ভারতীয় প্রেক্ষিতে প্রতিবন্ধকতা

১.১৬ বর্ণবৈষম্য ও স্বাভাবিকতার ধারণা

১.১৭ মানবীবিদ্যা ও অক্ষমতাবিদ্যাচর্চা

১.১৮ প্রতিবন্ধকতার সামাজিক গঠন

১.১৯ প্রতিবন্ধকতা বনাম প্রান্তিকতা

১.২০ অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজের ধারণা

১.২১ প্রতিবন্ধীচেতনা ও মানবিক উত্তরাধিকার

১.২২ উপসংহার

দ্বিতীয় অধ্যায়: দৃষ্টিহীনদের সামাজিক অবস্থানের অগ্রগতি ও বিবর্তন ৪৯ – ৮৫

২.১ সূচনা

২.২ পুরাণ ও মহাকাব্যে প্রতিবন্ধীদের অবস্থান

২.৩ সামাজিক প্রবাদ প্রবচনে দৃষ্টিহীনতা প্রসঙ্গ

২.৪ দৃষ্টিহীনদের সম্পর্কে পাশ্চাত্য ধারণা

২.৫ দৃষ্টিহীনদের সম্পর্কে ভারতীয় ধারণা

২.৬ দৃষ্টিহীনদের শিক্ষার ইতিহাসে ব্রেল আন্দোলনের ভূমিকা

২.৭ পাশ্চাত্য ক্ষেত্রে দৃষ্টিহীনদের শিক্ষার ইতিহাস

২.৮ ভারতীয় ক্ষেত্রে দৃষ্টিহীনদের শিক্ষার ইতিহাস

২.৯ পাশ্চাত্য প্রেক্ষিতে দৃষ্টিহীনদের পুনর্বাসনের ইতিহাস

২.১০ ভারতীয় প্রেক্ষিতে দৃষ্টিহীনদের পুনর্বাসনের ইতিহাস

২.১১ দৃষ্টিহীনদের সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার ইতিহাস

২.১২ ভারতীয় প্রেক্ষিতে দৃষ্টিহীনদের নাট্যদলের ইতিহাস

২.১৩ দৃষ্টিহীনদের ক্রীড়াচর্চা

২.১৪ দৃষ্টিহীনদের বিজ্ঞান প্রযুক্তির ব্যবহার

২.১৫ প্রতিবন্ধকতা ও বর্তমান প্রজন্ম: একটি সমীক্ষা

২.১৬ উপসংহার

তৃতীয় অধ্যায়: আধুনিক বাংলা কাব্য ও নাটকে দৃষ্টিহীনতা প্রসঙ্গ ৮৬ – ১০৫

৩.১ সূচনা

৩.২ সাহিত্য সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা

৩.৩ সাহিত্য ও সমাজমনস্কতা

৩.৪ আধুনিক বাংলা কবিতায় দৃষ্টিহীনতা প্রসঙ্গ

৩.৫ সহজ পাঠের আলোচনায় দৃষ্টিহীনতা প্রসঙ্গ

৩.৬ যতীন্দ্রমহন বাগচী: অন্ধ বধূ

৩.৭ রবীন্দ্র নাটকে দৃষ্টিহীনতা প্রসঙ্গ

৩.৮ বিজন ভট্টাচার্য: মরা চাঁদ

৩.৯ উপসংহার

চতুর্থ অধ্যায়: বাংলা উপন্যাসে দৃষ্টিহীনদের চর্চা ও অবস্থান ১০৬ – ১৪৬

৪.১ সূচনা

৪.২ বাংলা উপন্যাসের উদ্ভব ও বিকাশ

৪.৩ বাংলা উপন্যাসে দৃষ্টিহীন চরিত্র

৪.৪ অক্ষমতা বিদ্যাচর্চার মূলকথা

৪.৫ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়: রজনী

৪.৬ অনুরূপা দেবী: মহানিশা

৪.৭ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত: তৃতীয় নয়ন

৪.৮ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুটি উপন্যাস

৪.৯ বিমল কর: পূর্ণ অপূর্ণ

৪.১০ বিমল মিত্র: শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন

৪.১১ নারায়ণ সান্যাল: নীলিমায় নীল

৪.১২ নন্তু সরকার: আলোক অভিসারে

৪.১৩ নীহাররঞ্জন গুপ্ত: লালুভুলু

৪.১৪ সমীর রক্ষিত : অন্ধজন্মান্ধদের কথা অথবা একটি প্রেমের উপাখ্যান

৪.১৫ বাংলা উপন্যাসে প্রতিস্পর্ধিদের উত্তরাধিকার

৪.১৬ উপসংহার

পঞ্চম অধ্যায়: বাংলা ছোটগল্পে দৃষ্টিহীনদের চর্চা ও অবস্থান ১৪৭ – ২০৩

৫.১ সূচনা

৫.২ ছোটগল্পের উদ্ভব ও বিকাশ

৫.৩ বাংলা ছোটগল্পের ক্রমবিকাশ

৫.৪ ছোটগল্পের সংজ্ঞা ও স্বরূপ

৫.৫ বাংলা ছোটগল্পে দৃষ্টিপ্রতিস্পর্ধী কথা

৫.৬ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: দৃষ্টিদান

৫.৭ মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়: সুরের বন্ধু

৫.৮ সীতা দেবী: আলোর আড়াল

৫.৯ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: তমসা

৫.১০ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চারটি গল্পের আলোচনা

৫.১১ সোমেন চন্দ: অন্ধ শ্রীবিলাসের অনেক দিনের এক দিন

৫.১২ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের দুটি গল্পের আলোচনা

৫.১৩ সুবোধ ঘোষ: চোখ গেল

৫.১৪ বিমল কর: দুটি গল্পের আলোচনা

৫.১৫ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী: নদী ও নারী

৫.১৬ সৈয়দ মুজতবা সিরাজ: বুড়াপীরের দরগাতলায়

৫.১৭ সমরেশ বসু: মহাযুদ্ধের পর

৫.১৮ কমলকুমার মজুমদার: আমোদ বোষ্টুমী

৫.১৯ সত্যজিত রায়: গোলকধাম রহস্য

৫.২০ মহাশ্বেতা দেবী: কবিপত্নী

৫.২১ ভগিরথ মিশ্র: দৃষ্টি

৫.২২ নন্তু সরকার: ভুল ছন্দ

৫.২৩ বাংলা ছোটগল্পে প্রতিস্পর্ধীদের উত্তরাধিকার

৫.২৪ উপসংহার

ষষ্ঠ অধ্যায়: দৃষ্টিহীন চরিত্র নির্মাণে বাংলা কথাসাহিত্য ও চলচ্চিত্রের একটি তুলনামূলক আলোচনা ২০৪ – ২১৮

৬.১ সূচনা

৬.২ বাংলা চলচ্চিত্র মাধ্যমে প্রতিবন্ধকতার চর্চা

৬.৩ তপন সিংহ, আঁধার পেরিয়ে

৬.৪ দীনেন গুপ্ত, রজনী

৬.৫ গৌতম ঘোষ, দেখা

৬.৬ কৌশিক গাঙ্গুলীর দুটি সিনেমা

৬.৭ উপসংহার

উপসংহার ২১৯ – ২২৭

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ২২৮ – ২৩৪

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে দৃষ্টিহীনতা প্রসঙ্গ: চর্চা, অবস্থান ও সমাজমনস্কতার পাঠ

ভূমিকা

১ গবেষণাপত্রের এলাকা নির্ধারণ

'আধুনিক বাংলা সাহিত্যে দৃষ্টিহীনতা প্রসঙ্গ: চর্চা, অবস্থান ও সমাজমনস্কতার পাঠ' শীর্ষক যে গবেষণা প্রকল্প গৃহীত হয়েছে তার আলোচনার ক্ষেত্র হলো আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও দৃষ্টিহীনতা। সে প্রসঙ্গে আমরা প্রতিবন্ধকতার নানা দিক ও দৃষ্টিহীনতার সংজ্ঞা ও স্বরূপ নির্ধারণের চেষ্টা করব। সমাজে ও সাহিত্যে দৃষ্টিহীনদের চর্চা ও অবস্থান বুঝে নিয়ে সাহিত্যকারের সমাজমনস্কতা অনুসন্ধান করাই এই গবেষণার উদ্দেশ্য।

২ গ্রন্থসমীক্ষা

বাংলা ভাষা-মাধ্যমে সাহিত্য-কেন্দ্রিক গবেষণা গ্রন্থের অভাব নেই কিন্তু প্রতিস্পর্ধীকেন্দ্রিক গবেষণা গ্রন্থ হাতে গোনা। উক্ত বিষয়ে যে দু'একটি গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে সেখানে সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ বা তাত্ত্বিক অবস্থান থেকে প্রতিবন্ধকতা বিষয়টিকে দেখা হয়নি। তবে বিশ্বের যেকোনো বিষয়ে প্রথম পদক্ষেপ সর্বদাই প্রশংসার দাবি রাখে। যেকোনো বিষয়ে প্রথম পদক্ষেপ থেকেই তার পথ চলা শুরু। তাই প্রথম পদক্ষেপ ব্যতি রেখে এগোনোর উপায় নেই। উক্ত বিষয়ে যে দু'একটি গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তাকে আমরা সাধুবাদ জানাই এবং ভবিষ্যৎ পথ চলার প্রেরণা হিসেবে স্বীকার করি।

২০০৫ সালে অধ্যাপক ফাল্গুনী ভট্টাচার্যের *বাংলা সাহিত্যে প্রতিবন্ধী চরিত্র* নামে একটি গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। যদিও এটি একটি প্রাথমিক পর্যায়ের গবেষণা এবং কাজটি তালিকা ও বিবরণ ধর্মী। তবে বাংলা সাহিত্যে প্রথম প্রতিস্পর্ধীকেন্দ্রিক কাজ হিসেবে তা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং উক্ত বিষয়ে গবেষণার উৎসাহ যোগায়। একই বছর অধ্যাপক বিষ্ণুপদ নন্দ এবং সুলতানা সারাওয়াতারাজ্জামানের যৌথ উদ্যোগে *ব্যতিক্রমধর্মী শিশু* শীর্ষক একটি গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। উক্ত গ্রন্থে শিক্ষাবিজ্ঞানের দিক থেকে নানা ধরনের অঙ্গহানির কারণ, শিখন ও শিক্ষণ সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ২০০৮ সালে পাঁচুগোপাল বক্সী মহাশয়ের *মহাকাব্য ও পুরাণে প্রতিবন্ধী* শীর্ষক একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সেখানেও পৌরাণিক চরিত্রের তালিকা ও ঘটনা বৃত্তান্ত গুরুত্ব পেয়েছে। ২০০৯ সালে বেলা দে লেখেন *বিশ্ববন্দিত প্রতিবন্ধী* শীর্ষক গ্রন্থটি। উক্ত গ্রন্থে সংক্ষেপে বিশ্ববরেণ্য প্রতিস্পর্ধী ব্যক্তিদের জীবনের বিবরণ গুরুত্ব পেয়েছে। গ্রন্থটি যেমন ঐতিহাসিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ তেমনই অঙ্গহানিগ্রস্ত ব্যক্তিদের কাছে প্রেরণাদায়ক। একই বছর অধ্যাপক বিষ্ণুপদ নন্দ এবং সনৎ কুমার ঘোষের যৌথ উদ্যোগে *বিশেষ শিক্ষার ইতিহাস* নামে আরো একটি গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি প্রতিস্পর্ধীদের শিক্ষার ইতিহাসের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। ২০১১ সালে ফাল্গুনী ভট্টাচার্যের *সাহিত্য ও সিনেমায় প্রতিবন্ধী* শীর্ষক গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে সাহিত্যের সাথে সিনেমার তালিকা ও বিবরণ যুক্ত হয়েছে।

বাংলা ভাষায় এ যাবত কাল যেসব প্রতিস্পর্ধী কেন্দ্রিক গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে সেখানে যেমন সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ বা তাত্ত্বিক অবস্থানের জায়গা থেকে প্রতিবন্ধকতা বিষয়টিকে বিচার বিশ্লেষণ করা হয়নি তেমনই প্রতিস্পর্ধী দৃষ্টিকোণ অবহেলিত। উক্ত গ্রন্থগুলিতে সামগ্রিকভাবে প্রতিবন্ধী ও প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে আলোচনা করা হলেও কোনো

একটি নির্দিষ্ট ধরনের প্রতিবন্ধকতা বা অঙ্গহানিযুক্ত মানুষদের সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে গভীর অধ্যয়নের অভাব রয়েছে।

৩ গবেষণা সম্বন্ধীয় প্রশ্ন

কতগুলি সুনির্দিষ্ট প্রশ্নকে সামনে রেখে 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যে দৃষ্টিহীনতা প্রসঙ্গ: চর্চা, অবস্থান ও সমাজমনস্কতার পাঠশীর্ষক গবেষণাটি অগ্রসর হবে। সেগুলি হলো -

i) প্রতিবন্ধকতা কি ও কেমন?
ii) কিভাবে প্রতিবন্ধী ও অপ্রতিবন্ধী দৃষ্টিকোণ গড়ে ওঠে?
iii) সমাজেও সাহিত্যে দৃষ্টিহীনদের অবস্থান কোথায়?
iv) দৃষ্টিহীন চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে সাহিত্যকারগণ কতখানি প্রচলিত মিথ অথবা সমাজমনস্কতার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন?

৪ গবেষণা পদ্ধতি

বাংলা সাহিত্যের সুবিশাল ভাণ্ডারটি অনুসন্ধান করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন লেখক ধরে তাদের রচনাবলী অনুসন্ধান করে দেখা হয়েছে। দৃষ্টিহীন চরিত্র আছে এমন পাঠগুলির তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। তালিকা প্রস্তুতের কাজটি শেষ হলে পাঠগুলি পঠনপাঠন করে তাদের মূল বৈশিষ্ট্য বা বক্তব্যগুলি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। মুল পাঠের কাজটি শেষ হলে উক্ত বিষয়ের ওপর নানান গ্রন্থ বা পত্রপত্রিকায় প্রাপ্ত লেখাগুলি পাঠ ও প্রয়োজনীয় অংশ লিখে রাখা হয়েছে। এরপর দৃষ্টিহীনদের নানান প্রতিষ্ঠান যেমন বিশেষ বিদ্যালয় এবং অন্যান্য অধিকার সুরক্ষা সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে নানান তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী ও অপ্রতিবন্ধী মানুষদের মতামত ও সাক্ষাৎকার সংগ্রহ করে তা বিশ্লেষণ করে দেখা হয়েছে। ভারতীয় সংবিধান ও প্রতিবন্ধী আইনের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এছাড়া উইকিপিডিয়া ও অন্তর্জালের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্য ও আলোচনা প্রয়োজন মত ব্যবহার করা হয়েছে। এইভাবে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির সাহায্যে গবেষণাপত্রের রূপরেখা প্রস্তুত করা হয়েছে।

৫ প্রতিবন্ধকতা বিষয়ক ধারণা

সাধারণভাবে মানুষের কোনো একটি অঙ্গ যদি আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা কার্যক্ষমতা হারায় তাহলে ব্যক্তির এই অবস্থাকে 'প্রতিবন্ধকতা' বলে। এই প্রতিবন্ধকতা যদি শতকরা ৪০ ভাগের বেশী হয় তাহলে চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিভাষায় ওই ব্যক্তিকে 'প্রতিবন্ধী' বলা হয়। প্রতিবন্ধকতার বিভিন্ন ধরণগুলি হলো 'শারীরিক প্রতিবন্ধী', 'দৃষ্টি প্রতিবন্ধী', 'শ্রবণ প্রতিবন্ধী', 'মানসিক' ও 'বহুবিধ প্রতিবন্ধী'। প্রসঙ্গত মনে রাখা প্রয়োজন 'প্রতিবন্ধকতা' বিষয়টিকে সমাজ ইতিহাসের বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণে দেখা হয়েছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে প্রতিবন্ধকতাকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে ধর্মের দিক থেকে। সেখানে প্রতিবন্ধকতা ছিল দেবতা বা ঈশ্বরের অভিশাপ। কোথাও ব্যক্তি বা তার পিতামাতার পূর্বজন্মের কৃতকর্মের ফল। কোথাও আবার শয়তানের অভিশাপ। পাশ্চাত্যের নানান দেশে তাদের বেঁচে থাকার অধিকার পর্যন্ত ছিল না। আধুনিক যুগে বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা প্রসারের দিনে প্রতিবন্ধকতাকে দেখা হয়েছে শারীরিক সমস্যা হিসেবে। এই সময় থেকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ধারণা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে আন্তর্জাতিক মানবতাবাদ প্রসারের যুগে প্রতিবন্ধকতাকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ফলে এর সঙ্গে প্রতিবন্ধী অধিকার আন্দোলন-চেতনার বিকাশ ঘটে।

এ যাবৎকাল চিকিৎসাবিজ্ঞানের দিক দিয়ে বিচার করবার যে রীতি চলে আসছে তাকে নাকচ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে সামাজিক ও পরিবেশগত বিষয়সমূহ তাদের পারস্পরিক প্রভাব প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্ক যুক্ত। আমাদের আলোচ্য দৃষ্টি-প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে কথাটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। কোনো দৃষ্টিহীন ব্যক্তি তার দৃষ্টিহীনতার কারণে সামাজিক ক্রিয়াকলাপে সম্পূর্ণ অংশগ্রহণে যখন বাধাপ্রাপ্ত হন তখন সেক্ষেত্রে

সমাজ ও পরিবেশের মতো বিষয়সমূহ কোনোভাবে উপেক্ষিত হতে পারে না। ভূমিকাতেই বলা ভালো এই 'প্রতিবন্ধী' শব্দটা আমাকে ভাবাচ্ছে। 'প্রতিবন্ধী' কী ও কেমন? এখন প্রশ্ন 'প্রতিবন্ধী' শব্দটির মধ্যে দিয়ে 'প্রতিবন্ধী' নামক যে ধারণা, তার পুরোটাই কি ধরা পড়ে? যদি যায় তাতে কি আত্ম-অবমাননা লুকিয়ে থাকছে না? আসলে 'প্রতিবন্ধী' ধারণাটাই বিভিন্ন ধারণার মতো বদলাচ্ছে। আমরা এই বদলের পক্ষ থেকে বিষয়টিকে দেখতে চাই। তাই 'প্রতিবন্ধী' স্থলে আমরা 'প্রতিস্পর্ধী' বলব।

৬ সাহিত্য সমীক্ষা

যদিও আমাদের মূল আলোচ্য আধুনিক বাংলা সাহিত্য তবু প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য পরম্পরা অনুসন্ধান করলে বেশ কিছু প্রতিস্পর্ধী চরিত্রের দেখা পাওয়া যায়। প্রাচীন ও মধ্যযুগে দেবতা কেন্দ্রিক সাহিত্যচর্চার দিনে পুরাণকার ও মহাকবিগণ বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রতিস্পর্ধী চরিত্র নির্মাণ করেছেন। প্রতিবন্ধী মানুষের শারীরিক প্রতিচ্ছবি ব্যবহার করেছেন কখনো বিশেষ লক্ষণ বা প্রবণতাগুলিকে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে, কখনো আবার বিশেষ প্রতীক বা ব্যঞ্জনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। *মহাভারত* (আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৩০০-৪০০ খ্রীঃ) এর ধৃতরাষ্ট্র রাজপরিবারের সন্তান হলেও জন্মসূত্রে দৃষ্টিহীন। দৃষ্টিহীনতার কারণে সমাজ তাকে রাজা হওয়ার অধিকার দেয় না। *রামায়ণ* মহাকাব্যের (আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ২০০-২০০ খ্রীঃ) অন্ধক মুনি তপস্যার শক্তিতে বলিয়ান হলেও একমাত্র পুত্রকে হারিয়ে অসহায়। পঞ্চদশ শতকের কবি বিজয়গুপ্তের *পদ্মাপুরাণ* (আনুমানিক ১৪৯৩ খ্রীঃ) এর মনসা লিঙ্গগত কারণে নারী আবার দৃষ্টিহীনা। সমাজের উচ্চ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি চাঁদ সওদাগরের সঙ্গে তার অধিকার প্রতিষ্ঠা নিয়ে লড়াই বাধে। সপ্তদশ শতকের কবি দৌলত কাজীর *লোরচন্দ্রাণী* (১৬২১-১৬৩৮ খ্রীঃ) কাব্যে চন্দ্রাণীর স্বামী বামন হওয়ার কারণে তার স্ত্রীকে সুখ ও সুরক্ষা

দিতে ব্যর্থ হয়েছে। বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যের আয়ান ঘোষ তার যৌন প্রতিবন্ধকতার কারণে স্ত্রী রাধার কাছে ব্রাত্য হয়েছে।

আমরা আধুনিক বাংলা সাহিত্যে দৃষ্টিহীনদের চর্চা ও অবস্থান নির্ধারণের চেষ্টা করব। দৃষ্টিহীনদের চর্চা ও অবস্থান পর্যালোচনা করার মধ্যে দিয়ে সমাজমনস্কতার অনুসন্ধান করাই এই গবেষণার উদ্দেশ্য। আধুনিক বাংলা সাহিত্য বলতে আমরা একটি নির্দিষ্ট কালপর্বের সাহিত্যকে ধরার চেষ্টা করব। সাধারণভাবে অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের জয়যাত্রা শুরু হয়েছে বলে মনে করা হয়। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সূচনা পর্ব থেকে 'প্রতিস্পর্ধী' কেন্দ্রিক সাহিত্য ভাবনা লক্ষ করা যায়। হয়তো সাহিত্যের প্রয়োজনে আর পাঁচটা চরিত্রের মতো 'প্রতিস্পর্ধী' মানুষের কথা উঠে এসেছে। এর আড়ালে থাকতে পারে লেখকের অন্য কোনো উদ্দেশ্য বা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির অভিব্যক্তি। বঙ্কিমচন্দ্রের (১৮৩৮-১৮৯৪ খ্রীঃ) *রজনী (১৮৭৭ খ্রীঃ)* উপন্যাসটি 'প্রতিস্পর্ধী' কেন্দ্রিক সাহিত্য ভাবনার প্রথম উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। *রজনী* উপন্যাসের রজনী দৃষ্টিজনিত প্রতিস্পর্ধী। লেখক তার ব্যক্তিগত জগৎ, সামাজিক ও ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব, তার জীবন-সমস্যার কথা সহৃদয়ভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। এর প্রায় পঞ্চাশ বছর পর ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত অনুরূপা দেবীর (১৮৮২-১৯৫৮ খ্রীঃ) *মহানিশা* (১৯১৯ খ্রীঃ) উপন্যাসে আমরা ধীরা নামের এক দৃষ্টিহীন চরিত্রের দেখা পাচ্ছি। তবে লেখিকা তার চরিত্রের সম্ভাবনা অপেক্ষা সহানুভূতির দিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। কোনো কোনো উপন্যাসে দৃষ্টিহীনতাকে নানান প্রতীকী অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের (১৯০৩-১৯৮৬ খ্রীঃ) *তৃতীয় নয়ন* (১৯৩৩ খ্রীঃ) এবং বিমল করের (১৯২১-২০০৩ খ্রীঃ) *পূর্ণ অপূর্ণ* (১৯৮৯ খ্রীঃ) ও সমীর রক্ষিতের *অন্ধজন্মান্ধদের কথা অথবা একটি প্রেমের উপাখ্যান* (২০১৬ খ্রীঃ) এ জাতীয় সাহিত্যের নিদর্শন। তবে এসবের মধ্যেও লেখকদের সমাজমনস্কতা কোনো-কোনো ক্ষেত্রে

লক্ষ করা গেছে। ২০১২ সালে প্রকাশিত নীহাররঞ্জন গুপ্তের (১৯১১-১৯৮৬ খ্রীঃ) *লালুভুলু* (২০১২ খ্রীঃ) এবং নন্তু সরকারের (১৯৫০ খ্রীঃ) *আলোক অভিসারে* (১৯৯৪ খ্রীঃ) উপন্যাসগুলি প্রতিস্পর্ধীকেন্দ্রিক উপন্যাসের ধারায় ব্যতিক্রমী সৃষ্টি এবং বাংলা উপন্যাসের উজ্জ্বল সংযোজন।

বাংলা ছোটোগল্পের ক্ষেত্রে আমরা প্রথম দৃষ্টিহীন চরিত্রের দেখা পাচ্ছি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১ খ্রীঃ) 'দৃষ্টিদান' (১৩০৫) গল্পে। এই গল্পে দৃষ্টিহীন কুমুর কথা উঠে আসছে। তার দৃষ্টিহীনতা কিভাবে দাম্পত্য জীবনে সমস্যা সৃষ্টি করে এবং নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে শেষ পর্যন্ত তার আদর্শবাদী জয়ী হয়েছে সেটাই এই গল্পের মূল উপজীব্য। প্রসঙ্গত বলে রাখা প্রয়োজন যে, বাংলা সাহিত্যে কাব্য ও নাটকের ক্ষেত্রে দৃষ্টিহীনতার প্রসঙ্গ প্রথম পাওয়া যাচ্ছে রবীন্দ্রসাহিত্যে। শিশুপাঠ্য *সহজ পাঠ* এর দৃষ্টিহীনদের পথে-পথে গান শুনিয়ে ভিক্ষা করার প্রসঙ্গ রয়েছে। তার *ফাল্গুনী* (১৯১৬ খ্রীঃ) নাটকে অন্ধ বাউল নামে এক চরিত্রের দেখা পাচ্ছি যে, তথাকথিত দৃষ্টিমানদের তুলনায় সজাগ দৃষ্টিসম্পন্ন। 'গান্ধারীর আবেদন' কাব্যনাট্যেও পৌরাণিক ধৃতরাষ্ট্র এবং স্বেচ্ছায় দৃষ্টিহীনতাকে বেছে নিয়েছে এমন এক নারী চরিত্র গান্ধারীর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।

রবীন্দ্রোত্তর যুগের কথাকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯১০-১৯৫৬ খ্রীঃ) দৃষ্টিহীনদের নিয়ে একাধিক গল্প লিখেছেন। তাঁর 'অন্ধের বউ' গল্পে তিনি দেখিয়েছেন, মানুষের জীবনে হঠাৎ দৃষ্টিহীনতা নেমে এলে সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে এই পরিস্থিতি মানিয়ে নিতে ওই ব্যক্তিকে কতখানি সমস্যায় পড়তে হয়। 'আততায়ী' গল্পে কীর্তিবাসের জীবন সামাজিক লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১ খ্রীঃ) 'তমসা' গল্পের পঙ্কে চরিত্রে দৃষ্টিহীনদের অনুভবের জগৎ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য আলেখ্য রচনা করেছেন। বনফুলের (১৮৯৯-১৯৭৯ খ্রীঃ) 'অজান্তে' ও 'চোখ গেল' গল্প দুটি যেন

পরস্পরের পরিপূরক। একটিতে সামাজিক অবহেলা এবং অন্যটিতে প্রেমের কারণে নায়িকার স্বেচ্ছায় দৃষ্টি বিসর্জন। সুবোধ ঘোষের (১৯০৯-১৯৮০ খ্রীঃ) 'চোখ গেল' গল্পটি দৃষ্টিহীনদের নিয়ে লেখা অন্যান্য গল্পের তুলনায় স্বতন্ত্র্য মর্যাদার দাবিদার। সম্ভবত এই গল্পে প্রথম কোনো দৃষ্টিহীন ব্যক্তির সামাজিক, পারিবারিক ও অর্থনৈতিক সক্রিয়তার কথা উঠে এসেছে। সত্যজিৎ রায়ের (১৯২১-১৯৯২ খ্রীঃ) 'গোলকধাম রহস্য'-এর (১৯৮০ খ্রীঃ) নীহার দত্ত চরিত্রটি মানুষের প্রতিশোধ স্পৃহা ও জিঘাংসাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তার ব্যক্তিজীবনের ব্যর্থতা ও নৈরাশ্য মনস্তাত্ত্বিক কারণ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে, কিন্তু তার মতো বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর পক্ষে অপরাধীকে হত্যা করার ঘটনা যেমন তার স্মৃতিশক্তি, শ্রবণশক্তি ও স্পর্শশক্তির প্রমাণ দেয়, একইসঙ্গে মানুষ হিসাবে তার মর্যাদা হানি করে। পরবর্তীকালে মহাশ্বেতা দেবীর (১৯২৬-২০১৬ খ্রীঃ) 'কবিপত্নী' গল্পের দৃষ্টিহীন বৃদ্ধ কবি মানবিক অনুভূতিতে সমুজ্জ্বল। এইভাবে বিগত ১০০ বছরে যেসব গল্পে দৃষ্টিহীনদের কথা উঠে এসেছে তাদের অনেকেই সমাজ ও পরিবারের পক্ষে অকর্মণ্য বোঝা স্বরূপ, আবার কেউ ক্রোধে ও কামনায় অবনত। দু-একটি চরিত্র আবার সজীব, সক্রিয় মানব সত্তার মূর্ত প্রতিনিধি।

৭ অধ্যায় বিভাজন

এই গবেষণাপত্রের প্রথম অধ্যায়ে প্রতিবন্ধকতার সংজ্ঞা ও স্বরূপ নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়েছে। সে প্রসঙ্গে প্রতিবন্ধকতা বিচারের নানান মাপকাঠি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আমরা এই অধ্যায়ে যথাযথ পরিভাষা অনুসন্ধানেরও চেষ্টা করেছি। প্রতিবন্ধকতার শ্রেণী নির্ণয় প্রসঙ্গে দৃষ্টিহীনতার আলোচনা গুরুত্ব পেয়েছে। আইন, চিকিৎসাবিজ্ঞান ও সমাজতাত্ত্বিক দিক থেকে প্রতিবন্ধকতা ও দৃষ্টিহীনতাকে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। সেই আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা প্রতিবন্ধকতা ও দৃষ্টিহীনতার সমাজতাত্ত্বিক এবং বৈজ্ঞানিক

কারণগুলি খোঁজার চেষ্টা করেছি। ‘প্রতিবন্ধী’ থেকে ‘প্রতিস্পর্ধী’র তত্ত্ব নির্মাণের চেষ্টা করা হয়েছে। ‘প্রতিবন্ধকতা’ একটি মানসিক ও শারীরিক সমস্যা। তাই সমস্যা বিচারের তিনটি জিজ্ঞাসা কে, কী ও কেন?-র উত্তর খোঁজা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে ‘প্রতিবন্ধী’ নির্বাচনের পদ্ধতি ও প্রকরণ। ‘প্রতিবন্ধীচর্চা থেকে ‘প্রতিবন্ধী’দের সমস্যার মূল এলাকাগুলিকেও চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রতিবন্ধকতা প্রসঙ্গে আমরা অক্ষমতা বিদ্যাচর্চার পরিচয় দিয়ে এর মূল বৈশিষ্ট্যগুলিকে নির্ধারণের চেষ্টা করেছি। উক্ত বিষয়টির সংজ্ঞা নির্ধারণের মধ্যে দিয়ে ভারতীয় প্রেক্ষিতে এর প্রাসঙ্গিকতা প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রসঙ্গত প্রাচীন ধারণার সঙ্গে অক্ষমতা-বিদ্যাচর্চার প্রধান পার্থক্যগুলি আলোচনা করা হয়েছে। অঙ্গহানি ও অক্ষমতা কোথায় আলাদা সামাজিক এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণে তা আলোচনা করা হয়েছে। প্রতিবন্ধকতা বিষয়টির সঙ্গে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কটি বিশ্লেষণ করে একটি বাস্তবসম্মত সামাজিক সমাধান খোঁজার চেষ্টা করেছি।

গবেষণাপত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দৃষ্টিহীনদের সামাজিক অবস্থান নির্ধারণের উদ্দেশ্যে আমরা শিক্ষা ও পুনর্বাসনের ইতিহাস আলোচনা করেছি। সে প্রসঙ্গে পুরাণ ও কিংবদন্তি থেকে শুরু করে বর্তমান সময়ের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে তাদের অবস্থান বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। দৃষ্টিহীনদের শিক্ষার ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে যেমন লুই ব্রেল (১৮০৯-১৮৫২ খ্রীঃ) ও ব্রেল আন্দোলন গুরুত্ব পেয়েছে পাশাপাশি আমরা সাহিত্য ও সংস্কৃতির জগতে দৃষ্টিহীনদের অবস্থানটি বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করেছি। প্রসঙ্গত দৃষ্টিহীনদের সম্পর্কে প্রাচীন ভারতীয় ও পাশ্চাত্য ধারণা এবং বর্তমান জনমানসের ধারণাগুলি বুঝে নিয়ে সামগ্রিক আলোচনাটি অগ্রসর হয়েছে। আমরা লক্ষ করলে দেখতে পাব দৃষ্টিপ্রতিস্পর্ধীদের সামাজিক ও মানসিকভাবে লড়াইয়ের প্রবণতা যার ফলে দৃষ্টিপ্রতিস্পর্ধীদের উত্তরণের মূল কারণগুলি অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছি।

গবেষণাপত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে কাব্য ও নাটকে দৃষ্টিহীনতার প্রসঙ্গ অনুসন্ধান করা হয়েছে। কারণ সাহিত্য সংরূপের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, আধুনিক কথাসাহিত্যের জন্মের অনেক আগেই কাব্য ও নাটকের জন্ম হয়েছে। এই দুটি সাহিত্য মাধ্যমে দৃষ্টিহীনতার প্রসঙ্গ অনুসন্ধান করার পর তাদের উপস্থাপন কৌশল পর্যালোচনা করা হয়েছে। উপস্থাপন কৌশল পর্যালোচনা করার মাধ্যমে সমাজে ও সাহিত্যে দৃষ্টিহীনদের অবস্থান নির্ধারণের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণগুলিকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছি।

গবেষণাপত্রের চতুর্থ অধ্যায়ে বাংলা উপন্যাসের উদ্ভব ও বিকাশ এবং তার মূল প্রবণতাগুলি সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করেছি। এর পর অক্ষমতা বিদ্যাচর্চার মূল বিষয়গুলি সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করে তার প্রেক্ষিতে বাংলা উপন্যাসে সৃষ্ট দৃষ্টিহীন চরিত্রের সামাজিক, সাহিত্যিক এবং সাংস্কৃতিক অবস্থান নির্ধারণের চেষ্টা করেছি। এই অধ্যায়ে আমাদের অনুসন্ধানে প্রাপ্ত দৃষ্টিহীন চরিত্র আছে এমন উপন্যাসের তালিকা ছকের সাহায্যে দেখানো হয়েছে। সেই চরিত্রগুলি উপন্যাসের কালানুক্রমিক পর্যায়ের কথা স্মরণে রেখে পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ জাতীয় চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে লেখকরা কতখানি সমাজে প্রচলিত নানান ধারণা এবং মিথের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন তারও বিচার-বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি। সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রশ্নটি সেক্ষেত্রে গুরুত্ব পেয়েছে। মনে করা হয় উপন্যাস সাহিত্যে একটি পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টি বা জীবনের সামগ্রিক ছবি আঁকা হয়। আমরা প্রাপ্ত উপন্যাসগুলি বিচার করার ক্ষেত্রে লেখকদের সেই দৃষ্টিভঙ্গি ধরার চেষ্টা করেছি। শেষপর্যন্ত অক্ষমতা বিদ্যাচর্চার নিরিখে উক্ত উপন্যাস এবং সৃষ্ট চরিত্রগুলি বিশ্লেষণ করে একই সঙ্গে লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গি ও সমাজমনস্কতার ছবি যেমন পাওয়া গেছে তেমনই প্রতিবন্ধকতার সাংস্কৃতিক ধারণাটিও ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

গবেষণাপত্রের পঞ্চম অধ্যায়ে ছোটগল্পের নিরিখে এদের সাহিত্যিক ও সামাজিক অবস্থান এবং সাহিত্যকারের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি ছোটগল্পের উদ্ভব ও বিকাশ। সে প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে ছোটগল্পের সংজ্ঞা, স্বরূপ শ্রেণী। এরপর বাংলা ছোটগল্পে দৃষ্টিহীন চরিত্রগুলির সাহিত্যিক নিদর্শন তালিকা সুনির্দিষ্ট ছকের সাহায্যে দেখানো হয়েছে। প্রাপ্ত গল্পগুলিকে লেখকদের জন্ম-মৃত্যুর ক্রমানুযায়ী সাজানো হয়েছে। এরপর প্রাপ্ত গল্পগুলির উপর নির্ভর করে বাংলা ছোটগল্পের দৃষ্টিহীন চরিত্রগুলির স্বরূপ, সামাজিক অবস্থান খোঁজা হয়েছে এবং এই স্বরূপ, সামাজিক অবস্থানের পরিচয়ের মধ্যে দিয়ে আমরা খোঁজার চেষ্টা করেছি দৃষ্টিহীন মানুষের জীবনচিত্র আঁকার ক্ষেত্রে লেখক কতখানি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি বা প্রচলিত ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন? সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিপ্রতিস্পর্ধীদের সামাজিক অবস্থান যেভাবে পরিবর্তিত হয়েছে ছোটোগল্পে এ পরিবর্তন কতটা ধরা পড়েছে তাও দেখার চেষ্টা করেছি। এ ক্ষেত্রে ছোটোগল্প ও উপন্যাসের তুলনার প্রসঙ্গ স্বাভাবিকভাবে এসে পড়ে। উপন্যাসে যেমন রয়েছে বৃহৎ দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিস্তৃত প্রেক্ষাপট তেমনই ছোটোগল্প তার সীমিত পরিসরে শিল্পের এক আঁচড়ে জীবনের অমোঘ সত্যকে আবিষ্কার করে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে দৃষ্টিহীন চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে বাংলা কথাসাহিত্য ও চলচ্চিত্রের একটি তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। আমরা জানি যে সিনেমা ও সাহিত্য পরস্পরের পরিপূরক। বহু ক্ষেত্রে একে অপরের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। সাহিত্য ও সিনেমা দুটি আলাদা শিল্পমাধ্যম হলেও এই দুয়ের যোগাযোগের সূত্রটি খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে। দৃষ্টিহীন চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে সিনেমা সাহিত্যের তুলনায় কত দূর অগ্রসর হয়েছে তা গুরুত্বের সঙ্গে বিচার করা হয়েছে।

৮ উপসংহার

গবেষণাপত্রের পরিশেষ অধ্যায়ে সামগ্রিকভাবে গবেষণাসন্দর্ভটির মূল্যায়ন করা হয়েছে। মূলত কলকাতার প্রতিবন্ধী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানগুলিকে ক্ষেত্র-সমীক্ষার অঞ্চল হিসেবে ধরে নিয়ে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রতিস্পর্ধী বিষয়ে মানসিকতার উপর চর্চা করা হয়েছে। দৃষ্টিহীনদের সঙ্গে অন্যান্য প্রতিস্পর্ধীদের তুলনামূলক আলোচনা ও দৃষ্টিহীনদের দৃষ্টিকোণের নিরিখে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে দৃষ্টিপ্রতিস্পর্ধী ধারণার উপস্থাপনা কৌশল, চরিত্র নির্মাণ শৈলী, অভিপ্রায়, মানসিকতা ইত্যাদি বিষয়গুলি আলোচনা করা হয়েছে। সে প্রসঙ্গে মূল্যায়ন থাকবে এই অধ্যায়ে। সামাজিক অবদমনের ফলে প্রতিস্পর্ধীরা কীভাবে কুক্ষিগত হয় তা আলোচনা করা হয়েছে। এই থেকে একটি প্রধান প্রতিস্পর্ধীদের উত্তরণ অন্য সমপর্যায়ে প্রতিস্পর্ধীদের ক্ষেত্রে সম্ভাবনার পথ কতটা সুগম করে, তা দৃষ্টিপ্রতিস্পর্ধীদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে দৃষ্টিপ্রতিস্পর্ধীদের লড়াই করার সম্ভাবনাময় রাস্তার খোঁজ করাই এই গবেষণার উদ্দেশ্য। তথ্য ও তত্ত্বের সংমিশ্রণে সামগ্রিক গবেষণাপত্রটি যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্তের দিকে এগোবে। এর আরো একটি তাৎপর্য হলো প্রতিবন্ধী দৃষ্টিকোণ যেমন গুরুত্ব পেয়েছে, তেমনই তথাকথিত ‘প্রতিবন্ধী’ ও ‘অপ্রতিবন্ধী’ মানসিকতার বিচার-বিশ্লেষণ গুরুত্ব পেয়েছে। শেষ পর্যন্ত প্রতিস্পর্ধী মানুষরা প্রতিবন্ধকতার সীমানা অতিক্রম করে ব্যক্তি সীমানা থেকে শ্রেণী বা সম্প্রদায়গত চেতনার পথে কত দূর অগ্রসর হয়েছে তাও দেখার চেষ্টা করেছি।

প্রথম অধ্যায়

প্রতিবন্ধকতার নানা দিক ও দৃষ্টিহীনতা

১.১ সূচনা

এই গবেষণাসন্দর্ভের আলোচ্য বিষয় হলো আধুনিক বাংলা সাহিত্যে দৃষ্টিহীনতা প্রসঙ্গ। আমরা বাংলা সাহিত্যে সৃষ্ট দৃষ্টিহীন চরিত্রগুলি বিশ্লেষণ করে তাদের সামাজিক ও সাহিত্যিক অবস্থান বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব। সে প্রসঙ্গে লেখকদের সমাজমনস্কতার দিকটিও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হবে। এই গবেষণাসন্দর্ভটি যদিও প্রধানত সাহিত্যকেন্দ্রিক তবু সাহিত্যকে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনে প্রতিবন্ধকতা ও দৃষ্টিহীনতার সংজ্ঞা স্বরূপ এবং প্রতিবন্ধী সত্তার নানাদিক সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

প্রতিবন্ধকতা হল একটি সমস্যা। সমাজ ইতিহাসের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবন্ধকতা বিচারের মাপকাঠিরও পরিবর্তন হয়েছে। প্রতিবন্ধী চর্চার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিবর্গ ও নানান প্রতিষ্ঠান প্রতিবন্ধকতা বিষয়টিকে নানা দিক থেকে দেখেছেন। আমরা এই অধ্যায়ে প্রতিবন্ধকতার সংজ্ঞা ও স্বরূপ নির্ধারণের চেষ্টা করব, পাশাপাশি প্রতিবন্ধকতার বিভিন্ন ধরনের আলোচনা প্রসঙ্গে দৃষ্টিহীনতার আলোচনায় গুরুত্ব দেওয়া হবে। অন্ধ, অক্ষম প্রভৃতি প্রচলিত শব্দের পরিবর্তে সঠিক পরিভাষা অনুসন্ধানেরও চেষ্টা করা হবে। প্রতিবন্ধকতার সংজ্ঞা ও স্বরূপ আলোচনা প্রসঙ্গে তার বিজ্ঞানভিত্তিক কারণগুলিও অনুসন্ধানের চেষ্টা করব।

১.২ প্রতিবন্ধকতা বিচারের নানান মাপকাঠি

সাধারণভাবে মনে করা হয় পৃথিবীর নানান দেশে একদল মানুষকে অক্ষম বা প্রতিবন্ধী আখ্যা দিয়ে আলাদা করে রাখার রেওয়াজ প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে। যদিও জীবনের

নানা ক্ষেত্রে এরা প্রতিভা ও যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছে, তবু সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিভাজন রেখাটি আজও স্পষ্ট, অক্ষমতার অপবাদ আজও ঘোচেনি। প্রাচীন ইউরোপের ইতিহাসে নিকোলাস স্যান্ডারসন (১৬৮২-১৭৩৯ খ্রীঃ), ডিডিমাস (৩০৮-৩৯৫ খ্রীঃ), হোমার (৮৫০ অব্দ), মিলটন (১৬০৮-১৬৭৪ খ্রীঃ) -এর নাম শিক্ষিত সমাজে অনেকেই জানেন। লুই ব্রেল (১৮০৯-১৮৫২ খ্রীঃ), হেলেন কেলার (১৮৮০-১৯৬৮ খ্রীঃ) প্রতিবন্ধকতার সংজ্ঞাকে বদলে দিয়েছেন। বিশ্বখ্যাত সঙ্গীতকার বিটোফেন (১৭৭০-১৮২৭ খ্রীঃ) এবং বিশিষ্ট বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিংস (১৯৪২-২০১৮ খ্রীঃ) তথাকথিত প্রতিবন্ধী। আধুনিক ভারতে সুধা চন্দ (১৯৬৫ খ্রীঃ), মাশুদুর রহমানের (১৯৬৮ খ্রীঃ) মতো উদাহরণেরও অভাব নেই। কিন্তু প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসে প্রতিবন্ধীদের নিয়ে রচিত কলঙ্কিত অধ্যায় মানবতার পক্ষে লজ্জার চিহ্ন বহন করে। প্রাচীন কালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এদের বেঁচে থাকার অধিকার পর্যন্ত ছিল না। ইউরোপের নানান দেশে প্রতিবন্ধী শিশুদের হত্যা করার রীতি প্রচলিত ছিল। এর পরও যারা বেঁচে থাকতো তাদের মধ্যে পুরুষরা ভিক্ষাবৃত্তি এবং মহিলারা বেশ্যাবৃত্তি করতে বাধ্য হতো।[১] প্রাচীন ও মধ্যযুগে প্রতিবন্ধকতাকে দেখা হতো ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে। ধর্মের ব্যাখ্যা অনুযায়ী মানুষের প্রতিবন্ধকতা তার অথবা পিতামাতার পূর্বজন্মের কৃতকর্মের ফল। ভারতীয় পুরাণ, মহাকাব্য ও নানান সংহিতায় এই বক্তব্যকে সমর্থন করা হয়েছে।[২] আধুনিক যুগের শুরুতে খ্রিস্টান মিশনারিদের চেষ্টায় প্রতিবন্ধী মানুষদের পুনর্বাসনের উদ্যোগ লক্ষ করা যায়। ক্রমশ প্রতিবন্ধকতা চিকিৎসাবিজ্ঞানের একটি সমস্যা হিসেবে গুরুত্ব পেতে থাকে। বিশ শতকের শেষের দিকে অলিভার (১৯১৮-১৯৬১ খ্রীঃ), ক্যাম্বেল (১৯৪১-২০০৫ খ্রীঃ), ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন (১৮১৮ খ্রীঃ) প্রমূখ তাত্ত্বিকদের হাত ধরে প্রতিবন্ধী চর্চার নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। এই

সময় থেকে প্রতিবন্ধকতা বিষয়টিকে একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যা হিসেবে দেখার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। আলাদাভাবে অঙ্গহানি ও অক্ষমতার আলোচনা গুরুত্ব পায়।

১.৩ পরিভাষার সন্ধান

অঙ্গহানিযুক্ত ব্যক্তিদের সম্পর্কে আমাদের সমাজে দীর্ঘ সময় ধরে অন্ধ, খোঁড়া, ল্যাংড়া, অক্ষম, প্রতিবন্ধী ইত্যাদি নেতিবাচক শব্দের ব্যবহার হয়ে আসছে। আজও অনেক শিক্ষিত মানুষের মুখে শব্দগুলির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এজাতীয় শব্দের ব্যবহারের ফলে যেমন নেতিবাচক মনোভাব প্রকাশিত হয় তেমনই উদ্দিষ্ট ব্যক্তিদের পক্ষে আত্মমর্যাদার হানি ঘটায়। আমরা সঠিক পরিভাষা অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রামাণ্য গ্রন্থ ও অভিধান থেকে প্রাপ্ত শব্দগুলি বিশ্লেষণ করে দেখব।

সংসদ বাংলা অভিধান অনুসারে 'প্রতিবন্ধী' বা 'প্রতিবন্ধকতা' শব্দগুলি উৎপন্ন হয়েছে প্রতিবন্ধ শব্দ থেকে যার অর্থ হলো বাধা, ব্যাঘাত, বিঘ্ন, অন্তরায় ইত্যাদি। প্রতিবন্ধকতার অর্থ বাধা দান, (কাজে প্রতিবন্ধকতা করা) 'প্রতিবন্ধী' শব্দের অর্থ করা হয়েছে বাধাযুক্ত, বাধাজনক, দৈহিক শক্তির একান্ত অভাবের জন্য বা অঙ্গহানির জন্য যারা আশৈশব বাধাপ্রাপ্ত - মূক, বধির, খঞ্জ ইত্যাদি।[৩] Oxford Dictionary অনুযায়ী 'Disable' শব্দের অর্থ অক্ষম করা বা দুর্বল করা অথবা অনুপযুক্ত বা অযোগ্য করা। 'Disability' শব্দের অর্থ করা হয়েছে অসামর্থ্য, দুর্বলতা বা আইনগত অযোগ্যতা। উক্ত অভিধানে 'Handicap' শব্দের অর্থ করা হয়েছে ঘোড়দৌড়, দৌড় বা অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক খেলাধূলায় যে অসুবিধা বা বাধা অন্য প্রতিযোগীর উপর চাপানো হয়, প্রতিবন্ধক, চাপানো, অসুবিধায় ফেলা।[৪] তবে সাম্প্রতিক কালে নানান পরিভাষা নির্মাণের চেষ্টা হয়েছে। বর্তমানে কোনো-কোনো ক্ষেত্রে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন বা বিশেষভাবে সক্ষম ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার

লক্ষ করা যাচ্ছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক বিষ্ণুপদ নন্দ ‘ব্যতিক্রমধর্মী শিশু’ গ্রন্থে প্রতিবন্ধী শব্দের পরিবর্তে ব্যতিক্রমধর্মী শব্দটির ব্যবহার যথাযথ বলে মনে করেছেন। তিনি মনে করেন যে, শুধু স্বল্পবুদ্ধি শিশুরাই এই অভিধার অন্তর্ভুক্ত নয় অতিবুদ্ধি শিশুরাও অন্যদের তুলনায় ব্যতিক্রমী।[৫] হিন্দিতে প্রতিবন্ধী শব্দের পরিবর্তে বিকলাঙ্গ বা দিব্যাঙ্গ শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়। দিব্যাঙ্গ শব্দটি আপত্তিকর এই কারণে যে, এর সঙ্গে অলৌকিকতা জুড়ে রয়েছে। আবার দৃষ্টিহীন শব্দের পরিবর্তে হিন্দিতে নেত্রহীন বা অন্ধ শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়। অন্ধ শব্দের তুলনায় নেত্রহীন শব্দের ব্যবহার কাম্য বলে মনে হয়। উত্তর ভারতের প্রসিদ্ধ গায়ক সুরদাসের (জন্ম ১৪৭৮-১৪৮৩, মৃত্যু ১৫৭৯-১৫৮৪ খ্রীঃ) নাম অনুসারে সমস্ত দৃষ্টিহীন ব্যক্তিকে উত্তর ভারতে সুরদাস বলার রীতিও প্রচলিত আছে। এ ক্ষেত্রে সামান্যীকরণের ঘটনাটি লক্ষ করার মত। এ জাতীয় শব্দের ব্যবহারের মধ্যে দৃষ্টিহীনদের একটি গোত্র বা সম্প্রদায়ভুক্ত বলে মনে করা হয়।

সাধারণত সমাজে নতুন পরিভাষা নির্মাণ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংবাদপত্র ও বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে তা লক্ষ করা যাচ্ছে না। তবে এ জাতীয় পরিভাষা নির্মাণের ক্ষেত্রে আমাদের আরো সচেতন হওয়া প্রয়োজন। আসলে এক কথায় আমার মনে হয় ‘প্রতিবন্ধী’ ধারণাটা আরও অনেকটা বড়ো প্রেক্ষিতে ভাবা যেতে পারে। তাই Disability শব্দটির অনেক রকম বাংলা পরিভাষা থাকলেও আমরা প্রতিস্পর্ধী শব্দটি গ্রহণ করেছি।[৬] কারণ উক্ত শব্দটির ব্যঞ্জনাময় গুরুত্ব প্রতিবন্ধকতার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলিকে যেমন একত্রিত করে তেমনই আত্মমর্যাদাও দেয়। ‘প্রতিস্পর্ধী’ শব্দটির অর্থ হলো পাল্টা স্পর্ধাযুক্ত ব্যক্তি। শব্দটিকে ভাঙলে পাই, প্রতিরোধ+স্পর্ধা। অর্থাৎ স্পর্ধার দিকে বা বারেবারে স্পর্ধা এই ভাবনাকে সূচিত করে। যা লড়াইয়ের মানসিকতা ফুটিয়ে তোলে। আমরা জানি মানুষের মনোজগতের মধ্যে

আপতিকভাবে ঢুকে পড়া শব্দার্থের যে ছাকনি দীর্ঘ দিন ধরে স্থান জুড়ে রয়েছে তা সহজে যাবার নয়। 'প্রতিবন্ধী' তেমনি একটা উদাহরণ। আমাদের মনে রাখতে হবে ভাষা হলো সংস্কৃতির প্রধান বাহন। যদিও ব্যাপক অর্থে ভাষা বলতে শুধুমাত্র কথ্য বা লেখ্য ভাষাকে বোঝায় না। এর সীমানা বহু দূর বিস্তৃত, যেমন - সাংকেতিক ভাষা, ছবির ভাষা, শারীরিক ভাষা ইত্যাদি। তাই কোনো বিষয়ে পরিভাষাগত পরিবর্তনকে সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ইঙ্গিত হিসেবে দেখা যেতে পারে।

১.৪ প্রতিবন্ধকতার সংজ্ঞা ও স্বরূপ

প্রতিবন্ধীর সংজ্ঞা কী? প্রতিবন্ধী বলতে আমরা কাদের বুঝি? এই প্রশ্নের উত্তর তাত্ত্বিকভাবে দেওয়া গেলেও বাস্তবসম্মত যুক্তিনিষ্ঠ কোনো সংজ্ঞা দেওয়া যায় কিনা সে ক্ষেত্রে সংশয়ের অবকাশ থেকেই যায়। আভিধানিক অর্থে বা সাধারণ বুদ্ধিতে শারীরিকভাবে কোনো অঙ্গহানিজনিত প্রতিবন্ধকতা অথবা মানসিকভাবে বুদ্ধি বিকাশের কোনো অক্ষমতা প্রতিবন্ধকতার কারণ। তাহলে কি অন্ধ, মূক, বধির ব্যক্তিরাই প্রতিবন্ধী? তারাই যদি প্রতিবন্ধী হয়, তাহলে 'প্রতিবন্ধী'র বিপরীত শব্দ কী? যার মানদণ্ডে আমরা নিজেদের অভিহিত করি। এই প্রশ্নের উত্তর আজও খুঁজে পাওয়া যায়নি। কারণ প্রতিবন্ধী শব্দটি বড়ো ঘোলাটে, বড়োই অস্পষ্ট। প্রতিবন্ধী হিসেবে বিচারের মানদণ্ড কি হবে তা নির্ণয় করা বড়োই কঠিন। সাধারণভাবে মনে করা হয় প্রতিবন্ধকতার দুটি দিক - শারীরিক ও মানসিক। শারীরিক প্রতিবন্ধকতা বলতে বোঝানো হয় স্থায়ী ক্ষতি বা অসুস্থতা যেমন - দৃষ্টিগত, অস্থিজনিত, শ্রবণজনিত কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত ইত্যাদি। মানসিক প্রতিবন্ধকতা হলো বুদ্ধিগত বিকাশ বা শিখনজনিত সমস্যা। ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক 'প্রতিবন্ধী, প্রতিবন্ধকতার সত্তা ও তার স্বরূপ' নামক প্রবন্ধে বলেন, "প্রতিবন্ধকতার বিষয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে তথাকথিত অপ্রতিবন্ধী মানুষদের দ্বারা নির্ধারিত হয় বলে নির্দিষ্ট কতগুলি শারীরিক

প্রতিচ্ছবি গুরুত্ব পায়। ফলে প্রকৃত সমস্যাগুলিকে না বুঝে সেইসব মানুষদের হতাশার গভীরে সীমাবদ্ধ করে তাদের মানসিকতাকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা হয়।"[৭]

বাংলাদেশে 'প্রতিবন্ধী' ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষার আইনে প্রতিবন্ধকতার সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, "প্রতিবন্ধিতার অর্থ যে কোনো কারণে ঘটিত দীর্ঘমেয়াদি বা স্থায়ীভাবে কোনো ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিগত, বিকাশগত বা ইন্দ্রিয়গত ক্ষতিগ্রস্ততা বা প্রতিকূলতা এবং উক্ত ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীগত ও পরিবেশগত বাধার পারস্পরিক প্রভাব, যার কারণে উক্ত ব্যক্তি সমতার ভিত্তিতে সমাজে পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণে বাধাপ্রাপ্ত হন।"[৮]

"প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ বাংলাদেশ" (২০১৩ সনের ৩৯ নং আইন) অনুসারে; বয়স, লিঙ্গ, জাতি, সংস্কৃতি বা সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী আর দশ জন যে কাজগুলো করতে পারে ইমপেয়ারমেন্টের (অঙ্গক্রুটি) কারণে সে কাজগুলো প্রাত্যহিক জীবনে করতে না পারার অবস্থাটাই হলো ডিসাবিলিটি বা প্রতিবন্ধিতা। ইমপেয়ারমেন্ট হলো দেহের কোনো অংশ বা তন্ত্র যদি আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে, ক্ষণস্থায়ী বা চিরস্থায়ীভাবে তার স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা হারায় সে অবস্থাটিকে বোঝায়।

আমাদের আলোচ্য 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যে দৃষ্টিহীনতা প্রসঙ্গ: চর্চা, অবস্থান ও সমাজমনস্কতার পাঠ' নামক বিষয়ে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সংজ্ঞা ও স্বরূপ এবং দৃষ্টিহীনতার বিষয়ে সামাজিক ও আইনগত ধারণা সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন। সাধারণভাবে মনে করা হয় প্রতিবন্ধকতা একটি চিকিৎসার অধীন বিষয়। কিন্তু এর সঙ্গে সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়সমূহের গভীর যোগসূত্র রয়েছে। একথা বলা যেতে পারে প্রতিবন্ধকতা বিশেষ সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর নাম। তেমনি 'প্রতিস্পর্ধী' সমাজের বেড়া ভাঙার নাম।

১.৫ প্রতিস্পর্ধীতার প্রকারভেদ

প্রতিস্পর্ধীতার প্রকারভেদ বিভিন্ন ভিত্তিতে করা হয়ে থাকে। যেমন

ক. কখন শুরু হয়েছে তার ভিত্তিতে -

১। প্রাথমিক প্রতিস্পর্ধীতা: বিভিন্ন ধরণের প্রতিস্পর্ধীতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করলে তাকে প্রাথমিক প্রতিস্পর্ধীতা বলা হয়।

২। পরবর্তী বা অর্জিত প্রতিস্পর্ধীতা: জন্মের পরে বিভিন্ন কারণে প্রতিস্পর্ধীতা বরণ করে থাকলে তাকে পরবর্তী বা অর্জিত প্রতিস্পর্ধীতা বলা হয়।

খ. কোন অঙ্গ আক্রান্ত হয়েছে তার ভিত্তিতে -

১। শারীরিক প্রতিস্পর্ধী	২। দৃষ্টিপ্রতিস্পর্ধী
৩। শ্রবণ প্রতিস্পর্ধী	৪। বাক্ প্রতিস্পর্ধী
৫। বুদ্ধি প্রতিস্পর্ধী	৬। বহুবিধ প্রতিস্পর্ধী

গ. মাত্রা অনুযায়ী -

১। মৃদু	২। মাঝারি
৩। তীব্র	৪। চরম

১.৬ দৃষ্টিপ্রতিস্পর্ধিতার সংজ্ঞা ও স্বরূপ

দৃষ্টিপ্রতিস্পর্ধীদের বৈশিষ্ট্যগুলিকে দেখে নিয়ে আলোচনাটি এগোবে। দৃষ্টিহীনতা বিষয়টিকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে, - ক. সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীনতা, খ. আংশিক দৃষ্টিহীনতা, ও গ. ক্ষীণ দৃষ্টি।

ক) সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীনতা: উভয় চোখে একেবারেই দেখতে না পাওয়া -

i) দৃষ্টি তীক্ষ্ণতা (Visual acuity): ২০/৪০০।

ii) দৃষ্টিক্ষেত্র: ১০ ডিগ্রী বা তার চেয়েও কম।

খ) আংশিক দৃষ্টিহীনতা: এক চোখে একেবারেই দেখতে না পাওয়া -

i) দৃষ্টিতীক্ষ্ণতা: ৬/১২ থেকে ৬/১৮।

ii) দৃষ্টিক্ষেত্র: ২০ ডিগ্রি।

গ) ক্ষীণদৃষ্টি: উভয় চোখে আংশিক বা কম দেখতে পাওয়া -

i) দৃষ্টিতীক্ষ্ণতা (Visual acuity): ৬/১৮, ৬/৬০ এবং ৬/৬০ বা ৩/৬০ এর মধ্যে।

ii) দৃষ্টিক্ষেত্র: ২০ ডিগ্রী থেকে ৪০ ডিগ্রীর মধ্যে।

১.৭ জাতিসঙ্ঘের প্রতিবেদন

প্রাচীন কালে পৃথিবীর নানান দেশে প্রতিবন্ধীদের বেঁচে থাকার অধিকার পর্যন্ত ছিল না। তাদের সঙ্গে কী ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ করা হত কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি স্পষ্ট হতে পারে। প্রাচীনকালে রোমে দৃষ্টিহীন শিশুদের টাইবার নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হতো। এথেন্সে প্রতিবন্ধী শিশুদের খাবার না দিয়ে হত্যা করার রেওয়াজ প্রচলিত ছিল। স্পার্টায় তাদের পাহাড় থেকে ছুঁড়ে ফেলা হতো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানিতে প্রতিবন্ধীদের অপ্রয়োজনীয় খাদক বলে গ্যাস চেম্বারে ঢুকিয়ে বা গুলি করে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন হিটলার। চার্লস ডারউইন (১৮০৯ - ১৮৮২) তার ভ্রমণ কাহিনি 'Voyage of the Beaugle' গ্রন্থে লিখেছেন দক্ষিণ আমেরিকার উপকূল দিয়ে যাবার সময় তিনি দেখেছিলেন একদল অসুস্থ প্রতিবন্ধী মানুষ সার বেঁধে লোকালয় ছেড়ে পালাচ্ছেন আর তাদের পিছনে ছুটে আসছে খড়্গ হাতে উন্মত্ত ঘাতকের দল।[৯] আর এরই মাঝে জীবনের যুদ্ধে যারা ঘুরে দাঁড়িয়ে লড়াই করেছেন তারাই হয়ে উঠেছেন প্রতিস্পর্ধী।

সমাজে প্রতিবন্ধীদের প্রতি এই বৈষম্যমূলক আচরণ দূরীকরণের উদ্দেশ্যে জাতিসংঘের পক্ষ থেকে লিখিতভাবে কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। জাতিসংঘের

জনসংখ্যা তহবিল (ইউনিসেফ) তার বিশ্ব শিশু পরিস্থিতি ২০১৩, প্রতিবেদনে প্রতিস্পর্ধী শিশুদের উন্নয়নে কয়েকটি সুপারিশ করেছে। সুপারিশগুলি হচ্ছে -

১. প্রতিস্পর্ধী মানুষের অধিকার সনদ ও শিশু অধিকার সনদ অনুমোদন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

২. বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। সাধারণ মানুষ, নীতিনির্ধারক এবং শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সুরক্ষার মতো জরুরি সেবা যারা দিয়ে থাকেন, তাদের মধ্যে প্রতিস্পর্ধী মানুষের বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে হবে।

৩. একীভূতকরণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করতে হবে, যেন পরিবেশ শিশুবান্ধব হয়। যেমন বিদ্যালয়, স্বাস্থ্যসেবা, জনপরিবহন প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রবেশগম্যতা সহজ হয় এবং প্রতিস্পর্ধী শিশুরা যেন তাদের সহপাঠী বা সমবয়সীদের মতো অংশগ্রহণে উৎসাহিত হয়।

৪. প্রতিস্পর্ধী শিশুদের জন্য পরিবারভিত্তিক সেবা ও কমিউনিটিভিত্তিক পুনর্বাসনের বিস্তার ঘটাতে হবে এবং এসব ক্ষেত্রে সহায়তা ত্বরান্বিত করতে হবে।

৫. পরিবারগুলোকে সহায়তা দিতে হবে, যেন তারা প্রতিস্পর্ধী শিশুদের জীবন যাপনের জন্য যে বাড়তি খরচ হয়, তা মেটাতে পারে এবং আয়ের হারানো সুযোগ ফিরে পেতে পারে।

৬. প্রতিস্পর্ধী শিশু ও তাদের পরিবারের চাহিদা পূরণের জন্য যেসব সহায়তা এবং সেবার পরিকল্পনা করা হয়, সেগুলো মূল্যায়নে প্রতিস্পর্ধী শিশু ও কিশোর-কিশোরীসহ তাদের পরিবারের সদস্যদের সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে এর ন্যূনতম মানকে ছাড়িয়ে যেতে হবে।

৭. সব খাতের সেবাগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হবে, যেন প্রতিস্পর্ধী শিশু ও কিশোর-কিশোরী এবং তাদের পরিবার যেসব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়, সেগুলোকে পূর্ণ মাত্রায় মোকাবিলা করা সম্ভব হয়।

৮. প্রতিস্পর্ধী শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের জীবনকে প্রভাবিত করে, এমন সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়ায় প্রতিস্পর্ধী শিশু ও কিশোর-কিশোরীকে শুধু সুবিধাভোগী হিসেবে নয়, বরং পরিবর্তনের প্রতিনিধি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৯. প্রতিস্পর্ধীতা বিষয়ে একটি বৈশ্বিক সামঞ্জস্যপূর্ণ গবেষণা কার্যক্রম এগিয়ে নিতে হবে। এর মাধ্যমে নির্ভরযোগ্য ও তুলনামূলক উপাত্ত পাওয়া যাবে, যা পরিকল্পনা ও সম্পদ বণ্টন সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দেবে এবং উন্নয়ন কার্যক্রমে প্রতিস্পর্ধী শিশুদের বিষয় আরো সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করবে।

১.৮ ভারতীয় আইনে প্রতিবন্ধকতা

আইনগত দিক থেকে ভারতীয় প্রেক্ষিতে প্রতিবন্ধকতার সংজ্ঞা এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য ঘোষিত সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে আলোচনা করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য আইন হলো, People with Disability, 1995 Act. (Equal opportunity protection of right and full participation) যা সংক্ষেপে **PWD Act.**[১০] নামে পরিচিত। ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারি যখন ভারতীয় সংবিধান গৃহীত হয় সেখানে প্রতিবন্ধীদের সম্পর্কে কোনো কথা বলা হয়নি। প্রথম ১৯৭৭ সালে প্রতিবন্ধীদের জন্য কর্মক্ষেত্রে তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর পদ সংরক্ষণের কথা ঘোষণা করা হয়। ১৯৯২ সালে **RCI Act** -এ প্রতিবন্ধীদের নাম নতিভুক্তকরণের কথা এবং পুনর্বাসনের কথা বলা হয়। ঐ বছর প্রতিবন্ধীদের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা দান বিষয়ে বেজিং-এ এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে ভারত অংশ নিয়েছিল। এই সম্মেলনে আলোচনার প্রেক্ষিতে ১৯৯৫ সালে **PWD Act** তৈরি হয় এবং ১৯৯৬ সালে পার্লামেন্টে অনুমোদন লাভ করে। এই আইনে ১৪টি অধ্যায়ে প্রতিবন্ধকতার সংজ্ঞা; শিক্ষাক্ষেত্রে, কর্মক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নানা সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার কথা আলোচনা করা হয়েছে। যেমন -

প্রথম অধ্যায়ে দৃষ্টিহীনতা, স্বল্প দৃষ্টি, শ্রবণজনিত সমস্যা, কুষ্ঠ রোগ, মানসিক অসুস্থতা ইত্যাদি বিষয়কে প্রতিবন্ধকতার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। চল্লিশ শতাংশ বা তার অধিক প্রতিবন্ধকতা যদি থাকে এবং সেই প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যদি সরকারি অনুমোদন প্রাপ্ত এবং নথিভুক্ত যোগ্য চিকিৎসকের দ্বারা প্রমাণিত ও শংসিত হন তবে তিনি প্রতিবন্ধী হিসাবে বিবেচিত হবেন। দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী হিসেবে **PWD Act** (১৯৯৫) অনুযায়ী তারাই বিবেচিত হবেন যাঁরা -

১) সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীনতা অথবা

২) যাদের দৃষ্টি তীক্ষ্ণতা চশমা নিয়ে ৬১২০-২০১২০০ (**SNELLEL**) এর বেশী নয়

অথবা

৩) যাদের দৃষ্টিক্ষেত্র ২০ বা ২০ ডিগ্রীর কম।

পঞ্চম অধ্যায়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির শিক্ষার অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। উক্ত আইন অনুযায়ী সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার অধিকার সুনিশ্চিত করবে। দেশের যে কোনো প্রান্তের প্রতিবন্ধী শিশুরা সাধারণ অথবা বিশেষ বিদ্যালয়ে পড়াশোনার সুযোগ পাবে। সেক্ষেত্রে প্রয়োজনে সরকার বিশেষ স্কুল প্রতিষ্ঠা বা স্কুল প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দেবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে কর্মসংস্থানের অধিকার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য উপযুক্ত পদ নির্দিষ্ট করবে। সর্বাধিক তিন শতাংশ পদ তাদের জন্য সংরক্ষিত হবে। উক্ত তিন শতাংশের মধ্যে এক শতাংশ দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী, শ্রবণ প্রতিবন্ধী এবং মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত হবে। প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত পদ তিন বছর অন্তর পরিবর্তিত হতে পারে।

সপ্তম অধ্যায়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার কথা বলা হয়েছে। সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুস্থ-স্বাভাবিক জীবন যাপনের জন্য নানা প্রকার সহায়ক সামগ্রী প্রদান বা উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বার্থে সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ আবাসন নির্মাণের জন্য, ব্যবসার উদ্দেশ্যে, বিশেষ স্কুল বা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য স্বল্প মূল্যে জমি দান করতে পারে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে প্রতিবন্ধীদের সামাজিক নিরাপত্তার কথা বলা হয়েছে। সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তাদের আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবে। পাশাপাশি যদি কোনো অ-সরকারি সংস্থা বা সংগঠন প্রতিবন্ধীদের স্বার্থে কাজ করে তাহলে সেই সংস্থা বা সংগঠন সরকার বা স্থানীয় প্রশাসনের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য পেতে পারে।

চতুর্দশ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, যদি কোনো ব্যক্তির প্রতিবন্ধকতা না থাকা সত্ত্বেও ওই ব্যক্তি সরকারিভাবে প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে তাহলে তার দুই বছর পর্যন্ত কারাবাস অথবা ২৫০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা কারাবাস ও জরিমানা উভয়ই হতে পারে। কিন্তু কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যদি কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে প্রাপ্ত সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে তাহলে আইনে সরাসরি তার কোনো শাস্তির ব্যবস্থা নেই। ওই প্রতিবন্ধী ব্যক্তি রাজ্যের প্রতিবন্ধী আধিকারিক, সর্বোপরি কেন্দ্রের সর্বোচ্চ আধিকারিকের কাছে অভিযোগ জানাতে পারে এবং সেক্ষেত্রে ওই আধিকারিক অভিযোগের ভিত্তিতে সত্যতা যাচাই করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে পারে।

২০০৬ সালের ১৩-ই ডিসেম্বর প্রতিবন্ধীদের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষে জাতিসংঘের যে সাধারণসভা অনুষ্ঠিত হয় তার মূল উদ্দেশ্য ছিল- ১। প্রতিবন্ধীদের ক্ষমতায়ন, ২। স্বাধীন ও স্বনির্ভর জীবন যাপনের ওপর গুরুত্ব দান, ৩। সমাজে পূর্ণ অংশগ্রহণ এবং

অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠন, ৪। প্রতিবন্ধকতাকে মানববৈচিত্রের অংশ হিসেবে দেখা, ৫। সমতার ভিত্তিতে সুযোগসুবিধা দান, ৬। সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি ইত্যাদি।[১১]

উক্ত মহাসভার সুপারিশগুলি স্মরণে রেখে ২০১৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় পার্লামেন্টে The Rights of Person With Disability (RPWD) অ্যাক্ট প্রণীত হয়। পি. ডাবলু. ডি অ্যাক্টের নতুন এবং বর্ধিত সংস্করণ হিসেবে আমরা একে দেখতে পারি। শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে, সামাজিক সুযোগ-সুবিধা ও নিরাপত্তার প্রশ্নে বেশ কিছু প্রগতিশীল পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। যথা -

১। চাকরি ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের জন্য ৩% এর পরিবর্তে ৪% পদ সংরক্ষণ করা হয়েছে।

২। শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে সহায়ক প্রযুক্তির কথা এবং সরকারি ক্ষেত্রে সহায়ক প্রযুক্তি ও সংকেত ভাষার গুরুত্বকে স্বীকার করা হয়েছে।

৩। নাগরিক ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে সহায়ক বুথের কথা বলা হয়েছে।

৪। জনস্বার্থে ব্যবহৃত অফিস আদালত সরকারি ও বেসরকারি ভবনে প্রতিবন্ধীবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। সর্বোপরি সামাজিক নিরাপত্তার ওপরে বেশী করে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

১৯৯৫ সালে প্রণীত পি.ডাবলু.ডি. অ্যাক্টের তুলনায় নানা দিক থেকে উক্ত অ্যাক্টটি প্রগতিশীল হলেও কার্যকর করার ক্ষেত্রে আরো বেশী কড়া ও অনমনীয় পদক্ষেপ গৃহীত হওয়া প্রয়োজন। উপযুক্ত পদক্ষেপ ছাড়া এ জাতীয় অ্যাক্ট কাগজে কলমে থেকে যাবে। বাস্তবে এর প্রয়োগ বড়ো একটা ঘটছে না। ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে সহায়ক বুথের কথা বলা হয়েছে তা বড়ো একটা লক্ষ করা যায়না। ক্ষমতায়নের প্রশ্নে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ একটি জরুরি প্রক্রিয়া। কিন্তু পঞ্চায়েত, পৌরসভা, বিধানসভা বা লোকসভার ক্ষেত্রে তপশিলি জাতি, উপজাতি এবং মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন সংরক্ষিত থাকলেও

প্রতিবন্ধীদের জন্য কোনো আসন সংরক্ষিত নেই। সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে শিক্ষা ও চাকরির উদ্দেশ্যে প্রতিবন্ধীবান্ধব পরিবেশ অধিকাংশ ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায় না। আরো একটি সমস্যার জায়গা হলো ভুয়ো শংসাপত্র প্রদান। অনেক অপ্রতিবন্ধী মানুষ অর্থ অথবা রাজনৈতিক প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে ভুয়ো শংসাপত্র সংগ্রহ করছে এবং তার সাহায্যে প্রকৃত প্রতিবন্ধী না হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের জন্য নির্ধারিত সুযোগসুবিধা লাভ করছে ফলে, প্রকৃত প্রতিবন্ধীরা বঞ্চিত হচ্ছে। উক্ত ভারতীয় আইনে এর যথাযথ রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করা হয়নি। সর্বোপরি, এ জাতীয় শংসাপত্র প্রদানের ক্ষেত্রে আরো বিজ্ঞানসম্মত ও নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি ব্যবহার করা প্রয়োজন। চিকিৎসাবিজ্ঞান অনুযায়ী ৪০% শারীরিক সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিদের ভারতীয় আইনে প্রতিবন্ধী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। প্রতিবন্ধকতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে মাত্রাগত ব্যবধান সম্পর্কে পুনর্বিবেচনার অবকাশ রয়ে গেছে যে কারণে প্রায়শই এর অপব্যবহার লক্ষ করা যায়। তবে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে যথাযথ আইন প্রণয়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া।

১.১০ প্রতিবন্ধকতার কারণসমূহ

ভারতসহ বিশ্বের নানান দেশে ঈশ্বরের অভিশাপ বা পূর্বজন্মের কৃতকর্মের ফল হিসেবে প্রতিবন্ধকতাকে দেখা হতো। এই ছিল ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে প্রতিবন্ধকতার ব্যাখ্যা। বিশ শতকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কালে যখন বৃহৎ সংখ্যক মানুষ প্রতিবন্ধকতার শিকার হয় তখন থেকে প্রতিবন্ধকতাকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের দিক থেকে দেখার প্রবণতা দেখা যায়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিবন্ধীদের সামাজিক পুনর্বাসনের ওপর গুরুত্ব দেয়। এই শতকের শেষ দিক থেকে প্রতিবন্ধকতাকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে দেখা শুরু হয়। প্রতিবন্ধকতার ধারণায় বিচ্ছিন্নতা ও দারিদ্রের মত আর্থসামাজিক উপাদান অতপ্রোতভাবে জড়িত। এখানে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণে প্রতিবন্ধকতার কারণসমূহ আলোচনা করা হলো।

সমাজে আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারে অঙ্গহানির ঘটনা বেশী লক্ষ করা যায়। গর্ভবতী মায়েদের পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে অপুষ্ট শিশুর জন্ম হতে পারে। অশিক্ষা ও অসচেতনতা অঙ্গহানির আর একটি কারণ। অনেক সময় চোখের কোনো রোগ বা সংক্রমণ হলে যথাসময়ে চিকিৎসা না হলে দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। গ্লুকোমা বা ডায়াবেটিসের মতো বংশগত রোগের কারণেও দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হতে পারে। ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে বসন্তরোগে এবং ভুল চিকিৎসা বা কোনো ঔষধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ায় দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হওয়ার ঘটনা লক্ষ করার মতো। এছাড়া যুদ্ধ বা আকস্মিক দুর্ঘটনায় মানুষের অঙ্গহানির ঘটনা ঘটে। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে যেমন বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছিল তেমনই অনেক মানুষের অঙ্গহানির ঘটনাটিও উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশকে পোলিও মুক্ত (২৭ মার্চ, ২০১৪) ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু কয়েক দশক আগেও পোলিও রোগে আক্রান্ত হয়ে অনেক শিশু অঙ্গহানির শিকার হয়েছে। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে জিনগত গঠনের সমস্যা থেকেও এই ধরনের শিশুর জন্ম হতে পারে।[১২]

১.১১ অক্ষমতা বিদ্যাচর্চা প্রসঙ্গ

ডিজ্যাবিলিটি কথাটির বাংলা প্রতিশব্দ হলো অক্ষমতা। সাধারণত নানান শারীরিক ও মানসিক সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিদের সমাজে অক্ষম বা প্রতিবন্ধী বলা হয়। প্রাচীন কাল থেকে পৃথিবীর নানান দেশে তথাকথিত অক্ষম ব্যক্তিদের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। পাশ্চাত্যের অনেক দেশে প্রাচীন কালে এদের বেঁচে থাকার অধিকার পর্যন্ত ছিল না। কিন্তু ভারতের মত দেশে এদের বেঁচে থাকার অধিকার স্বীকার করা হয়েছিল। নানান পুরাণ ও কিংবদন্তি থেকে দেখা যায় সমাজে সম্মান ও শ্রদ্ধার আসনও লাভ করেছিলেন কেউ কেউ। যদিও ধারাবাহিকভাবে ভারতে প্রতিবন্ধী চর্চার কোনো ইতিহাস পাওয়া যায় না। মহাকবি ও

পুরাণকারগণ প্রতিবন্ধকতাকে দেখেছেন কখনও কর্মফলের শাস্তি হিসেবে, কখনও আবার মানবচরিত্রের বিশেষ প্রতীক রূপে।

আধুনিক কালে পৃথিবীর নানান দেশে নতুনভাবে প্রতিবন্ধীচর্চা শুরু হয়। বর্তমানে মানবিবীদ্যার মতো অক্ষমতা বিদ্যাচর্চা স্বতন্ত্র্য অ্যাকাডেমিক বিষয়ের মর্যাদা পেয়েছে। অক্ষমতাবিদ্যা চর্চার বিষয়টি উনিশ এবং বিশ শতকের আমেরিকা ও ইউরোপে গবেষকদের একাংশের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বর্তমানে পৃথিবীর নানান দেশে শারীরিক অঙ্গহানিজনিত ব্যক্তিদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। ভারতীয় প্রেক্ষিতে অক্ষমতা বিদ্যাচর্চার বিষয়টির অবস্থান ও প্রাসঙ্গিকতা আজকের দিনে আলোচনার দাবি রাখে।

সাধারণভাবে মনে করা হয় শারীরিক অঙ্গহানিজনিত কারণে একদল মানুষকে অক্ষম বা প্রতিবন্ধী আখ্যা দিয়ে আলাদা করে রাখার রীতি পৃথিবীর নানান দেশে প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে। সুতরাং, ক্ষমতা ও অধিকারের প্রশ্নে তথাকথিত সক্ষম ব্যক্তিদের দ্বারা অক্ষম ব্যক্তিরা শোষিত ও অবদমিত। যদিও বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে হোমার, সুরদাস এবং স্যান্ডারসনের মতো ব্যক্তিরা তাদের যোগ্যতা ও প্রতিভার প্রমাণ দিয়েছেন তবু তাতে তাদের সামাজিক অবস্থানের বিশেষ বদল ঘটেনি। দৃষ্টিহীন হোমারকে অর্থের প্রয়োজনে দেশে দেশে ঘুরতে হয়েছিল। আজকের দিনে হোমার, মিলটন (১৬০৮-১৬৭৪ খ্রীঃ) এবং হেলেন কেলারের (১৮৮০-১৯৬৮ খ্রীঃ) কথা সর্বজনবিদিত; কিন্তু তাতে অক্ষম ব্যক্তিদের প্রতি তথাকথিত সক্ষম ব্যক্তিদের দৃষ্টিভঙ্গির বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি। প্রকৃতপক্ষে শারীরিক সক্ষমতা নিরিখে অক্ষম ব্যক্তিদের সামাজিক অবস্থান নির্ধারণের প্রয়াস থেকেই অক্ষমতাবিদ্যা চর্চার মতো বিষয়ের জন্ম হয়েছে। আমরা স্বাভাবিকভাবে এই প্রশ্ন করতে চাই যে, স্বাভাবিকতা ও সক্ষমতা এক না আলাদা? তাহলে বুদ্ধিগত ও

শারীরিক প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিরাই কি শুধু এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত? আমরা ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির কথা মাথায় রেখে সক্ষমতা ও স্বাভাবিকতার ধারণাগুলি যেমন বিচার-বিশ্লেষণ করবো তেমনই ভারতীয় ক্ষেত্রে অক্ষমতাবিদ্যাচর্চার প্রাসঙ্গিকতাও আলোচনা করে দেখব।

১.১২ ক্ষমতার প্রশ্ন

সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, ক্ষমতার প্রশ্নে সমাজে ধনীদের তুলনায় দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ দুর্বল। আবার সমাজে ও পরিবারে পুরুষদের তুলনায় নারীদের ক্ষমতা কম। কাল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩ খ্রীঃ) মানব সভ্যতার ইতিহাস বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন আদিম সমাজে সাম্যবাদ ছিল। দাস সমাজে ক্ষমতা ছিল প্রভুদের হাতে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে সামন্ত প্রভুদের হাতে। ধনতান্ত্রিক সমাজে ক্ষমতা পুঁজিপতিদের হাতে কুক্ষিগত। স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২ খ্রীঃ) তাঁর বর্তমান ভারত (১৮৯৯ খ্রীঃ) গ্রন্থে ভারতীয় সমাজকাঠামো বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, প্রাচীন যুগে ক্ষমতা ছিল ব্রাহ্মণ পুরোহিতের হাতে। তার পরবর্তী যুগে ক্ষমতা যায় ক্ষত্রিয়দের হাতে এবং সমাজ বিবর্তনের তৃতীয় পর্যায়ে ক্ষমতা বণিক সমাজের হাতে হস্তান্তরিত হয়। তিনি তাঁর একাধিক রচনায় যে শূদ্র জাগরণের কথা বলেছেন তা আসলে শূদ্রদের ক্ষমতায়নের প্রশ্নকেই জোরালো করে। *আমার ভারত অমর ভারত* গ্রন্থে (১৯৮৬ খ্রীঃ) শূদ্র জাগরণ প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য- "নতুন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে।"[১৩] এভাবেই স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর বাণী ও রচনা এবং জীবনচর্যার মধ্যে দিয়ে সমাজের

নিম্নবর্গীয় মানুষের উত্থানের কথা বলেছেন। পরবর্তী কালে নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চা সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের কথা আমাদের নতুনভাবে ভাবতে শেখায়।

আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের ক্ষমতার কথা বলা হলেও আসলে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি ও প্রতিষ্ঠানের হাতে ক্ষমতা কুক্ষিগত হয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গণমাধ্যমগুলি এবং বিজ্ঞাপন সংস্থার মতো প্রতিষ্ঠানগুলি সাধারণের মতামতকে নিয়ন্ত্রণ করে। গণমাধ্যমগুলির পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, তথাকথিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্বের অভাব রয়েছে। তবে ক্ষমতা ও অক্ষমতার সীমারেখাটি ক্রমশ বদলাচ্ছে। আমরা সেই বদলের পক্ষ থেকে ক্ষমতা ও অক্ষমতার বিষয়টিকে দেখতে চাই।

১.১৩ স্বাভাবিকতা ও নিখুঁত শরীরের ধারণা

জনচেতনায় প্রতিবন্ধকতার কয়েকটি প্রতিশব্দ হলো - অস্বাভাবিকতা, অসুস্থতা, অক্ষমতা ইত্যাদি। আর এর বিপরীত ধারণাগুলি হল - স্বাভাবিকতা, সক্ষমতা ইত্যাদি। তাই প্রতিবন্ধকতাকে বোঝার ক্ষেত্রে স্বাভাবিকতার ধারণাটি পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। ইতিহাস, সমাজতত্ব ও দার্শনিক দিক থেকে বিষয়টির পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

শিল্পবিপ্লবের সময় থেকে ইংল্যাণ্ডে উৎপাদন ব্যবস্থায় অধিক মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে মানুষের স্বাভাবিকতা ও সক্ষমতা পরিমাপের প্রবণতা দেখা যায়। তবে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় 'normal' শব্দটির প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। অধিকাংশ মানুষ কী ভাবে, কী বলে, কী আচরণ করে - তার ওপর ভিত্তি করে গণিত ও পরিসংখ্যানবিদ্যা মানুষের স্বাভাবিকতার ধারণাটি তৈরী করে।[১৪] এই ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে স্বল্পবুদ্ধি বা অতি বুদ্ধিসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি স্বাভাবিক নয়। শারীরিক গঠনের প্রশ্নেও অতিশয় দীর্ঘ বা খাটো, স্থূল বা রুগ্ন, কালো বা সাদা ব্যক্তিদেরও স্বাভাবিক বলা যাবে না। আবার

শারীরিক গঠনের প্রশ্নে কোনো মানুষই নিখুঁত দেহের অধিকারী নয়। ইতালির ক্রটনা শহরে এক চিত্রশিল্পী নিখুঁত নারী শরীরের সৌন্দর্য সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে শহরের সমস্ত সুন্দরী মহিলাদের এক স্থানে একত্রিত করেন। তার ছবির জন্য কেউ স্তন, কেউ নিজের মুখ দান করেন।[১৫] ভারতীয় ও গ্রিক পুরাণ অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ দেবদেবী নিখুঁত দেহসৌন্দর্যের অধিকারী। তাই নিখুঁত দেহ হলো ঐশ্বরিক দেহ। গ্রিকপুরাণের হেলেন বা ভারতীয় পুরাণের সরস্বতীর প্রতিরূপ বাস্তবে অসম্ভব।

Lennard J. Davis তাঁর 'Constructing Normalcy' প্রবন্ধে লেখেন,' "This divine body, then, this ideal body, is not attainable by a human."[১৬]

অক্ষমতাবিদ্যাচর্চার প্রতিপাদ্য বিষয় হলো -

১. স্বাভাবিকতার ধারণাটি একটি নির্ধারিত এবং আরোপিত ধারণা;

২. শারীরিক অঙ্গহানিজনিত কারণে কোনো ব্যক্তিকে আলাদা করে রাখা এবং সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা অমানবিক;

৩. মানুষের অঙ্গহানিজনিত সমস্যাটি বাস্তব হলেও অক্ষমতা বা প্রতিবন্ধকতার ধারণাটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে নির্ধারিত ও আরোপিত;

৪. প্রতিবন্ধকতা বিষয়টি চিকিৎসাবিজ্ঞানের মাধ্যমে প্রতিরোধ ও প্রতিকার করলেই আমাদের সামাজিক দায়িত্ব ফুরিয়ে যায় না। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকারের জন্য সামাজিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রয়োজন।

১.১৪ ভারতীয় পুরাণ ও মহাকাব্যে প্রতিবন্ধকতার ধারণা

রামায়ণ ও *মহাভারত* হলো আমাদের জাতীয় মহাকাব্য। কাব্যদ্বয়ে মহাকবিগণ আদর্শায়িত চরিত্র নির্মাণ করেছেন। মহাভারতের কর্ণ, দ্রোণাচার্য, গান্ধারীর শত পুত্র এমনকি পঞ্চপাণ্ডবের মতো গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রগুলির জন্মবৃত্তান্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এদের কারোর জন্মই স্বাভাবিক বা প্রচলিত পদ্ধতিতে হয়নি। তবে এরা ক্ষমতার নিরিখে সমাজের উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি। রামায়ণের রামচন্দ্র নিরঙ্কুশ সুকুমারবৃত্তির অধিকারী, তিনি

ভগবান; সমস্ত শুভশক্তির প্রতীক। রাবণ নিরঙ্কুশ মন্দ চরিত্রের অধিকারী, স্বভাবে তিনি রাক্ষস, সমস্ত অশুভশক্তির অধিকারী। সমাজ নির্ধারিত স্বাভাবিকতার মাপকাঠিতে এদের কাউকেই স্বাভাবিক চরিত্র বলা যাবে না। মহাভারতের ধৃতরাষ্ট্র সমস্ত অশুভশক্তির প্রতীক। দৃষ্টিহীনতা ও বিচারবুদ্ধিহীনতা এখানে সমর্থক। তিনি তাই প্রতীকী অন্ধ চরিত্র। রামায়ণের অন্ধক মুনি তার একমাত্র পুত্রকে হারিয়ে অসহায় হলেও তপস্যার শক্তিতে বলিয়ান, অষ্টাবক্র মুনি তার অঙ্গহানিজনিত সমস্যা নিয়েও জ্ঞান লাভে সক্ষম। কুব্জা এবং নপুংসক আয়ান ঘোষ মহাকাব্যে স্থান পেয়েছে কারণ একজন কংসের নিষেধ সত্ত্বেও কৃষ্ণসঙ্গ লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছিল আর একজন রাধার স্বামী যে রাধা পৌরাণিক লক্ষ্মীর মানবী রূপ। এইভাবে পুরাণ ও মহাকাব্যের চরিত্রগুলো কোথাও তাদের স্বাভাবিকতা হারিয়েছে প্রতীকের আড়ালে কোথাও আবার তাদের অঙ্গ-বৈকল্যকে অন্যভাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

পাশ্চাত্য দেশের মতো কোথাও ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে অক্ষম ব্যক্তিদের হত্যার বিধান দেওয়া হয়নি।[১৭] সমাজ অনুশাসনমূলক বিভিন্ন অনুশাসনে তাদের বেঁচে থাকার অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। তাদের বিবাহ ও উপনয়নের অধিকার দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে বাড়ির প্রধান ব্যক্তি তাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করবেন নচেৎ তিনি ধর্মে পতিত হবেন।[১৮] অন্ধ ব্যক্তিদের দান করা প্রাচীন ভারতে একটি পুণ্য কর্ম বলে বিবেচিত হতো।

প্রাচীন ভারতে অক্ষম ব্যক্তিদের সম্পত্তির অধিকার স্বীকার করা হয়নি। এই ব্যবস্থা কোনো মানুষের স্বাধীন ও স্বনির্ভর জীবনযাপনের পক্ষে প্রতিবন্ধক। দ্বিতীয়ত, পুরোনো সমাজ ও সংস্কৃতিতে দানশীলতাকে একটি সমাজকল্যাণের স্তম্ভ বলে মনে করা হতো আজকের দিনে যা অধিকার বোধে রূপান্তরিত হয়েছে। ফলে আধুনিক রাষ্ট্রের যে কোনো নাগরিক পরমুখাপেক্ষী না হয়েও স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করতে পারে। তাছাড়া পূর্ব জন্মের

পাপের ফলেই মানুষ দৃষ্টিহীন হয় পুরাণ ও মহাকাব্যে এ জাতীয় ভ্রান্ত ধারণাকে সমর্থন করা হয়েছে।

১.১৫ বর্তমান ভারতীয় প্রেক্ষিতে প্রতিবন্ধকতা

আমরা ভারতীয় আইনে প্রতিবন্ধকতার আলোচনা প্রসঙ্গে দেখেছি ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারি যে ভারতীয় সংবিধান গৃহীত হয়েছিল সেখানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সম্পর্কে তেমন কিছু বলা হয়নি। প্রথম ১৯৭৭ সালে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সরকারি ক্ষেত্রে তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর পদ সংরক্ষণের কথা বলা হয়। ১৯৯২ সালে RCI (Rehabilitation Council of India) অ্যাক্ট অনুযায়ী প্রতিবন্ধীদের নাম নথিভুক্তকরণ এবং পুনর্বাসনের কথা বলা হয়েছে। ১৯৯৫ সালের PWD (Person With Disabilities) অ্যাক্ট এবং ২০১৬ সালে RPD (Rights of Person with Disabilities) অ্যাক্টের মাধ্যমে সামাজিক সুরক্ষা এবং কর্মসংস্থানের প্রশ্নে বেশ কিছু সুযোগসুবিধার কথা ঘোষণা করা হলেও বাস্তবে তা কার্যকর করার ক্ষেত্রে নানান ধরনের সমস্যা রয়ে গেছে। বর্তমানে দৃষ্টিহীন ও অন্যান্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা চাকরির ক্ষেত্রে যেসব সুযোগসুবিধা লাভ করেছে তার মূলে রয়েছে নানান ছোটোবড়ো সামাজিক আন্দোলন ও আইনি লড়াইয়ের ইতিহাস।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিক আন্দোলন ও আইনি লড়াই অক্ষমতাবিদ্যাচর্চার বিষয়টির প্রাসঙ্গিকতাকে প্রতিষ্ঠিত করে। দেহকেন্দ্রিক সক্ষমতার ধারণাটি সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণে বিচার-বিশ্লেষণের দাবি রাখে। আশার কথা এই যে, ২০০৬ সালে প্রাথমিকভাবে মুম্বাইয়ের টাটা রিসার্চ ইন্সটিটিউটে প্রতিবন্ধী চর্চা শুরু হওয়ার পর ক্রমশ দিল্লির জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গের রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়সহ ভারতের নানান প্রদেশে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে অক্ষমতাবিদ্যা চর্চা বিষয়টি ক্রমশই গুরুত্ব পাচ্ছে। একথা বলা যেতে পারে আজকের সমাজবাস্তবতার প্রেক্ষিতে

তথাকথিত অক্ষম ব্যক্তিরা যদি যথাযোগ্য নাগরিক অধিকার অর্জন করতে না পারে তাহলে সুস্থ ও উন্নত জীবনযাপন যেমন তাদের পক্ষে অসম্ভব তেমনই সামাজিক অগ্রগতির ক্ষেত্রেও তা সমস্যা সৃষ্টি করবে। তাই অক্ষমতাবিদ্যাচর্চার বিষয়টিকে পাশ্চাত্য থেকে আমদানিকৃত বলে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। ভারতীয় প্রেক্ষিতে তার প্রয়োগ সুনিশ্চিত করতে হবে। সাম্প্রতিক কালে প্রতিস্পর্ধীদের নিয়ে যেসব কাজকর্ম হয়েছে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে তা সাধুবাদ জানানোর যোগ্য। কিন্তু এই সম্বন্ধে আরও বিস্তৃত ও বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার প্রয়োজন আছে। বিশেষত প্রতিস্পর্ধীদের দৃষ্টিকোণে প্রতিবন্ধীদের অবস্থান নির্ণয়ের বিষয়টির বিচার-বিশ্লেষণ হওয়া জরুরি। অন্যান্য প্রতিস্পর্ধীদের তুলনায় শিক্ষাক্ষেত্রে, কর্মজগতে, সমাজে ও পরিবারে দৃষ্টিপ্রতিস্পর্ধীদের লড়াই ও বঞ্চনার ইতিহাস একটু স্বতন্ত্র্য। তাই এই গবেষণায় দৃষ্টিপ্রতিস্পর্ধীদের চর্চা ও অবস্থানের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিচার করা হয়েছে। বিগত একশো বছরে দৃষ্টিহীনদেরও সামাজিক অবস্থানের বিবর্তন ঘটেছে।

জাতিসঙ্ঘের শিশু অধিকার সনদের (সিআরসি) ২৩ নং ধারা অনুযায়ী, অন্যান্য স্বাভাবিক শিশুর মতো প্রতিস্পর্ধী শিশুরাও সম-অধিকার ও সম-সুযোগ পাওয়ার অধিকারী। ২০০৬ সালের ১৩ই ডিসেম্বর জাতিসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে প্রতিস্পর্ধী ব্যক্তিদের অধিকার বিষয়ক একটি সনদ (সিআরডিপি) গৃহীত হয়। এই সনদ ২০০৮ সালের ৩রা মে থেকে কার্যকর হয়। সিআরসি ও সিআরডিপি সনদে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলো প্রতিস্পর্ধী শিশুসহ সব শিশু যেন কোনো ধরণের বৈষম্য ছাড়াই তাদের অধিকার ভোগ করতে পারে, তা নিশ্চিত করবে।[১৯] কিন্তু আমাদের দেশের বাস্তবতা ভিন্ন। প্রতিস্পর্ধীদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী নেতিবাচক। তাদের মেধার বিকাশে যথেষ্ট উদ্যোগ নেই। প্রতিস্পর্ধীদের দিয়ে কিছুই হবে না এই ভেবে তাদের বাতিলের খাতায় ফেলে রাখা

হয়। এমনকি নিজ পরিবারেও প্রতিস্পর্ধী শিশুরা নিগৃহীত হয়। তাদের বোঝা মনে করা হয়। জীবনের প্রতি পদে তারা অবহেলার শিকার হয়। জাতিয় শিক্ষানীতিতে প্রতিস্পর্ধী শিশুদের জন্য বিশেষ শিক্ষা নিশ্চিত করার ব্যাপারে জোর দেওয়া হয়েছে। জাতীয় বাজেটে প্রতিস্পর্ধীদের কল্যাণের জন্য যথেষ্ট বরাদ্দ থাকে না। শ্রবণ ও বাক্ প্রতিস্পর্ধী শিশুদের জন্য এখন পর্যন্ত কোনো মানসম্মত ইশারা ভাষা তৈরী হয়নি। এমনকি দেশে কত জন প্রতিস্পর্ধী শিশু রয়েছে, এ ব্যাপারে সঠিক কোনো পরিসংখ্যান নেই।

'রাজ্য প্রতিবন্ধী আধিকারিক' (পশ্চিমবঙ্গ) থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, প্রতিস্পর্ধী শিশুদের উন্নয়নে সরকারের পক্ষ থেকে যেসব উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে প্রতিস্পর্ধীদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন, দেশের প্রতিটি জেলার একটি উচ্চ বিদ্যালয়ে দৃষ্টিপ্রতিস্পর্ধীদের জন্য আলাদা করে পাঠ দান; কিছু কিছু সরকারি বিদ্যালয়ে প্রতিস্পর্ধী শিক্ষক নিয়োগ, প্রতিস্পর্ধী শিশু ও ব্যক্তিদের জন্য সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র স্থাপন।

আমরা জানি সরকার প্রতিস্পর্ধীদের উন্নয়নের চেয়ে কল্যাণের কাজটি বেশী করে থাকে। সব চেয়ে বড়ো সমস্যা হচ্ছে, প্রতিস্পর্ধীদের দেখভালের বিষয়টি কেবল সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের হাতে ন্যস্ত। প্রতিস্পর্ধীদের উন্নয়নের জন্য প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের নির্দিষ্ট কর্মপরিধি থাকা উচিত। তবেই তাদের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব।

১.১৬ বর্ণবৈষম্য ও স্বাভাবিকতার ধারণা

বাংলায় 'বর্ণ' শব্দটি নানান অর্থে ব্যবহার করা হয়। এই শব্দটির দ্বারা অক্ষর বা রঙের ব্যঞ্জনা যেমন বোঝানো হয় তেমনই আমরা উচ্চবর্ণের মানুষ বলতে বুঝি উচ্চ বংশজাত ব্যক্তি। প্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় বর্ণবৈষম্য প্রচলিত ছিল। শস্ত্র ও শাস্ত্রে শুধুমাত্র উচ্চ বর্ণের মানুষের অধিকার ছিল। দীর্ঘসময় ধরে তা স্বাভাবিক বলে মনে করা হত।

সমাজে প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী অঙ্গহানিযুক্ত ব্যক্তিদের বলা হয় অক্ষম বা অস্বাভাবিক। আবার লিঙ্গ-বৈষম্যের কারণে পুরুষরা নারীদের তুলনায় বেশী সক্ষম। একইভাবে কালো চামড়ার মানুষদের সাদা চামড়ার মানুষরা অক্ষম বানিয়ে রেখেছিল। সে প্রসঙ্গে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক অচিন্ত্য বিশ্বাস তাঁর 'প্রতিবন্ধকতা একটি সমান্তরাল ব্যাখ্যানবিন্দু' নামক নিবন্ধে লেখেন, "কালোরা হয়ত মানুষ নয় - তারা সুন্দর নয়। এই বিকৃত, আংশিক অসম্পূর্ণ নান্দনিকতাকে অস্বীকার করার সাহস দেখিয়েছেন লেমিং।"[২০] এইভাবে সাদা কালোর বৈষম্য সমাজে প্রতিবন্ধকতার এক নতুন মাত্রা তৈরি করে।

আমাদের দেশে প্রাচীন কাল থেকে উচ্চবর্ণের দোহাই দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে বিদ্যাচর্চার অধিকার ও নানান সুযোগ-সুবিধা থেকে দূরে রাখা হয়েছিল। মহাভারতের কর্ণ ও একলব্য চরিত্র দুটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, কর্ণ পরিচয়সূত্রে শূদ্রের সন্তান, তাই তাকে ধনুর্বিদ্যাচর্চার অধিকার দেওয়া হয়নি। অথচ তার দক্ষতা ছিল প্রশ্নাতীত। আবার নিষাদ বংশের সন্তান একলব্য যখন ধনুর্বিদ্যায় দ্রোণাচার্যের শিষ্য অর্জুনকে অতিক্রম করে গিয়েছিল তখন গুরুর আদেশে তার হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলিটি খোয়া যায়। এখানে সক্ষম ব্যক্তিকে বলপূর্বক অক্ষম বানানোর ঘটনাটি লক্ষ্য করার মতো।

প্রাচীন ভারতের বর্ণাশ্রম প্রথা কালক্রমে ভারতীয় সমাজে জাতিভেদ প্রথা ও অস্পৃশ্যতার জন্ম দিয়েছিল। উনিশ শতকের শেষ ভাগের একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে, সে সময় মোট জনসংখ্যার ৩%এর কম হওয়া সত্বেও ব্রাহ্মণরা চাকরি ক্ষেত্রে ৪২% পদ অধিকার করেছিল।[২১] প্রকৃতপক্ষে এই সময় থেকে ভারতের নানা প্রদেশে অব্রাহ্মণ জনগোষ্ঠীর মানুষ অস্পৃশ্যতা ও সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে একত্রিত হচ্ছিল। উনিশ শতকের শেষে মহারাষ্ট্রের জ্যোতিরাও ফুলের (১৮২৭-১৮৯০ খ্রীঃ) নেতৃত্বে সামাজিক

আন্দোলন (১৮৫৪ খ্রীঃ) গড়ে উঠেছিল। এ কথা বলা যেতে পারে ভারতীয় ইতিহাসে সমাজ বিবর্তনের নানা পর্যায়ে অব্রাহ্মণ শ্রেণীর ধর্মান্তরিকরণের মূলে অনেক ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল হিন্দু ব্রাহ্মণ সমাজের নানান বৈষম্যমূলক আচরণ। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হলেও অনেক দিন পর্যন্ত অব্রাহ্মণ আন্দোলনের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ছিল না। ১৯৩০ এর দশক থেকে আন্দোলনের তীব্রতা বাড়তে থাকে। এই সময় থেকে এরা নিজেদের দলিত বলে পরিচয় দেয়। বহুমাত্রিক ভারতীয় সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থাকে দলিত শব্দটি প্রকাশ করে। ১৯৩৬ সালের পর তপশিলী শব্দটি ব্যবহার করা হয়। অন্যদিকে ছিল গান্ধীজীর (১৮৬৯-১৯৪৮ খ্রীঃ) 'হরিজন' শব্দ যার অর্থ হলো ঈশ্বরের লোক।[২২] এই সময় থেকে কংগ্রেস দল দলিত শ্রেণীর আন্দোলনকে নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করে। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে জাস্টিস পার্টি গড়ে ওঠে। ১৯৩৬ সালে বি.আর. আহমেদ করের নেতৃত্বে লেবার পার্টি প্রতিষ্ঠা এবং ১৯৪২ সালে সর্বভারতীয় তপশিলি সংগঠনের প্রতিষ্ঠা সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করেছিল। ইতিপূর্বে উপনিবেশিক শাসনে ব্রিটিশ সরকার চাকরি ক্ষেত্রে তাদের জন্য আসন সংরক্ষণ করেছিল এবং তপশিলী জাতির মানুষদের জন্য স্বতন্ত্র্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিল। প্রকাশ্যে *মনুসংহিতা* পোড়ানো, বলপূর্বক বিভিন্ন হিন্দু মন্দিরে প্রবেশ করা, পুরোহিতদের বয়কট করা ছিল এই সময় আন্দোলন কর্মসূচির অংশ। ১৯৪৬ সালে স্বাধীনতার প্রাক্কালে জাতীয় কংগ্রেস বি. আর. আহম্মেদকরকে ভারতীয় সংবিধানের খসড়া রচনার সভাপতির দায়িত্ব দেয়। তার তত্ত্বাবধানে ভারতীয় সংবিধানে জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা বেআইনি ঘোষিত হয়।[২৩] এইভাবে তপশিলী জাতি, ও উপজাতির মানুষ স্বাধীনতার প্রাক্কালে ভারতের রাজনৈতিক সীমানায় প্রবেশ করতে সক্ষম হয় এবং সামাজিকভাবে নীতিনির্ধারণের ভূমিকা পালন করে। স্বাধীনতার আগে থেকেই তারা সমাজের মূল ধারায় অন্তর্ভুক্ত হতে আরম্ভ

করে। কিন্তু প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে আজও রাজনৈতিক পরিসরে প্রবেশের ঘটনা ঘটেনি। ফলে নীতিনির্ধারণের প্রশ্নই ওঠে না। তবে একথা বলা যেতে পারে বর্তমানে তারা সম্প্রদায় হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে কিছু দূর অগ্রসর হয়েছে।

ভারতীয় আর্থসামাজিক প্রেক্ষিত বিচার করে স্বাধীন দেশের সংবিধানের প্রথম পর্যায়ে তপশিলী জাতি ও তপশিলী উপজাতিদের জন্য শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে পদ সংরক্ষণ করা হয়েছিল। পরবর্তী পর্যায়ে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে ও.বি.সি-দের জন্য একই ধরনের সুযোগসুবিধার কথা বলা হয়। এছাড়া, মহিলাদের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে আসন সংরক্ষণ এবং অঙ্গহানিযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য চাকরি ও শিক্ষা ক্ষেত্রে আসন সংরক্ষণের বিষয়টি পি.ডাবলু.ডি ও আর.পি.ডি অ্যাক্টের মাধ্যমে আইনিভাবে নিশ্চিত করা হয়। সমাজের একাংশের মানুষ সব ধরনের সংরক্ষণের বিপক্ষে। তারা আর্থ-সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া ব্যক্তিদের কোনোরকম সুযোগসুবিধা দেওয়ার পক্ষপাতী নন। অনেক সময় শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে কেউ কেউ বলে থাকেন ওই ব্যক্তি কোটায় সুযোগ পেয়েছে। তারা আর্থসামাজিক পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে বাদ দিয়ে মেধা ও কর্মদক্ষতাকে বিচার করে থাকেন। আসলে তাঁদের এই ধরনের মনোভাবের মূলে কাজ করে ক্ষমতার রাজনীতি। নিম্নবর্ণের প্রতি উচ্চবর্ণের প্রভুত্ব করার মানসিকতা থেকেই এই ধরনের মন্তব্যের জন্ম হয়। তবে ধীরে ধীরে ছবিটা বদলাচ্ছে।

সুদূর অতীতকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সমাজের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, স্বাভাবিকতা ও সক্ষমতার ধারণা দুটি ওতপ্রোতভাবে যুক্ত এবং সমাজের নানান শ্রেণীর দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত। আজকের দিনে দলিত শ্রেণীর আন্দোলন যেমন বহুলাংশে তাদের নাগরিক অধিকার ও সামাজিক সুযোগ-সুবিধাগুলি সুনিশ্চিত করেছে তেমনই দীর্ঘ আইনি লড়াই এবং সামাজিক আন্দোলনের ফলে বর্তমানে দৃষ্টিহীন ও অন্যান্য

প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিরা সমাজের নানান ক্ষেত্রে একাসনে বসার সুযোগ লাভ করেছে। সাম্প্রতিক কালে সমকামী ও তৃতীয় লিঙ্গের অন্তর্ভুক্তিকরণ স্বাভাবিকতার ধারণাটি বদলে দিচ্ছে।

১.১৭ মানবীবিদ্যা ও অক্ষমতাবিদ্যাচর্চা

মানব সমাজ ও সভ্যতার ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, পৃথিবীর সব দেশেই প্রাচীন কাল থেকে শ্রেণীভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় লিঙ্গভিত্তিক শাসন ও শোষণের রীতি প্রচলিত ছিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে মহিলারা দেহ ও লিঙ্গকেন্দ্রিক বৈষম্যের শিকার। প্রতিবন্ধী চর্চার একদল তাত্ত্বিক মানবীবিদ্যা ও অক্ষমতাবিদ্যা চর্চাকে এক সঙ্গে দেখার পক্ষে সওয়াল করেছেন। তাদের মধ্যে ক্যম্বেল (১৯৪১-২০০৫ খ্রীঃ), অলিভার (১৯১৮-১৯৬১ খ্রীঃ), ফ্র্যানকেনস্টাইন (১৮১৮ খ্রীঃ) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। তাদের বক্তব্য হলো তথাকথিত অক্ষম ব্যক্তিরা নারীদের মতো সামাজিক বৈষম্যের শিকার। উভয়ক্ষেত্রের শারীরিক প্রতিচ্ছবি সামাজিক বৈষম্যের উৎস। গবেষকদের একাংশ এই বক্তব্যকে মান্যতা দেননি। তাঁরা বিষয়টির সরলিকরণের বিরোধিতা করেন। তবে উভয়ক্ষেত্রেই যে, সামাজিক বৈষম্যের মূলে দেহকেন্দ্রিক রাজনীতি সক্রিয় থাকে তা অস্বীকার করা যায় না। প্রতিবন্ধকতার তাত্ত্বিক আলোচনা প্রসঙ্গে Susan Wendell তাঁর 'Toward a Feminist Theory of Disability' নামক নিবন্ধে লেখেন, "This theory should be feminist, because more than half of disabled people are woman and approximately 16 percent of woman are disabled."[২৪]

আধুনিক কালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মেয়েদের অধিকার ও সুরক্ষার লড়াই শুরু হয়। ফলশ্রুতিতে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মেয়েরা পূর্ণ নাগরিকের মর্যাদা লাভ করে। আমাদের দেশে উনিশ শতকে নবজাগরণের যুগে কবি-সাহিত্যিক এবং মনীষীগণ মেয়েদের

অধিকার প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসেন। রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রমুখ মনীষীগণ মেয়েদের বাঁচার অধিকার সুনিশ্চিত করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১ খ্রীঃ), স্বামী বিবেকানন্দের (১৮৬৩-১৯০২ খ্রীঃ) মতো ব্যক্তিরা নারীর শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ধারাবাহিকভাবে মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩ খ্রীঃ), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কবি ও লেখকবর্গ মেয়েদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কলম ধরেছিলেন। যদিও দেহ ও লিঙ্গভিত্তিক মানসিকতা সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এখনও বিদ্যমান, তবুও ছবিটা ক্রমশ বদলাচ্ছে। সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মেয়েরা অংশীদারিত্ব লাভ করছে। একইভাবে নানান ধরনের অঙ্গহানিজনিত ব্যক্তিরা দেহকেন্দ্রিক সমাজমানসিকতার শিকার। বহুক্ষেত্রে যোগ্য নাগরিকের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত। কেউ যদি লিঙ্গগত কারণে নারী হয়ে কোনোরকম অঙ্গহানির শিকার হয় তাহলে তাকে সামাজিকভাবে অনেক বেশী শোষণ ও বঞ্চনার মুখোমুখি হতে হয়। তাই একথা বলা যেতে পারে দেহকেন্দ্রিক মানসিকতা দূরে সরিয়ে রেখে তথাকথিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিক, নাগরিক এবং মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মানবীবিদ্যা ও অক্ষমতাবিদ্যা চর্চা সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

১.১৮ প্রতিবন্ধকতার সামাজিক গঠন

বিশ শতকের শেষ তিন দশকে ইংল্যাণ্ডে চাল্টন (১৯২৭-১৯৯৩ খ্রীঃ), ক্যম্বেল (১৯৪১-২০০৫ খ্রীঃ), অলিভার (১৯১৮-১৯৬১ খ্রীঃ), প্রমুখ তাত্ত্বিকদের হাত ধরে প্রতিবন্ধকতার সামাজিক গঠন তত্ত্বটি বিকাশ লাভ করে। প্রতিবন্ধকতার চিকিৎসাকেন্দ্রিক বিষয়টির বিরোধিতা করে এই মতবাদ আত্মপ্রকাশ করে। প্রতিবন্ধকতা বিষয়টিকে যে এ যাবৎ কাল চিকিৎসাবিজ্ঞানের অন্তর্গত একটি বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হতো তার বিরোধিতা করে বলা হয় যে, প্রতিবন্ধকতা একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়। লিঙ্গভিত্তিক মানসিকতার

মতো প্রতিবন্ধকতার ধারণাটিও সমাজ দ্বারা আরোপিত এবং নির্ধারিত। এই তত্ত্বের প্রবক্তাগণ অঙ্গহানি এবং প্রতিবন্ধকতা বিষয় দুটিকে আলাদা করে দেখার পক্ষপাতী। তারা বলেন, অঙ্গহানিজনিত ব্যক্তিদের ওপর প্রতিবন্ধকতা বা অক্ষমতা আরোপ করা হয়। সমাজ ঐতিহাসিকভাবে এই কাজটি করে আসছে। প্রাচীনকাল থেকে প্রাচ্যের মতো পাশ্চাত্যের দেশগুলিতেও মনে করা হতো মানুষের প্রতিবন্ধকতা পূর্বজন্মের পাপের ফল। এই কারণে প্রাচীন ও মধ্যযুগে তাদের শিক্ষাদীক্ষায় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হতো না। ধর্মগ্রন্থ আবৃত্তি এবং সঙ্গীতচর্চা ছিল এদের শিক্ষার মূল বিষয়। আধুনিক যুগেও এদের শারীরিকভাবে অক্ষম বলে বিবেচনা করা হয়েছে অনেক দিন পর্যন্ত।

তাই এ কথা বলা যায় যে, অক্ষম বা প্রতিবন্ধীরা হলো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মতো সামাজিকভাবে অবদমিত একটি শ্রেণী। সমাজ এদের অক্ষমতার তকমা দিয়ে চিহ্নিত করে এবং বিচ্ছিন্ন করে। চিকিৎসাকেন্দ্রিক প্রতিবন্ধকতার গঠনের বিরোধিতা করে বলা হয়েছে যে, অঙ্গহানি প্রতিরোধ ও প্রতিকার অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হলো অঙ্গহানিজনিত ব্যক্তিদের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্ন। সমাজে এদের উপযোগী বাধামুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। যাতে এরা স্বাধীন ও স্বনির্ভর জীবন যাপন করতে পারে রাষ্ট্রকে তার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতিবন্ধকতার গঠনের এই ধারণাগুলি অক্ষমতা বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রকে প্রশস্ত করে এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের পটভূমি প্রস্তুত করে। এই তত্ত্বের মূল কথাগুলি হলো -

১। অঙ্গহানি এবং অক্ষমতা দুটি আলাদা বিষয়;

২। সমাজ অঙ্গহানিজনিত ব্যক্তিদের প্রতিবন্ধী বানায়;

৩। অক্ষমতার তকমা পাওয়া ব্যক্তিরা সমাজের একটি অবদমিত শ্রেণী;

ত্রুটি

এই তত্ত্বের দুর্বলতার জায়গাগুলি হলো -

১। অঙ্গহানি বিষয়টিকে প্রতিরোধ ও প্রতিকার করার বিরোধিতা করা;

২। বিশ্বব্যাপী বাধামুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির বিষয়টি স্বপ্নরাজ্যের কল্পনা;

৩। প্রকৃতপক্ষে এটি একটি চরমপন্থী মতবাদ।

১.১৯ প্রতিবন্ধকতা বনাম প্রান্তিকতা

মানব সমাজ ও সভ্যতার ইতিহাস বিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে ইতিহাস বিচারের মাপকাঠিরও পরিবর্তন হয়েছে। সেই পরিবর্তন মূলত দৃষ্টিভঙ্গিগত। ইতিহাসের তাত্ত্বিক ও গবেষকগণ ইতিহাস বিচারের নানান মাপকাঠি বা দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলেছেন। সেগুলি হলো- ১। কেম্ব্রিজের ইতিহাস চর্চার ধারা, ২। জাতীয়তাবাদী ধারা, ৩। মার্ক্সবাদী ধারা এবং ৪। নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার ধারা। বিশ শতকের শেষ ভাগ থেকে ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গে প্রান্তিকতার ধারণা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। 'নিম্নবর্গের ইতিহাস'চর্চা এই ধারণায় নতুন মাত্রা যোগ করে। সাব্‌লটার্ন স্টাডিজ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮২ সালে। ১৯৮৩ সালে প্রথম সাব্‌লটার্ন স্টাডিজ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।[২৫] এই দশক থেকে নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার ধারণা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। নিম্নবর্গের সমান্তরাল ধারণা হলো প্রান্তিকতার ধারণা। প্রান্তিকতা হলো সমাজের মূল স্রোতের বিপরীত ধারণা। স্বাভাবিকতার ধারণার মতো সমাজের মূল ধারা বলতে বোঝায় অধিকাংশ ধারা। এই ধারণার দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো ভৌগোলিক সীমানা ও সামাজিক বঞ্চনা বা বিচ্ছিন্নতা। সাধারণভাবে যারা কোনো একটি দেশ বা রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চলে বাস করে তাদের বলা হয় প্রান্তেবাসী বা প্রান্তিক যেমন পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষ। আবার এরা সমাজের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন এবং বঞ্চিত। এমতাবস্থায় স্বাভাবিকভাবে আর্থিক অনগ্রসরতা বা দারিদ্রের কথা এসে পড়ে। এখন প্রশ্ন হলো প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষরা প্রান্তিকতার অন্তর্ভুক্ত কিনা, যদি তা হয়, তাহলে কীভাবে? তথাকথিত প্রতিবন্ধী মানুষরা ভৌগোলিকভাবে কোনো নির্দিষ্ট

সীমানার অধিবাসী নয় কিন্তু দারিদ্র, বিচ্ছিন্নতা এবং সামাজিক বঞ্চনা প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দারিদ্রের কারণে মানুষ প্রতিবন্ধকতার শিকার হয় এবং তারা প্রতিবন্ধকতার কারণে আর্থসামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে বাধাপ্রাপ্ত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা সমাজের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করে। সে দিক থেকে প্রান্তিকতা প্রতিবন্ধকতার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এ প্রসঙ্গে গবেষক বুবাই বাগের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য- "স্বাধীনোত্তর ভারতে সামাজিক ইতিহাসে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রান্তিক মানুষেরা ক্রমে নিজস্ব স্থান লাভ করেছে। সেই স্থানে কৃষক ও শ্রমিকদের পাশাপাশি দলিত, শরণার্থী, পরিবেশবাদী ও নারীদের কথা ক্রমে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আবার নিম্নবর্গীয় ইতিহাস চর্চার হাত ধরে বিভিন্ন উপজাতি, সংখ্যালঘু ও অন্যান্য সামাজিক প্রান্তিক মানুষেরা ইতিহাসের সীমানায় প্রবেশ করেছে। সেই সীমানায় নতুন সংযোজন হতে পারে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষের ইতিহাস।"[২৬] তবে সাম্প্রতিক কালে তথাকথিত প্রতিবন্ধী ও অপ্রতিবন্ধীর সীমানা বদলাচ্ছে এবং নানান স্তরে মূলস্রোতিকরণের চেষ্টা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

১.২০ অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজের ধারণা

উনিশ শতকের প্রথম দশক থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অঙ্গহানিযুক্ত মানুষদের জন্য বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে থাকে। তখন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় স্তরে তাদের মূলস্রোতিকরণের দাবি ওঠেনি। কারণ দীর্ঘদিন পর্যন্ত প্রতিবন্ধকতাকে ধর্মের দিক থেকে দেখা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায় বিষয়টি দুঃস্থ ও অনাথদের সেবা বা দয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিল। পরবর্তীকালে প্রতিবন্ধকতাকে চিকিৎসাবিজ্ঞান এবং তৃতীয় পর্যায়ে সামাজিক-সাংস্কৃতিক সমস্যা হিসেবে দেখা শুরু হয়। তখন মূলস্রোতিকরণের প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। আধুনিক কালে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার বিষয়টি সর্বজনবিদিত। শিক্ষাবিজ্ঞানিরা বিশেষ শিক্ষার পাশাপাশি অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। যদিও প্রতিবন্ধী চর্চার তাত্ত্বিকরা

এ বিষয়ে দ্বিধাবিভক্ত। একদল মনে করেন সাধারণ বিদ্যালয়ে পড়াশোনার মাধ্যমে সামাজিক বৈষম্য দূর হতে পারে। আরেক দলের মত হলো বিশেষ বিদ্যালয়ে প্রতিবন্ধীবান্ধব পরিবেশ ও পরিকাঠামো থাকার ফলে তাদের পক্ষে শিক্ষা লাভ সহজ হবে। বাস্তবতা হলো স্বল্প মাত্রায় হলেও বিশেষ বিদ্যালয়ের মাধ্যমে মূলস্রোতিকরণের ঘটনা ঘটেছে। বর্তমান কালে ভারতীয় আইনে পি. ডাবলু. ডি এবং আর. পি. ডি. অ্যাক্টের মাধ্যমে দৃষ্টিহীন ও অন্যান্য প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ছাত্রদের বিশেষ বিদ্যালয়ের পাশাপাশি সাধারণ বিদ্যালয়ে পড়ালেখার অধিকার সুনিশ্চিত করেছে। প্রকৃত পক্ষে ভারতের মতো জনবহুল বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এ জাতীয় পরিকাঠামো নির্মাণ একটি দুঃসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু তত্ত্বগতভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার মাধ্যমেই সামাজিক বৈষম্য ও অবদমন দূরীভূত হতে পারে।

২০০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে জাতিসঙ্ঘের সাধারণ সভায় অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। তার পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা যেতে পারে শুধু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক অন্তর্ভুক্তি ঘটলেই সমস্যার সমাধান হবে না। সামাজিক অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে প্রতিবন্ধকতার তত্ত্বটি সার্থকতা লাভ করতে পারে। অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ বলতে এমন এক ব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে অঙ্গহানিযুক্ত ব্যক্তিদের মানববৈচিত্রের অংশ হিসেবে দেখা হবে যাতে সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্নে কোনো সমস্যা না থাকে। এমন এক ব্যবস্থা যেখানে অঙ্গহানিযুক্ত ব্যক্তিরা স্বাধীন ও স্বনির্ভর জীবনযাপন করতে পারে এবং সামাজিক অগ্রগতিতে অংশীদারিত্ব লাভ করতে সক্ষম হয়।

১.২১ প্রতিবন্ধীচেতনা ও মানবিক উত্তরাধিকার

সাধারণভাবে মনে করা হয় প্রতিবন্ধীরা সমাজের মূল স্রোত থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করে। প্রথমেই সারা দেশে তাদের সুনির্দিষ্ট সংখ্যা নির্ধারণ করা দরকার। নির্দিষ্ট

সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা গৃহীত হতে পারে। ভারতে ব্রিটিশ যুগে প্রতিস্পর্ধী ব্যক্তিদের জনগণনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। স্বাধীন ভারতে প্রথম ২০০১ সালে প্রতিস্পর্ধীদের জনগণনার আওতায় আনা হয়। ২০০১ এর জনগণনা অনুযায়ী সারা দেশে প্রতিবন্ধীদের মোট সংখ্যা ২৬৮১০০০০।[২৭] ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী সেই সংখ্যা কিছুটা কমে দাঁড়ায় ২১০০০০০০ (দৃষ্টিহীন মানুষের সংখ্যা ১৮০০০০০০)।[২৮] একথা বলা যেতে পারে সারা বিশ্বের নিরিখে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী। বিশ্বের সাতশো কোটি জনসংখ্যার পনেরো শতাংশ প্রতিবন্ধী। উন্নয়নশীল দেশে এই সংখ্যা ৫৮.৬৩%। তাই সমাজে বা সাহিত্যে প্রতিবন্ধীদের চেনবার সময় এসেছে। সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের সার্বিক অংশগ্রহণ নিশ্চিতভাবে সমাজের সার্বিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করবে।

১.২২ উপসংহার

আমাদের সমাজে কোনো পরিবারে প্রতিস্পর্ধী কোনো শিশু জন্মালে সেই শিশুকে নিয়ে বাবা-মা খুব সমস্যার মধ্যে পড়ে যায়। শিশুকে রাখবে কোথায়? লোকচক্ষুর আড়ালে তাকে রাখা হয়। এমনকি লুকিয়ে রাখা হয়। কারো কাছে তার কথা বলাও হয় না। এরকম পরিস্থিতিতে তার অধিকারের কথা খুব সহজেই উঠে আসে। দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি অনুযায়ী এসব দলিল বাস্তবায়নে সমাজ তেমন আর আন্তরিক থাকে না। এখন প্রশ্ন হলো বাংলা সাহিত্যে এই সামাজিক বিবর্তন কতখানি ধরা পড়েছে এবং লেখক এ জাতীয় চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন কিনা তা অনুসন্ধান করা এই গবেষণাপত্রের উদ্দেশ্য। আমরা এই অধ্যায়ে চিকিৎসাবিজ্ঞান, আইন ও সামাজিক দিক থেকে প্রতিবন্ধকতা বিষয়টিকে দেখার চেষ্টা করেছি। পাশাপাশি অন্ধ, অক্ষম, প্রতিবন্ধী ইত্যাদি নেতিবাচক শব্দের পরিবর্তে প্রতিস্পর্ধীর মতো সদর্থক পরিভাষা

অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে। আমরা দেখেছি অন্যান্য সামাজিক ধারণার মতো প্রতিবন্ধকতার ধারণাও সময়ের সঙ্গে বদলাচ্ছে। প্রাথমিক ভাবে প্রতিবন্ধকতা বিচারের মাপকাঠি ছিল ধর্ম। সমাজ বিবর্তনের দ্বিতীয় পর্যায়ে চিকিৎসাবিজ্ঞানের দিক থেকে বিষয়টিকে দেখা হয়েছে। তৃতীয় পর্যায়ে প্রতিবন্ধকতা হলো একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যা। নতুন পরিভাষা নির্মাণ বা ভাষাগত বিবর্তনের বিষয়টিও একে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে। উপরের আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি –

প্রথমত, প্রতিবন্ধকতা বিচারের ক্ষেত্রে 'body image' বা শারীরিক প্রতিচ্ছবি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

দ্বিতীয়ত, প্রতিবন্ধকতা হলো লিঙ্গভিত্তিক সংস্কৃতি বা জাতপাতের মতো একটি সামাজিক নির্মাণ।

তৃতীয়ত, অক্ষমতা বিদ্যাচর্চার সূচনা ইউরোপ ও আমেরিকার গবেষকদের হাত ধরে হলেও পৃথিবীর সব দেশেই তা সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। প্রতিবন্ধকতা বিষয়টি আসলে বহুমাত্রিক। দৃষ্টিহীনতা বা অন্যান্য শারীরিক সমস্যাই এর অন্তর্গত নয়। এর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রটি বহু দূরবিস্তৃত। সক্ষমতা ও স্বাভাবিকতার বিপরীত ধারণা হলো অক্ষমতা বা অস্বাভাবিকতা যা আসলে দেশ কালও সমাজের মতোই ক্রমশ বদলে যাচ্ছে।

আমরা অক্ষমতা বিদ্যাচর্চার নিরিখে বাংলা সাহিত্যে সৃষ্ট দৃষ্টিহীন চরিত্রগুলির সামাজিক অবস্থান নির্ধারণ করব। পাশাপাশি লেখকদের সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং সমাজমানসিকতার বিষয়টিও বিচার-বিশ্লেষণ করা হবে। উক্ত গবেষণাপত্রে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ক্রম অনুযায়ী সময়ের বিবর্তনের দিকটি স্মরণে রেখে ধারাবাহিকভাবে বিষয়টি আলোচনা করা হবে।

আমরা মূল সাহিত্যিক আলোচনায় প্রবেশ করার পূর্বে ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গের দৃষ্টিহীনদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থান বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব। পরবর্তী অধ্যায়ে ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গে দৃষ্টিহীনদের সামাজিক অবস্থানের বিবর্তন পর্যালোচনা করার মাধ্যমে সমাজে তাদের অবস্থান বোঝার চেষ্টা করা হবে যা গবেষণার মূল বিষয়কে বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করবে বলেই মনে করি।

তথ্যসূত্র :

১। নন্দ, বিষ্ণুপদ ও ঘোষ, সনৎ কুমার। *বিশেষ শিক্ষার ইতিহাস*। কলকাতা: রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১। পৃ. ৯।

২। পূর্বোক্ত, পৃ. ২।

৩। বিশ্বাস শৈলেন্দ্র সম্পা, *সংসদ বাংলা অভিধান*। সাহিত্য সংসদ: কলকাতা, ২০০৫। পৃষ্ঠা ৫৪২।

৪। *Oxford English Dictionary*, 1994, page 306, 473.

৫। জামান, সুলতানা সারয়াতারা। নন্দ, বিষ্ণুপদ। *ব্যতিক্রমধর্মী শিশু*। মাওলা ব্রাদার্স: ঢাকা, ২০০৫। পৃ. ১৩।

৬। প্রতিস্পর্ধী পত্রিকা, *২০১৩, বিষ্ণুপদ নন্দ।*

৭। বাগ, বুবাই। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবন্ধী মানুষ ও প্রান্তিকতার নানাদিক। গবেষণাসন্দর্ভ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়: কলকাতা, ২০১৫। পৃ. ২২।

৮। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, *২০১৩।* বাংলাদেশ। bdlaws.minlaw.gov.bd

৯। ভট্টাচার্য, ফাল্গুনী। *সাহিত্য ও সিনেমায় প্রতিবন্ধী*। পরম্পরা: কলকাতা, ২০১১। পৃ. ১৫।

১০। প্রতিবন্ধী মানুষের অধিকার আইন, *১৯৯৫* (*PWD)*। https://thenationaltrust.gov.in

১১। *জাতিসংঘ সনদ* https://en.m.wikipedia.org

১২। প্রতিবন্ধী মানুষের অধিকার আইন *২০১৬* (RPD)। https://legislatibe.gov.in

১৩। জামান, সুলতানা সারয়াতারা। নন্দ, বিষ্ণুপদ, *ব্যতিক্রমধর্মী শিশু।* পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৪।

১৪। ডেভিস, জে. লেনার্ড। দ্য *ডিজ্যাবিলিটিস স্টাডিস রিডার*। রুটলেজ টেলোর অ্যান্ড ফ্র্যান্সিস গ্রুপ: লণ্ডন, ২০০৬। পৃ. ১।

১৫। ডেভিস, জে. লেনার্ড। দ্য *ডিজ্যাবিলিটিস স্টাডিস রিডার*। রুটলেজ টেলোর অ্যান্ড ফ্র্যান্সিস গ্রুপ: লণ্ডন, ২০০৬। পৃ. ৩।

১৬। পূর্বোক্ত পৃ. ৪।

১৭। নন্দ, বিষ্ণুপদ ও ঘোষ, সনৎ কুমার। *বিশেষ শিক্ষার ইতিহাস*। কলকাতা: রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১। পৃ. ১০

১৮। পূর্বোক্ত, পৃ. ১২।

১৯। *বিশেষ শিক্ষার ইতিহাস*। পূর্বোক্ত পৃ. ১২।

২০। বিশ্বাস, অচিন্ত্য। "প্রান্তিকতার একটি সমান্তরাল ব্যখ্যানবিন্দু", পৃ. ৬।

২১। মুখোপাধ্যায়, ধ্রুবকুমার। *বাংলার সমাজ সংস্কৃতি ও নানা আন্দোলনের ইতিকথা*। কলকাতা বইমেলা: প্রজ্ঞাবিকাশ ২০২০। পৃ. ২৪৫।

২২। পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৫।

২৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৫।

২৪। পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৫।

২৫। চট্টোপাধ্যায়, পার্থ। ভদ্র, গৌতম। *নিম্নবর্গের ইতিহাস*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৮। পৃ. ১।

২৬। বাগ, বুবাই। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবন্ধী মানুষ ও প্রান্তিকতার নানাদিক। গবেষণাসন্দর্ভ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়: কলকাতা, ২০১৫। পৃ. ১।

২৭। https://www.indiabudget.gov.in

২৮। https://en.m.wikipedia.org

দ্বিতীয় অধ্যায়

দৃষ্টিহীনদের সামাজিক অবস্থানের অগ্রগতি ও বিবর্তন

২.১ সূচনা

আমরা *প্রথম অধ্যায়ে* প্রতিবন্ধকতা ও দৃষ্টিহীনতার সংজ্ঞা ও স্বরূপ নির্ধারণের চেষ্টা করেছি। সে প্রসঙ্গে প্রতিবন্ধকতার সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রসঙ্গত সঠিক পরিভাষা অনুসন্ধানেরও চেষ্টা করেছি। আমাদের মূল আলোচ্য এলাকা হলো আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও দৃষ্টিহীনতা। সাহিত্যের মূল আলোচনায় প্রবেশের ক্ষেত্রে আমরা সমাজে দৃষ্টিহীনদের অবস্থানগত বিবর্তনের একটি রূপরেখা অঙ্কনের চেষ্টা করব। পুরাণ ও কিংবদন্তী থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক কালের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট যেমন এই আলোচনায় গুরুত্ব পাবে। সে প্রসঙ্গে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিবর্তনের ধারাগুলিও গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করা হবে।

২.২ পুরাণে ও মহাকাব্যে প্রতিবন্ধীদের অবস্থান

সমাজে দৃষ্টিহীনদের অবস্থান অনুসন্ধান আমাদের মূল উদ্দেশ্য। সে প্রসঙ্গে আমরা পুরাণ, মহাকাব্য এবং ইতিহাসের সাহায্যে বিষয়টি নির্ধারণের চেষ্টা করব। পুরাণ ও মহাকাব্যে সরাসরি সমাজের ছবি না থাকলেও নানান লৌকিক পরম্পরা এবং বিভিন্ন সময়ের ধ্যান-ধারণা গ্রন্থগুলির মধ্যে নিহিত আছে। তাই সমাজে দৃষ্টিহীনদের অবস্থান নির্ধারণ প্রসঙ্গে পুরাণ ও মহাকাব্যে প্রতিবন্ধী চর্চার পরম্পরাটি বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব।

প্রাচীনকাল থেকে মানবসভ্যতার ইতিহাসে প্রতিস্পর্ধী মানুষের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। যদিও ঐতিহাসিক ব্যক্তি হিসেবে প্রতিস্পর্ধী মানুষের কথা বড়ো একটা পাওয়া যায়

না। হয়তো এর মূলে সক্রিয় রয়েছে সক্ষমতা ও অক্ষমতার প্রশ্ন। কিন্তু নানান কিংবদন্তি, ভারতীয় পুরাণ ও মহাকাব্যে আমরা নানান ক্ষেত্রে এ জাতীয় চরিত্রের দেখা পাই। মহাকবি ও পুরাণকারগণ কখনো এদের চিত্রিত করেছেন বিশেষ প্রতীকী চরিত্র হিসেবে। কখনো আবার সমাজে ও পরিবারে ক্ষমতার প্রশ্নে জীবনের লড়াই ও বঞ্চনাসহ এদের হাজির করা হয়েছে। *মহাভারত* এর ধৃতরাষ্ট্র, *রামায়ণ* এর অন্ধকমুনি, *লোরচন্দ্রানী* কাব্যের চন্দ্রানীর স্বামী বামন, *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যের আয়ান ঘোষ প্রতিস্পর্ধী চরিত্র। *মহাভারত* এর ধৃতরাষ্ট্র একাধারে প্রতীকী চরিত্র - মানুষের লোভ, অহঙ্কার ও বিচারবুদ্ধিহীনতার প্রতীক। অন্যদিকে সক্ষমতার প্রশ্নে তাকে আঁকা হয়েছে অক্ষম চরিত্র হিসেবে। রাজসিংহাসন লাভের মধ্যে দিয়ে সে সমাজে ও পরিবারে তার ক্ষমতা কায়েম করতে চায়। তার জন্য দ্বিতীয় কোনো পথ খোলা নেই। তবে তৎকালীন সমাজ অনুশাসন তাকে রাজা হওয়ার অধিকার দেয় না। রাজা হওয়ার জন্য সমাজে ও পরিবারে তাকে নানান উপহাসের সম্মুখীন হতে হয়।

রামায়ণ এর অন্ধক মুনি রাজা দশরথের হাতে তার একমাত্র পুত্রকে হারিয়ে অসহায়। চন্দ্রানীর স্বামী বামন হওয়ার কারণে যথাসাধ্য নিজ স্ত্রীকে রক্ষা করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। আয়ান ঘোষের ক্ষেত্রেও তার যৌন প্রতিবন্ধকতা তার স্ত্রীকে পরকীয়া সম্পর্কের দিকে ঠেলে দেয়। আমরা দৃষ্টিপ্রতিস্পর্ধীদের সামাজিক অগ্রগতি ও বিবর্তন পর্যালোচনা করার ক্ষেত্রে তাদের শিক্ষা, পুনর্বাসন এবং সাহিত্য-সংস্কৃতির ইতিহাসের একটি রূপরেখা অঙ্কনের চেষ্টা করব। আধুনিক যুগে এ সম্বন্ধে পর্যাপ্ত তথ্য থাকলেও প্রাচীন ও মধ্যযুগের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত তথ্যের অভাব রয়েছে।

আজকের দিনেও সমাজের নানান ক্ষেত্রে প্রতিস্পর্ধী মানুষের প্রতিনিধিত্বের অভাব যেমন লক্ষ্য করা যায় তেমনই সাহিত্য ও সংবাদপত্রে এ সম্বন্ধে লেখালেখি হয়েছে সামান্যই। পশ্চিমবঙ্গের গণমাধ্যমগুলি প্রতিস্পর্ধীদের বিষয়ে টুকরো খবর করলেও

জনসচেতনতা বৃদ্ধির ব্যাপারে নির্দিষ্ট তাত্ত্বিক অবস্থান থেকে যথেষ্ট সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে না। আজকের দিনে গণমাধ্যমের ভূমিকা যেকোনো বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি যা নিঃসন্দেহে সামাজিক আন্দোলনের হাতিয়ার। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন ব্লাইন্ড বয়েজ অ্যাকাডেমির অধ্যক্ষের কথায় "গণমাধ্যম সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষের পিছনে ছোটে। তারা অ্যাকশন চায়, বাজার চায়"।[১] পিছিয়ে পড়া এই দৃষ্টিহীন সত্তা বস্তুগত অধিকারের পরেও যে মানবিক অধিকার দাবি করে, তার প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাবনাময় পথের অনুসন্ধান করাই এই গবেষণার উদ্দেশ্য। অন্যান্য প্রতিস্পর্ধীদের থেকে দৃষ্টি প্রতিস্পর্ধীরা কোন্ অবস্থানের সূচক তা দেখা প্রয়োজন।

প্রতিস্পর্ধী ব্যক্তিদের বিষয়ে সামাজিক ধারণা হলো এরা পারে না, এরা বিপদে পড়া একটি জনগোষ্ঠী। বিশেষত দৃষ্টি প্রতিস্পর্ধীদের বিষয়ে এই ধারণা আরো নেতিবাচক। সাধারণ সামাজিক ধারণা হলো দৃষ্টিহীনরা জন্মগতভাবে সঙ্গীতে পারদর্শী, এদের প্রধান পেশা ভিক্ষাবৃত্তি, এরা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। অলৌকিক ক্ষমতার সাহায্যে এরা পথ-ঘাট মুখস্থ রাখে এবং দৈনন্দিন জীবনে অন্যান্য কাজকর্ম করতে সক্ষম হয়। মহাভারতের ধৃতরাষ্ট্র রাজা হওয়া সত্ত্বেও নানাভাবে লাঞ্ছিত ও উপহাসিত হয়েছেন। *রাজা অইদিপৌস* নাটকে যেভাবে নাটকের প্রয়োজনে তেইরেসিয়াসকে আনা হয়েছে তা নেতিবাচক পরিচয়ের দৃষ্টিভঙ্গিই বহন করে। প্রাচীন সাহিত্যে বহুক্ষেত্রে দৃষ্টিহীনদের অশুভ হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে।

২.৩ সামাজিক প্রবাদ প্রবচনে দৃষ্টিহীনদের ধারণা

বাংলা প্রবাদ-প্রবচনগুলি সমাজের দীর্ঘ দিনের ধারণা ও সংস্কারের সাক্ষ্য বহন করে। দৃষ্টিহীনদের নিয়ে যেসব প্রবাদ-প্রবচন গড়ে উঠেছে তার অর্থ ও প্রায়োগিক দিক সম্পর্কে আলোচনা করলে এ বিষয়ে সামাজিক ধ্যান-ধারণার পরিচয় পাওয়া যাবে। যেমন 'কানা

খোঁড়া তিনগুণ বাড়া' প্রবাদটির পাঠান্তরে 'কালা কানা খোঁড়া, এক অঙ্গে বাড়া'-ও শোনা যায়। প্রবাদটি দ্ব্যর্থবোধক। এর প্রথম অর্থ হল প্রতিস্পর্ধী ব্যক্তিরা বেশীমাত্রায় বদ গুণের অধিকারী। সাধারণত এই অর্থে প্রবাদটির বেশী প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। দ্বিতীয় অর্থে প্রতিস্পর্ধীকতার কারণে শরীরের কোনো একটি অঙ্গ নিষ্ক্রিয় থাকায় অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলি অধিক সক্রিয়।

আবার 'পুকুরের শত্রু পানা, দেশের শত্রু কানা' প্রবাদে দৃষ্টিহীনদের অশুভ হিসেবে দেখা হয়েছে। এর প্রকৃত অর্থ হল সমাজ ও পরিবারের পক্ষে দৃষ্টিপ্রতিস্পর্ধীরা ক্ষতিকারক। 'অন্ধের কিবা দিন, কিবা রাত' প্রবাদটির অর্থ দৃষ্টিপ্রতিস্পর্ধী ব্যক্তির দিনরাত্রির ধারণা থাকে না। 'অন্ধ' শব্দটি সাধারণভাবে নেতিবাচক অর্থে প্রয়োগ করা হয়। অন্ধতা বলতে আমরা বুঝি অজ্ঞতা, আবার 'অন্ধ স্নেহ', 'অন্ধ ভালোবাসা' অর্থে আমরা বিচারবুদ্ধিহীনতাকে ইঙ্গিত করি। 'কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন' প্রচলিত এই প্রবাদের মধ্যেও মানুষের দৃষ্টিহীনতাকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। 'অন্ধের হস্তীদর্শন' প্রবাদের মধ্যে দিয়েও বলা হয় দৃষ্টিপ্রতিস্পর্ধী ব্যক্তির কোনো বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান হওয়া সম্ভব নয়। সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে আমরা 'বোবার শত্রু নেই' কথাটি প্রায়ই ব্যবহার করে থাকি। আবার কেউ দেখা কিম্বা শোনার ব্যাপারে অমনোযোগী হলে আমরা 'চোখে কানা', 'কানে কালা' কথাগুলি ব্যবহার করে থাকি। জীবনের একমাত্র অবলম্বন বা নির্ভরতা বোঝাতে 'অন্ধের যষ্ঠি' কথাটি ব্যবহার করা হয়। বাংলা সাহিত্যে এর ব্যবহার আমরা বহুস্থলে লক্ষ্য করেছি।

বাংলা প্রবাদের আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে এগুলি মানসিক ধারণা সঞ্জাত, বিজ্ঞানবুদ্ধির দ্বারা সমর্থিত নয়। তবে ভাষা যেহেতু সংস্কৃতির অন্যতম বাহন তাই ভাষা ব্যবহার, তার গ্রহণ ও বর্জন সাংস্কৃতিক বিবর্তনকে ব্যখ্যা করতে সাহায্য করে। সেদিক থেকে প্রবাদে প্রকাশিত প্রতিবন্ধকতার ধারণাগুলি সাংস্কৃতিক বিবর্তনকে ব্যখ্যা

করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। ওপরে উল্লিখিত প্রত্যেকটি প্রবাদ প্রবচন নিঃসন্দেহে সমাজে দৃষ্টিপ্রতিস্পর্ধী ব্যক্তি সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাবের পরিচয় বহন করে। বর্তমানে এই ধারণার কিছু পরিবর্তন এসেছে। বর্তমানে তাই কানা, খোঁড়া, অন্ধ প্রতিস্পর্ধী সম্বন্ধে Differently Able বা Physically Challenged বলার প্রবণতা দেখা দিয়েছে। এ বিষয়ে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন ব্লাইণ্ড বয়েজ অ্যাকাডেমির অধ্যক্ষ বলেন, "এটা শুনতে ভালো লাগার জিনিস, তার বাইরে এর কোনো গুরুত্ব নেই।"[২] বিশিষ্ট অধ্যাপক বিষ্ণুপদ নন্দের মতে স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন ছাত্ররাই যে ব্যতিক্রমী তা নয়, মেধাবী ছাত্ররাও অন্যদের তুলনায় ব্যতিক্রমী। তিনি 'প্রতিবন্ধী' শব্দের পরিবর্তে 'ব্যতিক্রমধর্মী' শব্দ ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

২.৪ দৃষ্টিহীনদের সম্পর্কে পাশ্চাত্য ধারণা

সুদূর অতীতকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত নানাবিধ বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে সমাজ আজকের চেহারা লাভ করেছে। কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সামাজিক অবস্থান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ওই ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সামাজিক অস্তিত্ব, সমাজে তার পরিচয় এবং তার সম্পর্কে প্রচলিত সামাজিক মনোভাব বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। প্রাচীনকাল থেকে মানব সমাজে দৃষ্টিহীন ব্যক্তির অস্তিত্ব প্রমাণিত। এদের অনেকেই সাহিত্য, দর্শন, সঙ্গীত এমনকি গণিত ও বিজ্ঞানের নানান শাখায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তবু সমাজে প্রাচীনকাল থেকে দৃষ্টিহীন মানুষ সম্পর্কে বহুবিধ ভ্রান্ত ধারণা এবং নেতিবাচক মনোভাব প্রচলিত। প্রাচীনকাল থেকে মনে করা হয় এরা সমাজ ও পরিবারের পক্ষে বোঝা স্বরূপ এবং সমাজের সামগ্রিক উন্নতিতে এদের কোনো ভূমিকা বা দায়িত্ব নেই। প্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত ধারণাগুলির মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ধারণা হলো এরা জন্মগতভাবে সঙ্গীতে দক্ষ এবং অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। এরা জাদু জানে, মানুষের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারে।[৩] দৃষ্টিহীনতা

যে মানুষের কৃতকর্মের ফল এ বিশ্বাস পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্যের দেশগুলির মধ্যে প্রচলিত ছিল। ঈডিপাস তার মায়ের নগ্ন রূপ দেখেছিল বলে তাকে দৃষ্টিশক্তি হারাতে হয়েছিল।[৪]

সমাজে মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকা দূরস্থ, প্রাচীনকালে দৃষ্টিহীনদের বেঁচে থাকার অধিকার পর্যন্ত ছিল না। রোমে, এথেন্সে এবং স্পার্টায় দৃষ্টিহীন শিশুদের নির্মমভাবে হত্যা করার রীতি প্রচলিত ছিল। বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক প্লেটো এই রীতির সমর্থক ছিলেন। এই প্রসঙ্গে গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল লিখেছিলেন "Let it be a Law that nothing imperfect should be brought up."[৫] অ্যারিস্টটলের এই মতবাদের ফলে স্পার্টায় দৃষ্টিহীন শিশুদের হত্যার পক্ষে সরকারিভাবে আইন প্রণীত হয়।

২.৫ দৃষ্টিহীনদের সম্পর্কে ভারতীয় ধারণা

প্রাচ্যে, বিশেষত ভারতে দৃষ্টিহীনদের সম্পর্কে নানান নেতিবাচক মনোভাব প্রচলিত থাকলেও এখানে এদের নির্মমভাবে হত্যা করার কথা চিন্তা করা হয়নি। পাশ্চাত্যের মতোই ভারতেও এই ধারণা প্রচলিত ছিল যে দৃষ্টিহীনতা মানুষের পূর্বজন্মের কৃতকর্মের ফল। *মনুসংহিতার* সূত্রগুলিতে তার প্রমাণ আছে। *অনুগীতার* ষষ্ঠ অধ্যায়ে ২৫ নং শ্লোকে বলা হয়েছে – "মগ্ন্যাস্তমসি দুর্বৃত্তাঃ স্বকর্মবৃত লক্ষণাঃ"।।[৬]

রামায়ণ এবং *মহাভারত* মহাকাব্যেও দৃষ্টিহীনতার জন্য কোনো ব্যক্তি অথবা তার পিতামাতার কৃতকর্মকে দায়ি করা হয়েছে। মহাভারতে ব্যাসদেবের সাথে সঙ্গমকালে অম্বিকা ব্যাসদেবের ভৈরবমূর্তি দেখে ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলার কারণে তাদের পুত্র ধৃতরাষ্ট্র দৃষ্টিহীন হন। এ প্রসঙ্গে কাশীরাম দাশের মহাভারতে উল্লেখ করা হয়েছে যে-

"কৃষ্ণবর্ণ অঙ্গ পিঙ্গল জটাভার।
ভয়ঙ্কর মূর্তি যেন ভৈরবাকার।।
দেখি মহাভয়ে রাণী (বিচিত্রবীর্যের পত্নী অম্বিকা) মুদিল নয়ন।
ব্যাসমুনি হইল বিষময় বদন।।

মহা বলবন্ত মাতা হইবে কুমার।
অযুত হস্তির বল হইবে তাহার।।
তবে দশমাস পরে ধৃতরাষ্ট্র হইল।
যুগল নয়ন অন্ধ মুনি যাহা কইল"।।[৭]

প্রাচীন ও মধ্যযুগের সমাজে দৃষ্টিহীনদের সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব থাকলেও কোনো-কোনো ক্ষেত্রে ইতিবাচক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। মনুর সূত্রে অক্ষম ব্যক্তিদের পারিবারিক সম্পত্তির অধিকার স্বীকার করা হয়নি, কিন্তু ওই সূত্রে বলা হয়েছে পরিবারের প্রধান অক্ষম ব্যক্তিদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতে বাধ্য থাকবেন। তা না করলে তিনি ধর্মে পতিত হবেন।[৮] বোধায়ন বলেন যে, সেই সময় বৈশ্য, শূদ্র ও ক্ষত্রিয় সমাজে অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ উপনয়ন প্রথা প্রচলিত ছিল।[৯] এই উপনয়নের মাধ্যমে তাদের প্রাথমিক শিক্ষার অধিকার এবং বিবাহের স্বীকৃতি দেওয়া হত। এছাড়া কোনো অক্ষম ব্যক্তিকে রাজা বা সরকারকে কর দিতে হবে না- একথাও বোধায়নের সূত্র থেকে জানা যায়। অক্ষম ব্যক্তিদের দয়া করা বা দান করার বিষয়টিও প্রাচীনকালের নানা গ্রন্থে সমর্থিত হয়েছে।

রামায়ণে বিবৃত অন্ধক মুনির ঘটনাটি একইসঙ্গে ইতিবাচক ও নেতিবাচক পরিচয়ের সাক্ষ্য বহন করে। এই সময় কোনো দৃষ্টিহীন ব্যক্তি তার প্রজ্ঞা ও তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করলে সমাজে তাকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের আসনে বসানো হত। এদিক থেকে অন্ধক মুনির ঘটনাটি সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক। আবার একই ঘটনা বিবৃতি থেকে বলা যায় যে, দৃষ্টিহীনতা মানুষের কৃতকর্ম বা অভিশাপের ফল এই বিশেষ নেতিবাচক মনোভাবটিও রামায়ণে গুরুত্ব পেয়েছে।

রাজা দশরথ মৃগয়া করতে এসে ভুলবশত হরিণ জ্ঞানে অন্ধক মুনির পুত্র সিন্ধুর প্রতি শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপ করেন। পুত্রের এই মর্মান্তিক মৃত্যু সংবাদ শুনে সিন্ধুর পিতা

রাজা দশরথকে তার দৃষ্টিহীনতার কারণ উল্লেখ করে বলেন যে, মুনির অভিশাপেই তিনি এবং তার স্ত্রী দৃষ্টি হারিয়েছেন। মানুষ তার কৃতকর্মের ফল ভোগ করে। তিনি অভিশাপ দেন, তার মতোই পুত্রশোকে রাজা দশরথের মৃত্যু ঘটবে। কৃত্তিবাসের *রামায়ণ*-এ এই ঘটনার বিবরণ আছে–

"পূর্বকথা বলি রাজা শুন দিয়া মন।
যে শাপে হইল মম অন্ধ এ লোচন।।
ত্রিজটা মুনির দুই চরণ ডাগর।
মাগিতে আইল ভিক্ষা মম পিতৃঘর।।
পিতা আমি আমাকে কহেন সেই কালে।
দণ্ডবৎ করহ মুনির পদতলে।।
গদা পা দেখিয়া তার ঘৃণা হইল মনে।
এমন পায়ের ধূলা লইব কেমনে।।
নয়ন মুদিয়া লইলাম পদধূলি।
আশীর্বাদ দিলে মুনি 'এবমস্তু' বলি।।
ব্যর্থ না হইল সেই মুনির বচন।
তাহাতে হইল অন্ধ আমার লোচন।।
সেই মতন করিলেন আমার গৃহিণী।
দোঁহাকে করিয়া অন্ধ ঘরে গেল মুনি।।
আর কিবা দশরথ শাপিব তোমাকে।
সেই মত তব প্রাণ যাবে পুত্রশোকে"।।[১০] (কৃত্তিবাসী রামায়ণ)

২.৬ দৃষ্টিহীনদের শিক্ষার ইতিহাস: ব্রেল আন্দোলন

দৃষ্টিহীনদের শিক্ষার ইতিহাসে ভ্যালেন্টিন হুয়ে এবং লুই ব্রেল দুটি অবিস্মরণীয় নাম। হুয়ে ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সে প্রথম এই ধরনের বিদ্যালয় গড়ে তোলেন। ওই স্কুলেরই ছাত্র লুই ব্রেল 'ব্রেল বর্ণমালা'-র সার্থক রূপকার। এ প্রসঙ্গে ফরাসী সৈনিক চার্লস বার্বিয়ের নাম সবিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। তার আবিষ্কৃত 'Night Writing' বা 'রাতের লিখন' পদ্ধতিকে লুই ব্রেল আরো সহজবোধ্য এবং ব্যবহার উপযোগী করে দৃষ্টিহীনদের শিক্ষার

জগতে নয়া বিপ্লবের সূচনা করেন। ১৮০৯ থেকে ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দ তার জীবৎকাল। এই স্বল্পকালীন সময়ে দৃষ্টিহীনদের পঠন-পাঠনের জন্য ব্রেল বর্ণমালার রূপায়ণে তিনি যে অবদান রেখে গেছেন তা বহু শতাব্দী জমে থাকা অন্ধকার কাটিয়ে তাদের জীবনে জ্ঞানের আলোকবর্তিকা জ্বেলে দিয়েছে।

আধুনিক যুগে দৃষ্টিহীনদের শিক্ষার জন্য যতদিন ব্রেল বর্ণমালা প্রবর্তিত হয়নি ততদিন পর্যন্ত মোটা কাগজ বা কাঠের উপর ঠেলে তোলা অক্ষরের সাহায্যে দৃষ্টিহীনদের শিক্ষাদান করা হত। এই পদ্ধতি পঠন-পাঠনের পক্ষে সহজসাধ্য ও সুবিধাজনক ছিল না। এর মাধ্যমে যথেষ্ট পরিমাণে গ্রন্থ পাঠ করা সম্ভব ছিল না। ছোটোবেলা থেকেই লুই ব্রেল এই অসুবিধা সম্পর্কে অবগত হন এবং নতুন উন্নততর পদ্ধতি অনুসন্ধান করতে থাকেন। ইতিমধ্যে ছাত্রাবস্থায় তিনি চার্লস বার্বিয়ের রাতের লিখন পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নেপোলিয়নের সৈন্যদলে এই পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। রাতের লিখন পদ্ধতিতে কোনো অক্ষরের বালাই ছিল না। বারোটি বিন্দুর সাহায্যে বিভিন্ন ধ্বনি বা সংকেতের আদান-প্রদান করা হত। লুই ব্রেল ছাত্রাবস্থা থেকেই বার্বিয়ের অনুমতি নিয়ে এ সম্পর্কে গবেষণা শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত বারোটি বিন্দুর পরিবর্তে ছটি বিন্দু নিয়ে ৬৩ টি চিহ্ন তৈরি করেন। এই ৬৩ টি চিহ্নের সাহায্যে পৃথিবীর প্রায় সব ভাষারই বর্ণমালা ও অন্যান্য সংকেত প্রকাশ করা সম্ভব। তিনি অনুভব করেন মানুষের আঙুলের ডগায় স্পর্শশক্তি সব চেয়ে বেশি। আঙুলের সাহায্যে এক সঙ্গে ৬ টি বিন্দু স্পর্শ করা সম্ভব। তাই তিনি ১২ টি বিন্দুর পরিবর্তে ৬ টি বিন্দু গ্রহণ করেছিলেন।

লুই ব্রেলের এই আবিষ্কার প্রাথমিকভাবে দৃষ্টিহীন ছাত্র এবং শিক্ষক সহকর্মীরা সাদরে গ্রহণ করলেও স্কুল কর্তৃপক্ষ মেনে নেয়নি। শেষ পর্যন্ত সাফল্যের নিরিখে স্কুল কর্তৃপক্ষ তা মেনে নিতে বাধ্য হয়। ১৮৫৪ সালে ফ্রান্সে ব্রেল বর্ণমালা সরকারিভাবে স্বীকৃতি

লাভ করে। ১৮৭৮ সালে প্যারিসের এক সম্মেলনে ইউরোপের প্রত্যেকটি দেশ সরকারিভাবে ব্রেল বর্ণমালা গ্রহণ করে। ১৯১৭ সালে আমেরিকাতেও সরকারিভাবে স্বীকৃত হয়। ১৯৫১ সালে ইউনেস্কোর উদ্যোগে বিশ্বের ৩০ টি দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে World Braille Council গঠিত হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল ধ্বনিতত্ত্বের ভিত্তিতে অভিন্ন ব্রেল প্রতীক ব্যবহারের মাধ্যমে এক বিশ্বব্রেল লিপিমালার উদ্ভাবন করা। আরবি লিপি ব্যবহারকারী বিভিন্ন দেশ এবং ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চলে অভিন্ন ব্রেল লিপিমালা প্রবর্তিত হয়। এই সংস্থার উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার ফলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে তৈরি হলো ব্রেল ছাপাখানা, গড়ে উঠল দৃষ্টিহীনদের জন্য ব্রেল গ্রন্থাগার।

বর্তমানে দিকে দিকে ব্রেল ছাপাখানা ও ব্রেল গ্রন্থাগার গড়ে ওঠার ফলে দৃষ্টিহীনরা সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন শিক্ষার নানা শাখায় জ্ঞানলাভের সুযোগ পেয়েছেন। ব্রেল পদ্ধতি সম্পর্কে এখনও সচেতনতা বৃদ্ধি এবং বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার সুযোগ আছে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্রেল বই কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে খুঁজে পাওয়া যায় না। ব্রেল পদ্ধতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে আরো দ্রুত পঠন ও লিখনের ব্যাপারে বিজ্ঞানের সহায়তা নিশ্চিতভাবে প্রয়োজন। সাম্প্রতিককালে কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে টকিং বুক তৈরি করার যে চেষ্টা লক্ষ করা যাচ্ছে এ সম্বন্ধে আরো সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগ গৃহীত হলে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে যাবে। দৃষ্টিহীনদের শিক্ষার ইতিহাসকে দু'ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যায়। এ প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য শিক্ষার ক্ষেত্রে দৃষ্টিহীনদের শিক্ষার সূচনা, শিক্ষার প্রসার এবং শিক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনার অবকাশ আছে। এখানে বলে রাখা ভালো প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাচীন ও মধ্যযুগে দৃষ্টিহীনদের শিক্ষার পদ্ধতি এবং শিক্ষার অগ্রগতি সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য তথ্যের অভাব আছে।

২.৭ পাশ্চাত্য ক্ষেত্রে দৃষ্টিহীনদের শিক্ষার ইতিহাস

পাশ্চাত্য দেশে মূলত অষ্টাদশ শতকে বিজ্ঞান ও মানবতার যুগে দৃষ্টিহীনদের শিক্ষার সূচনা এবং পদ্ধতি সম্পর্কে নতুন করে চিন্তা ভাবনা শুরু হয়। ভারত ও প্রাচ্যের অন্যান্য দেশ ইউরোপের ভাবধারায় প্রভাবিত হয় এবং দৃষ্টিহীনদের শিক্ষার বিস্তারে তৎপর হয়ে ওঠে। পাশ্চাত্য সমাজের প্রেক্ষিতে বার্থোল্ড লোয়েনফেল্ড দৃষ্টিহীনদের শিক্ষা ও পুনর্বাসনের ইতিহাস সম্পর্কে তিনটি পর্যায়ের কথা বলেছেন।[১১] প্রথম পর্যায়ে, সমাজে এদের বেঁচে থাকার অধিকার পর্যন্ত ছিল না। দ্বিতীয় পর্যায়ে, সঙ্গীত-সাহিত্য-দর্শন এমনকি গণিত-বিজ্ঞানের নানা শাখায় কিছু প্রজ্ঞাবান দৃষ্টিহীনদের অবদান এবং খ্রিস্টান মিশনারিদের চেষ্টায় সমাজে এদের বেঁচে থাকার অধিকার স্বীকৃত হয়। এই সময় থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে ক্ষীণ আলো দেখা যায়। তৃতীয় পর্যায়ে, কিছু দার্শনিক শিক্ষাবিদ এবং আধুনিক খ্রিস্টান মিশনারিদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টার ফলে দৃষ্টিহীনরা দৃষ্টিমানদের সঙ্গে শিক্ষা ও কর্মজগতে এক আসনে বসার সুযোগ লাভ করেছে।

১৭৮৪ সালে Institution des Jeunes Aveugles (Institution for Blind Youth) নামক প্রথম আবাসিক বিদ্যালয়টি ভ্যালেন্টিন হুয়ে ফ্রান্সের প্যারিসে প্রতিষ্ঠা করেন।[১২] এই বিদ্যালয়টি পরবর্তীকালে The National Institution for Young Blind People নামে পরিচিত হয়। দৃষ্টিহীনদের জন্য দ্বিতীয় বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয় ব্রিটেনের লিভারপুলে ১৭৯১ সালে। এডভার্ট রুশটন প্রতিষ্ঠিত এই স্কুলটির নাম School for Indigent Blind। ১৭৯৩ সালে Edin burgh Blind Asylum নামক তৃতীয় বিদ্যালয়টিও ইংল্যাণ্ডে স্থাপিত হয়। ব্রিস্টলে প্রতিষ্ঠিত Asylum and Industrial School for the Blind বিদ্যালয়টিও ১৭৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত। এরপর ১৭৯৯ সালে School for the Indigent Blind প্রতিষ্ঠিত হয় সেণ্ট জর্জেস শহরে। এই সমস্ত বিদ্যালয়ের দ্বারা উৎসাহিত

হয়ে কিছু ব্যক্তির ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় এবং চার্চের উদ্যোগে ১৮১০ সালের মধ্যে ভিয়েনা, প্রাগ, মিলান, বার্লিন, ডাবলিন, অ্যামস্টারডাম, স্টকহোম প্রভৃতি ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে দৃষ্টিহীনদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

A. John D. Fishe ১৮২৬ সালে ফ্রান্স থেকে চিকিৎসা বিজ্ঞানে পড়াশোনা শেষ করে দেশে ফিরলে তার দ্বারা হুয়ে প্রতিষ্ঠিত দৃষ্টিহীনদের জন্য বিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ডের সাফল্যের কথা বোস্টনের অধিবাসীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। শহরের ধনী ব্যক্তির ও রাজনীতিবিদদের মধ্যে দৃষ্টিহীনদের জন্য কিছু করবার উদ্যোগ লক্ষ করা যায়। এর ফলে আমেরিকার ম্যাসাচুয়েট শহরে দৃষ্টিহীনদের জন্য প্রথম বিদ্যালয় New England Asylum for the Blind প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮২৯ সালে যা পরবর্তীকালে Perkins Institution and Massachusetts Asylum for the Blind নামে পরিবর্তিত হয়।[১৩] এইভাবে ১৮৭০ সালের মধ্যে আমেরিকায় দৃষ্টিহীনদের জন্য ২৩ টি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এগুলির মধ্যে অনেক বিদ্যালয়ই সরকারি আনুকূল্য লাভ করেছিল।

এই সময় দৃষ্টিহীনদের জন্য প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন বিদ্যালয়ে প্রাথমিক মানের শিক্ষাদান করা হত। এই সমস্ত বিদ্যালয়ে হাতের কাজ এবং সঙ্গীত শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। দৃষ্টিহীনদের শিক্ষাদানের মূল লক্ষ্য ছিল তাদের সামাজিক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা। বিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যমে তারা যেন সমাজ ও পরিবারের পক্ষে উপযোগী হয়ে ওঠে এবং সমাজে ও পরিবারে অবদান রাখতে সক্ষম হয় – এই বিষয়টিকে মাথায় রেখে শিক্ষাদানের কর্মপদ্ধতি তৈরি করা হত।

ফ্রান্সে ভ্যালেন্টিন হুয়ের দ্বারা দৃষ্টিহীনদের জন্য প্রথম আবাসিক বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হলে ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশে এর অনুকরণে দৃষ্টিহীনদের জন্য আবাসিক বিশেষ বিদ্যালয় তৈরি হতে থাকে। পরবর্তীকালে স্যামুয়েল হুয়ে এবং অন্যান্য কিছু

শিক্ষাবিদ দৃষ্টিহীন ও দৃষ্টিমানদের একত্রে শিক্ষাদানের কথা বলেন। ফলে পরবর্তীকালে সমন্বিত শিক্ষার পাশাপাশি বিশেষ বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের পদ্ধতি গড়ে ওঠে।

২.৮ ভারতে দৃষ্টিহীনদের শিক্ষার ইতিহাস

ভারতে প্রাচীন ও মধ্যযুগে দৃষ্টিহীনদের শিক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। ব্রিটিশ আমলে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অংশ থেকে খ্রিস্টান মিশনারিদের চেষ্টায় দৃষ্টিহীন ও অন্যান্য দুর্দশাগ্রস্ত মানুষদের জন্য শিক্ষা ও পুনর্বাসনের কাজ আরম্ভ হয়। এতদিন পর্যন্ত পাঞ্জাবের অমৃতসরে North Indian Industrial Home for the Blind প্রতিষ্ঠানটিকে ভারতে দৃষ্টিহীনদের প্রথম বিদ্যালয় মনে করা হত। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে নতুন গবেষণার ফলে জানা গেছে অমৃতসরের এই প্রতিষ্ঠানটি ভারতে দৃষ্টিহীনদের জন্য প্রথম বিদ্যালয় ছিল না। বিশিষ্ট অধ্যাপক বিষ্ণুপদ নন্দ এই প্রতিষ্ঠানটিকে ভারতের দৃষ্টিহীনদের জন্য প্রতিষ্ঠিত ষষ্ঠ বিদ্যালয়ের মর্যাদা দিয়েছেন। ১৮৮৬ সালের আগে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে দৃষ্টিহীনদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। নিচের তথ্যসমূহ একথা প্রমাণ করে।

বর্তমানে প্রাপ্ত ঐতিহাসিক তথ্যাদি থেকে জানা যায় যে ১৮২৬ সালে প্রতিষ্ঠিত রাজা কালীশঙ্কর ঘোষালের অ্যাসাইলাম ছিল ভারতের দৃষ্টিহীনদের জন্য প্রথম প্রতিষ্ঠান। দৃষ্টিহীনদের জন্য দ্বিতীয় বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয় কলকাতায় যার নাম Bengal Military Orphan Asylum (১৮৪১)। ১৮৪৫ সালে বোম্বাইয়ের Towers of Silence এর পাদদেশে অবস্থিত অ্যাসাইলামটি হলো ভারতের তৃতীয় বিদ্যালয়। উত্তরপ্রদেশের বেরিলিতে প্রতিষ্ঠিত হয় চতুর্থ বিদ্যালয়টি হাকিম এনায়েতের প্রচেষ্টায়। ১৮৬৬ সালে আগ্রার সেকেন্দ্রাতে প্রতিষ্ঠিত হয় পঞ্চম বিদ্যালয়টি। এইসব তথ্য প্রমাণ করে অমৃতসরে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের আগে অন্তত পাঁচটি প্রতিষ্ঠান দৃষ্টিহীনদের শিক্ষাদানের জন্য গড়ে উঠেছিল।[১৪]

পরবর্তীকালে এর মধ্যে কোনো-কোনো বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যায়। যেসব প্রতিষ্ঠান চালু ছিল সেই সম্বন্ধে লেখক-গবেষকরা অবগত ছিলেন না।

১৮৯০ সালে Miss Askwith এর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সপ্তম বিদ্যালয়টি হলো Sarah Tucker Institution. এটি দৃষ্টিহীনদের বিদ্যালয় যেটি পালাম-কোট্টায়মে অবস্থিত। ১৮৯১ সালে প্রতিষ্ঠিত উটকামন্ডের বিদ্যালয়টি দৃষ্টিহীনদের জন্য অষ্টম বিদ্যালয়। নবম বিদ্যালয় রাঁচিতে অবস্থিত। Calcutta Blind School নামে দশম বিদ্যালয়টি কলকাতার বেহালা অঞ্চলে অবস্থিত যেটি ১৮৯৭ সালে লালবিহারী শাহ স্থাপন করেন। এর পর ১৮৯৬ সাল থেকে ১৯০২ সালের মধ্যে যথাক্রমে উজ্জয়িনী, ইন্দোর, পুনা এবং মুম্বাইয়েতে দৃষ্টিহীনদের জন্য বিভিন্ন বিদ্যালয়গুলি তৈরি হয়। এইভাবে ১৯৪৭ সালের মধ্যে ভারতে মোট ৩২ টি স্কুল গড়ে ওঠে।[১৫] এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে তিনটি স্কুল ও একটি সংস্থা গড়ে ওঠে। ১৯৪০ সালে তৈরি হওয়া পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় স্কুলটি দার্জিলিং জেলার কালিম্পং শহরে স্থাপন করেন মেরি স্কট নামে এক ইংরেজ মহিলা। এর পর ১৯৪১ সালে তৃতীয় স্কুলটি কলকাতায় গড়ে তোলেন ড. সুবোধচন্দ্র রায় নামে এক দৃষ্টিহীন স্কলার এবং তাঁর আমেরিকান স্ত্রী Mrs. Evelyn Ray। এই স্কুলটির নাম ছিল All Indian Lighthouse for the Blind। ১৯৪৭ সালে এই স্কুলের নামকরণ হয় Lighthouse for the Blind। ড. রায় এবং অধ্যাপক নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের প্রচেষ্টায় ১৯৪৬ সালে Blind Person's Association তৈরি হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি আজ পর্যন্ত দৃষ্টিহীনদের শিক্ষা ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে।

১৯৫৭ সালে স্বামী লোকেশ্বরানন্দ মহারাজ একক প্রচেষ্টায় নরেন্দ্রপুরে Blind Boy's Academy এর প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ মিশন এই বিদ্যালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করে। এরপর ১৯৬৫ সালে কোচবিহারে, হলদিয়ায় (বিবেকানন্দ মিশন),

নৈহাটিতে; ১৯৭৮ সালে হুগলী জেলার উত্তরপাড়াতে (Lui Brail Memorial for the Sightless); এবং ১৯৮১ সালে নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে বিভিন্ন স্কুল গড়ে উঠতে থাকে। এইভাবে ১৯৯৭ সালের মধ্যে ভারতে দৃষ্টিহীনদের জন্য মোট ২৪৩ টি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

২.৯ পাশ্চাত্য প্রেক্ষিতে দৃষ্টিহীনদের পুনর্বাসনের ইতিহাস

সমাজে যারা নির্বাসিত, শিক্ষার মাধ্যমে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হলো শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। শিক্ষা সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, "মানুষের মধ্যে প্রথম থেকে যে পূর্ণতা বিদ্যমান তারই বিকাশ হলো শিক্ষা।"[১৬] তিনি মানুষ গড়ার শিক্ষার কথা বলেন। আধুনিক শিক্ষায় বলা হয়েছে শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশসাধন। তাই শিক্ষার পরেই আসে পুনর্বাসনের কথা। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগে দৃষ্টিহীনদের শিক্ষার সহজবোধ্য পদ্ধতি জানা ছিল না। নানান অসুবিধার মধ্যে দিয়েও যারা শিক্ষিত হয়েছিলেন তাদের পক্ষে পুনর্বাসন সহজ ছিল না। ইতিহাসের দিকে অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিলে দেখা যায়, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাকবি হোমারকেও (৯২৮ খ্রীঃ পূঃ) অর্থ উপার্জনের জন্য বীণা হাতে গান গেয়ে মানুষের দরজায় দরজায় ঘুরতে হয়েছিল। একথা নিঃসন্দেহে মানব সভ্যতার ইতিহাসে লজ্জার পরিচয় বহন করে। ৪০০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ডিডিমাস আলেকজেন্দ্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে দর্শন বিভাগে অধ্যাপনার কাজ করেছিলেন। তাঁদের এই প্রতিভা এবং খ্রিস্টান মিশনারিদের উদ্যোগ অষ্টদশ শতকে ইউরোপে দৃষ্টিহীনদের শিক্ষা ও পুনর্বাসনের পথ সুগম করে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন শুধু প্রাচীন ও মধ্যযুগেই নয়, বর্তমান সময়েও দৃষ্টিহীনদের শিক্ষাদান অপেক্ষা পুনর্বাসনের কাজটি কঠিন। অষ্টাদশ শতকে নিকোলাস স্যান্ডার্সন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পাননি। অনেক চেষ্টার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠাগারটি ব্যবহারের সুযোগ

পেয়েছিলেন। গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে অসামান্য ব্যুৎপত্তি থাকা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ করতে রাজি ছিল না। শেষ পর্যন্ত আইজ্যাক নিউটনের চেষ্টায় কর্তৃপক্ষ তাকে অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ করেন। এই দৃষ্টিহীন ব্যক্তিটি আইজ্যাক নিউটনের (১৬৪৩-১৭২৭ খ্রীঃ) তত্ত্বের উপর পাঠ দান করতেন।[১৭]

১৭৮৪ সালে ফ্রান্সে ভ্যালেণ্টিন হুয়ে দৃষ্টিহীনদের প্রথম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার পর অচিরেই ইউরোপের নানা প্রান্তে দৃষ্টিহীনদের জন্য নতুন-নতুন আবাসিক বিদ্যালয় গড়ে ওঠে। এইসব বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষাদানের পাশাপাশি কুটির শিল্প ও সঙ্গীত শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হত। এইসব বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের পর অনেকেই উক্ত বিদ্যালয়ে বা অন্য কোনো বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার সুযোগলাভ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এই সময় থেকেই দৃষ্টিহীনদের পুনর্বাসনের কাজে সামাজিক উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়। অল্পকালের মধ্যে অনেকেই অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এদের মধ্যে আমেরিকান মহিলা মিস মিথের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই দৃষ্টিহীন মহিলা 'ব্যাফেলো এক্সপ্রেস'-এর একজন সফল সাংবাদিক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি তার কুকুরের সাহায্যে সারা আমেরিকা ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করতেন। ওয়াল্টার আর ম্যাকডোনাল্ড পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব কৃতিত্বের সঙ্গে পালন করেছিলেন। ব্যাঙ্ক, সংবাদপত্র ও অন্যান্য সরকারি দপ্তরে দৃষ্টিহীনরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে তাদের যোগ্যতা ও কর্মকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন।

২.১০ ভারতীয় প্রেক্ষিতে দৃষ্টিহীনদের পুনর্বাসনের ইতিহাস

ভারতে ১৮২৬ সালে কালীশঙ্কর ঘোষাল বেনারসে দৃষ্টিহীনদের জন্য প্রথম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এর দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হয়ে ১৮৮৬ সালের মধ্যে বেরিলি, পুনে, মুম্বাই, অমৃতসর এবং ১৯০০ সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে দৃষ্টিহীনদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এইসব স্কুলে

দৃষ্টিহীনরা শিক্ষকতার সুযোগ লাভ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য হোমারের মতো উত্তর ভারতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত বিশারদ সুরদাসকেও (আনুমানিক ষোড়শ-সপ্তদশ শতক) জীবনধারণের জন্য ভারতের নানা প্রান্তে ঘুরতে হয়েছিল। যদিও এদের দুজনের মধ্যে সময়ের ব্যবধান প্রায় দুহাজার বছর। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে দেশকালের পরিবর্তনেও দুই মহাস্রষ্টার জীবনে প্রায় একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল। ঊনবিংশ শতকের পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বর পালুস্করকেও (১৮৭২-১৯৩১ খ্রীঃ) সঙ্গীত শিক্ষা প্রচার ও প্রসারের জন্য নিজের শেষ সম্বলটুকুও হারাতে হয়েছিল।[১৮]

আধুনিক কালে অধ্যাপক নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকেও (১৮৯৮-১৯৫৭ খ্রীঃ) অগাধ পাণ্ডিত্য ও বাগ্মীতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও চাকরির জন্য কলেজ ও বিদ্যালয়ে কর্তৃপক্ষের দরজায় দরজায় হন্যে হয়ে ঘুরতে হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত বঙ্গবাসী কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বসু তাকে পরীক্ষামূলকভাবে ছয় মাসের জন্য ওই কলেজে অধ্যাপকের পদে নিয়োগ করেন। জ্ঞান ও প্রতিভাবলে শ্রীসেনগুপ্ত অচিরেই সকলকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করে স্থায়ী অধ্যাপকের পদ লাভ করেন। ১৯৩০-৪০ সাল নাগাদ মধুসূদন মজুমদার (১৯২১-১৯৮১ খ্রীঃ) 'দৃষ্টিহীন' ছদ্মনামে *নবকল্লোল* ও *শুকতারা* পত্রিকায় জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ লেখেন।[১৯] এ প্রসঙ্গে উনিশ শতকের সংস্কার আন্দোলনের পণ্ডিত গতুলালজির (১৮৮৪ খ্রীঃ) নাম বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। তিনি বৈদিক ধর্মের প্রচারকরূপে সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখে খ্যাতি অর্জন করেন। এই সময়ের উচ্চ শিক্ষিত দৃষ্টিহীনদের মধ্যে সুবোধচন্দ্র রায় একটি উল্লেখযোগ্য নাম। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন এবং Light House for the Blind নামক প্রতিষ্ঠানটি দৃষ্টিহীনদের জন্য প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে তিনি বিদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। এদেশে থাকাকালীন তার এবং অধ্যাপক নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের চেষ্টায় দৃষ্টিহীনদের জন্য Blind Person's

Association নামে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানটি গড়ে ওঠে। এই প্রতিষ্ঠান আজও দৃষ্টিহীনদের শিক্ষা ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে চলেছে।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকে শুরু করে বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত ভারতে ও পশ্চিমবঙ্গে দৃষ্টিহীনদের শিক্ষা ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে যে উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে তার পরিণতিতে আমরা নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মধুসূদন মজুমদার, সুবোধচন্দ্র রায় এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশে পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বর, পণ্ডিত গতুলালজির মতো প্রতিভাবান ও কর্মদক্ষ মানুষের উপস্থিতি লক্ষ করেছি। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় একবিংশ শতকেও দৃষ্টিহীনদের শিক্ষা ও পুনর্বাসন সম্পর্কে বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে সচেতনতা গড়ে ওঠেনি। গণমাধ্যমগুলি এই ব্যাপারে সেইভাবে সদর্থক ও সচেতক ভূমিকা পালন করছে না। সাম্প্রতিককালের দু-একটি ঘটনা এই বক্তব্যকে প্রমাণ করে।

বিশ শতকের নয়ের দশকে পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশনের দ্বারা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা চালু হলে অনেক দৃষ্টিহীন ব্যক্তি কৃতিত্বের সঙ্গে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরও তাদের নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সমস্যার সৃষ্টি করেছে। শেষ পর্যন্ত কিছু দৃষ্টিহীন ব্যক্তি এবং Blind Person's Association এর উদ্যোগে হাইকোর্টে মামলা করা হয়। এই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট স্কুল সার্ভিস কমিশনে পাস করা দৃষ্টিহীন শিক্ষকদের নিয়োগের বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়োগের ক্ষেত্রে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। এ ক্ষেত্রেও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিয়োগের পরীক্ষায় পাস করা দৃষ্টিহীন প্রার্থীদের হাইকোর্টের দ্বারস্থ হতে হয়। হাইকোর্টের রায়ের ওপর ভিত্তি করে সাম্প্রতিককালে অনেকেই মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়সহ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ানোর সুযোগ লাভ করেছেন।

আইনের দ্বারা বহুক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের বিষয়টি নিশ্চিত করা গেলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অসহিষ্ণু মনোভাব কোনো কোনো ক্ষেত্রে দৃষ্টিহীনদের যথাযথ দায়িত্ব পালনে সমস্যার সৃষ্টি করেছে। তাই আইনের পাশাপাশি নিশ্চিতভাবে জনসচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়োজন। এই সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সংবাদ মাধ্যম আজকের দিনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এ প্রসঙ্গে Blind Person's Association-এর সভাপতি নারায়ণ গাঙ্গুলির মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন "সামাজিক ক্ষেত্রে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য দৃষ্টিহীনদের আরো বেশী সজাগ, সক্রিয় এবং সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে"।[২০] বিশিষ্ট চিত্র পরিচালক কৌশিক গাঙ্গুলি অবশ্য আশাবাদী। তিনি বলেন, "যদিও গণমাধ্যম তাদের নিজেদের প্রয়োজনে দৃষ্টিহীনদের প্রসঙ্গ ব্যবহার করছে। তারা যথাযথ দায়বদ্ধতা পালন করছে না। তবু সমাজে ও শিল্পে দৃষ্টিহীনরা ক্রমশ নায়ক হয়ে উঠছে। পরবর্তী প্রজন্মে দৃষ্টিহীনদের প্রতি আচরণে পরিবর্তন আসবে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়।"[২১]

২.১১ দৃষ্টিহীনদের সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার ইতিহাস

বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে মহাকবি হোমার ও মিলটনের (১৬০৮-১৬৭৪ খ্রীঃ) নাম সোনার অক্ষরে লেখা আছে। মহাকবি হোমারের 'ইলিয়াড'ও 'ওডিসি' মহাকাব্য দুটি পৃথিবীর চারটি প্রধান মহাকাব্যের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। মিলটনের *প্যারাডাইস লস্ট* (১৬৬৮ খ্রীঃ) বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যসম্পদ। এঁরা দুজনেই ছিলেন দৃষ্টিহীন। মূকবধির ও দৃষ্টিহীন হেলেন কেলার আধুনিক বিশ্বের আর এক বিস্ময়। বহুবিধ প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে তিনি প্রমাণ করে দিয়েছেন মানুষের ইচ্ছাশক্তি থাকলে কোনো বাধাই জীবনের গতি রোধ করতে পারে না। ভারতের সাহিত্য সংস্কৃতির ইতিহাসে সুরদাস, গতুলালজি, পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বর অবিস্মরণীয় নাম। আমরা ভারত তথা বাংলার সাহিত্য-

সংস্কৃতিতে দৃষ্টিহীনদের অবদানের কথা পর্যালোচনা করে তাদের সামাজিক বিবর্তন ও অগ্রগতির বিষয়টি বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব।

কৃষ্ণচন্দ্র দে (১৮৯৩-১৯৬২ খ্রীঃ)

বাংলার সঙ্গীত ও সংস্কৃতি জগতের এক কিংবদন্তী হলেন কৃষ্ণচন্দ্র দে। ১৮৯৩ সালে কলকাতায় তাঁর জন্ম হয়। মাত্র চৌদ্দ বছর বয়েসে তিনি সম্পূর্ণ দৃষ্টিশক্তি হারান। এরপর শুরু হয় তাঁর সঙ্গীত শিক্ষা যা তাঁকে বাংলা তথা ভারতের সংস্কৃতি জগতে প্রতিষ্ঠা এনে দেয়। এই মানুষটির গুরু পরম্পরায় ছিলেন শশিমোহন দে, দর্শন সিং, দবির খাঁয়ের মতো সঙ্গীত ব্যক্তিত্ব। এই প্রতিভাবান মানুষটি সিনেমা, থিয়েটার, গ্রামোফোন রেকর্ড প্রভৃতি জনপ্রিয় মাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বাংলা ছাড়াও অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষায় তিনি গান গেয়ে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। শুধু সুকণ্ঠ গায়ক হিসেবে নয়, অভিনয় জগতেও তিনি প্রতিভার সাক্ষর রেখেছিলেন। 'রংমহল' ও 'মিনার্ভা' থিয়েটারের তিনি ছিলেন সঙ্গীত পরিচালক। নাট্যব্যক্তিত্ব শিশির ভাদুড়ীর (১৮৮৯-১৯৫৯ খ্রীঃ) সঙ্গে এক মঞ্চে অভিনয় করেছেন। কয়েকটি চলচ্চিত্রেও তার অভিনয় দক্ষতা লক্ষ করা যায়। তিনি তাঁর জীবন দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে মানুষের চেষ্টা থাকলে কোনো শারীরিক সমস্যাই বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে না।

স্বপন গুপ্ত (১৯৪৯ খ্রীঃ)

কৃষ্ণচন্দ্র দের পরে দৃষ্টিহীন সঙ্গীত শিল্পীদের মধ্যে যার নাম উঠে আসে তিনি হলেন স্বপন গুপ্ত। বিহারের কাটিহার জেলায় ১৯৪৯ সালে ২০শে মার্চ তার জন্ম হয়। তার বাবার নাম সুষেণ এবং মায়ের নাম কনক গুপ্ত। তিনি প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী দেবব্রত বিশ্বাসের (১৯১১-১৯৮০ খ্রীঃ) ছাত্র। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সমকালে তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী হিসেবে সুখ্যাতি

অর্জন করেছেন। তবে তিনি সাবেকি ঘরানার সমর্থক। নতুন ঢঙে রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশনের বিরোধী। তিনি মনে করেন পিকাসোর ছবির ওপর যেমন কেউ কলম চালাতে পারে না তেমনই রবীন্দ্রসঙ্গীতগুলি রাবীন্দ্রিক ঢঙে পরিবেশন করলেই তার সৌন্দর্য অক্ষুন্ন থাকে।

মধুসূদন মজুমদার (১৯২১ খ্রীঃ)

মধুসূদন মজুমদারের জন্ম হয় ১৯২১ সালের ২৪ জুন কলকাতায়। তাঁর বাবা প্রবোধচন্দ্র মজুমদার ছিলেন দেব সাহিত্য কুটীরের প্রতিষ্ঠাতা। মাত্র পাঁচ বছর বয়েসে বসন্ত রোগে তাঁর দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। বিদ্যালয়ের পড়াশোনা শেষ করে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এম. এ ক্লাসে ভর্তি হয়েও পারিবারিক সমস্যার কারণে শেষ করতে পারেননি। বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতে *নবকল্লোল* পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক এবং *শুকতারা* পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে সুপরিচিত। দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর তিনি ছোটোদের 'শুকতারা' পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন। নিজেও ছিলেন একজন সুলেখক। তাঁর *অমর বীরকাহিনি,* এবং *সোনার বাংলা* গ্রন্থগুলির মধ্যে সাহিত্যরস যেমন রয়েছে তেমনই গভীর ঐতিহাসিক দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। অনেক অসহায় মানুষকে তিনি সাধ্যমতো সাহায্য করতেন। তিনি মনে করতেন, শুধু মাত্র শারীরিক ত্রুটির জন্য কাউকে প্রতিবন্ধী বলা উচিত নয়। সুযোগ পেলে তথাকথিত প্রতিবন্ধীরাও সমাজে জ্ঞান ও প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে পারে।

সত্যজিৎ মণ্ডল (১৯৫৮ খ্রীঃ) ও স্পর্শনন্দন পত্রিকা (১৯৯২ খ্রীঃ)

সত্যজিত মণ্ডল পেশায় একজন অবসরপ্রাপ্ত রেলকর্মচারী। কিন্তু তার সবচেয়ে বড়ো পরিচয় হলো তিনি *স্পর্শনন্দন* পত্রিকার সম্পাদক যিনি দীর্ঘ আঠাশ বছর ধরে দৃষ্টিহীনদের কবিতা রচনায় উৎসাহ এবং কবিতা প্রকাশের জন্য লড়াই করে চলেছেন। একান্ত সাক্ষাৎকারে এই

পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, বাংলা কবিতার ইতিহাসে একটা বড়ো শূন্যতা রয়ে গেছে সেটা হল, দৃষ্টিহীন কবিদের অন্তর্ভুক্তিকরণ।[২২] এই সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে ১৯৯২ সালে স্পর্শনন্দন পত্রিকার জন্ম হয়। এর পাশাপাশি *নবকল্লোল, সুইনহো স্ট্রীট, প্রথম আলো, কৃত্তিবাস* এর মতো কিছু জনপ্রিয় পত্রিকায় তিনি দৃষ্টিহীন কবিদের কবিতা প্রকাশ করার উদ্যোগ নেন। কবিতার উৎকর্ষ সম্বন্ধে তিনি মনে করেন যে, চেষ্টা করলে দৃষ্টিহীন কবিরা উৎকৃষ্ট কবিতা রচনা করতে পারে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। এই বিশ্বাসের জায়গা থেকে তিনি 'আলোর ঝর্ণা' নামে এক কবিতা সংকলন প্রকাশ করেন যেখানে শতাধিক দৃষ্টিপ্রতিস্পর্ধী কবির কবিতা সংকলিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই জাতীয় উদ্যোগ প্রথম। *স্পর্শনন্দন* পত্রিকার জন্মের ইতিহাস সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি বলেন যে, তিনি যখন এ উদ্যোগ নিয়েছিলেন তখন অধিকাংশ মানুষের কাছে থেকে নেতিবাচক মন্তব্য এসেছিল। কিন্তু তাতে তার উৎসাহ কমেনি। তবে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৯৩৪-২০১২ খ্রীঃ) মতো হাতে গোনা কেউ—কেউ তার এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান। পরবর্তীকালে তিনি দৃষ্টিহীন কবিদের নিয়ে কবিতা উৎসব শুরু করেন। এই অনুষ্ঠানে বহু বিশিষ্ট কবি আমন্ত্রিত হন। বর্তমানে এই পত্রিকার উপদেষ্টামণ্ডলিতে কবি কমল দে শিকদার, নমিতা চৌধুরি, নির্মল ব্রহ্মচারীর মতো বহু বিশিষ্ট কবি যুক্ত হয়েছেন। তাই *স্পর্শনন্দন* এর উদ্দেশ্য কিছু পরিমাণে সফল হয়েছে বলেই তিনি মনে করেন। তার প্রমাণ পশ্চিমবঙ্গের নানান কবিতা উৎসবে দৃষ্টিহীন কবিরা আমন্ত্রিত হন। কবি ও সম্পাদক সত্যজিৎ মণ্ডল মহাশয়ের সব চেয়ে বড়ো কৃতিত্ব হলো তিনি প্রথম পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত দৃষ্টিহীন কবিদের একত্রিত করে একটি কবিতা চর্চার মঞ্চ রচনা করেন। ভবিষ্যতে তিনি *স্পর্শনন্দন* এর একটি অনলাইন শ্রুতি সংস্করণ প্রকাশ করার ইচ্ছে রাখেন।

স্ফূরণ পত্রিকা

পশ্চিমবঙ্গ নারী ও সমাজকল্যাণ বিভাগ রাজ্য প্রতিবন্ধী কমিশনারের পক্ষ থেকে উক্ত পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকা থেকে প্রতিবন্ধী ও প্রতিবন্ধকতা সংক্রান্ত নানান তথ্য জানা যায়। উক্ত পত্রিকায় প্রতিবন্ধী আইন বিষয়ে তথ্য যেমন থাকে তেমনই সরকারি তরফে প্রতিস্পর্ধী মানুষদের জন্য কী ধরনের সুযোগসুবিধা দেওয়া হয়েছে সে সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া যায়। রাজ্যের কোথায় কোথায় প্রতিবন্ধীদের জন্য সংগঠন ও বিশেষ বিদ্যালয় রয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা যেমন থাকে তেমনই শিক্ষা ও পুনর্বাসন এবং নাম নথিভুক্তকরণ শংসাপত্র পাওয়ার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় তথ্য দেওয়া থাকে। শিক্ষা ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে এবং জনসচেতনতা সৃষ্টিতে পত্রিকাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে কিন্তু এর প্রচারের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা করা হয়নি। এই ধরনের পত্রিকা যাতে সমাজে আরো বেশী সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছায় বাস্তবে সে ধরনের উদ্যোগের অভাব লক্ষ করা যাচ্ছে। প্রতিবন্ধীসচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এ জাতীয় উদ্যোগকে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া প্রয়োজন। তাহলেই এর উদ্দেশ্য সফল হতে পারে।

প্রতিস্পর্ধী পত্রিকা

২০১৩ সালে আরোগ্য সন্ধানের মুখপত্র হিসেবে অধ্যাপক বিষ্ণুপদ নন্দের সম্পাদনায় *প্রতিস্পর্ধী* পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্পাদক এক সাক্ষাৎকারে জানান সমাজে প্রতিবন্ধী সচেতনতা তৈরি করাই ছিল প্রাথমিক উদ্দেশ্য। পরবর্তীকালে পাঠক সংখ্যা বাড়ানোর জন্য সাহিত্যকে আনা হয়।[২৩] ২০১৯ সালে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত দ্বিমাসিক হিসেবে প্রকাশিত হওয়ার পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। এর কারণ সম্বন্ধে বিষ্ণুবাবু বলেন যে প্রথম কারণ হল আর্থিক আনুকূল্যের অভাব এবং দ্বিতীয় কারণ হলো আগ্রহী লেখকের অভাব। তিনি আরো বলেন যে শুধু এ ক্ষেত্রেই নয়, সামগ্রিকভাবে বিশেষ

শিক্ষা ও সামাজিক সমস্যা বিষয়ে মানুষের নেতিবাচক মানসিকতার কারণে উক্ত বিষয়ে সাধারণ লোকজন আগ্রহ দেখাচ্ছে না। এই নেতিবাচক মানসিকতা দূরীকরণের ক্ষেত্রে উপযুক্ত সরকারি পদক্ষেপের অভাব রয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল ফর স্পেশাল নিড অ্যান্ড রিহ্যাবলিটেশন (২০১৪)

২০১৪ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজি বিভাগের অধ্যাপক মনোজিৎ মণ্ডলের সম্পাদনায় *ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল ফর স্পেশাল নিড অ্যান্ড রিহ্যাবলিটেশন* পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। ২০১৯ পর্যন্ত বার্ষিক সংখ্যা হিসেবে এই পত্রিকাটি সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রতিবন্ধকতা বিষয়ক পত্রিকা হিসেবে এটি ইউ.জি.সির অনুমোদন লাভ করে। উক্ত পত্রিকায় প্রতিবন্ধকতা বিষয়ে গবেষণামূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। এর প্রত্যেক সংখ্যায় তিনজন প্রতিস্পর্ধী গবেষকের লেখা ছাপা হয়েছে। তবে লেখক যিনি হন তার মূল বিষয় হতে হবে প্রতিবন্ধী এবং প্রতিবন্ধকতা বিষয়ে নানান গবেষণামূলক আলোচনা।

শ্রুতিকল্প (২০১৬)

২০১৬ সালের ১লা বৈশাখ ব্লাইণ্ড পারসন্স অ্যাসোসিয়শনের উদ্যোগে *শ্রুতিকল্প* পত্রিকাটি অনলাইন মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এটি একটি ত্রৈমাসিক শ্রুতিপত্রিকা। এক সাক্ষাৎকারে *শ্রুতিকল্প* পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক সৈকত কর মহাশয় এই পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেন যে, এর একটি উদ্দেশ্য হলো দৃষ্টিহীনদের মধ্যে সাহিত্য চর্চার প্রসার ঘটানো। ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হলে সে ক্ষেত্রে পড়ার জন্য অন্যের সহায়তা প্রয়োজন। কিন্তু শ্রুতিমাধ্যমে এই সমস্যা থাকে না।[২৪] এর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য দৃষ্টিহীনদের নানান সমস্যা সম্পর্কে গণমাধ্যমে আলোচনা করা। এই পত্রিকাটির একটি বিশেষত্ব হলো দৃষ্টিহীনদের দ্বারা পরিচালিত কিন্তু যেকোনো মানুষ এখানে সাহিত্য ও সমাজসমস্যা নিয়ে লেখালেখি করে থাকেন। এর কয়েক

বছর আগে বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ছাত্রদের উদ্যোগে *শব্দকল্পদ্রুম* নামে একটি শ্রুতি পত্রিকা প্রকাশিত হয় কিন্তু বেশি দিন চলেনি। *শ্রুতিকল্প* পত্রিকাটি বিগত কয়েক বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে।

সূর্যমুখী পত্রিকা

সোশ্যাল অ্যক্সন ফর পার্সন উইথ ডিজ্যাবিলিটির মুখপত্র হিসেবে প্রীতম দেবনাথের সম্পাদনায় পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। এটি একটি সাহিত্য পত্রিকা। শিল্প ও সাহিত্যের মাধ্যমে সমাজে প্রতিবন্ধী সচেতনতা গড়ে তোলাই এর উদ্দেশ্য। ২০২০ সালের জুলাই এবং সেপ্টেম্বর মাসে এর দুটি অনলাইন সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এর সহসম্পাদক তারক হালদার বলেন যে, ভবিষ্যতে মুদ্রণাকারে পত্রিকাটি প্রকাশ করার লক্ষমাত্রা নিয়ে তারা এগিয়ে চলেছেন।[২৫] এই পত্রিকায় মূলত প্রতিস্পর্ধী কবি ও লেখকদের গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি প্রকাশিত হয়।

২.১২ ভারতীয় প্রেক্ষিতে দৃষ্টিহীনদের নাট্যদলের ইতিহাস

ব্লাইণ্ড অপেরা (১৯৯৬): ১৯৯৬ সালের আগে ভারতীয় রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে দৃষ্টিহীনদের কোনো থিয়েটার গ্রুপ ছিল না। কোনো কোনো দৃষ্টিহীন শিল্পী বিভিন্ন নাট্যদলে অভিনয় করেছে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কৃষ্ণচন্দ্র দে তার সমকালে নাটক ও সিনেমায় অভিনয় করেছিলেন। এছাড়া, বিশেষ বিদ্যালয়গুলিতে দৃষ্টিহীন শিক্ষার্থীরা নাটক অভিনয় করত। কিন্তু নান্দীকারের শুভাশিস গঙ্গোপাধ্যায় প্রথম দৃষ্টিহীন নাট্যকর্মীদের নিয়ে থিয়েটার গ্রুপ তৈরি করার পরিকল্পনা করেন। নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি ক্যালকাটা ব্লাইণ্ড স্কুলের শতবার্ষিকী উজ্জাপন উপলক্ষে তিনি দৃষ্টিহীন শিক্ষার্থীদের নিয়ে নাটকের একটি কর্মশালা করেন এবং তার চিন্তাভাবনাকে প্রায়োগিক রূপ দেওয়ার জন্য বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের

নিয়ে 'আমি যত দূরেই যাই' নামক একটি নাটক সাফল্যের সঙ্গে প্রযোজনা করেন। এই সাফল্যের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে ১৯৯৬ সালে তিনি শ্যামবাজার ব্লাইন্ড অপেরা নামে একটি নাট্যদল প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতীয় নাটকের ইতিহাসে দৃষ্টিহীন নাট্যকর্মীদের নিয়ে গড়ে ওঠা এটি হল প্রথম নাট্যদল। মোট ত্রিশ জন সদস্যকে নিয়ে এই থিয়েটার গ্রুপটি গড়ে ওঠে। ২০০৬ পর্যন্ত এই দলটি প্রযোজনা করেন নান্দীকারের নাট্য ব্যক্তিত্ব শুভাশিস গঙ্গোপাধ্যায়। এই কালপর্বের মধ্যে *রাজা, রক্তকরবী, মনসামঙ্গল* নাটকগুলি অভিনয় করে এই নাট্যদলটি দর্শক ও নাট্যপ্রেমীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নিজেদের থিয়েটারের কথা বলতে গিয়ে নাট্যব্যক্তিত্ব সুভাষ দে মহাশয় বলেন যে, প্রথমদিকে বিষয়টি একেবারেই সহজ ছিল না। দৃষ্টিহীন শিল্পীদের মঞ্চে চলাফেরা এবং অঙ্গভঙ্গি শেখার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। স্পর্শ ও শব্দকে কাজে লাগিয়ে অভিনয়থেরাপির কাজটি যথেষ্ট কঠিন। কিন্তু দৃষ্টিহীন শিল্পীরা তা করে দেখায়।[২৬] দ্বিতীয় একটি সমস্যা ছিল দর্শকের মনোযোগ আকর্ষণ করা। সমাজে দৃষ্টিহীনদের সম্পর্কে যে নেতিবাচক মানসিকতা প্রচলিত আছে তা প্রথম দিকে দর্শকদের অনাগ্রহের কারণ ছিল। প্রথমদিকে হাতে গোনা দর্শক নিয়েও অভিনয় করতে হয়েছে। তবে বর্তমানে অভিনয় জগতে দৃষ্টিহীনদের দক্ষতা প্রমাণিত হয়েছে।

শ্যামবাজার অন্যদেশ (২০০৬): ব্লাইণ্ড অপেরা গ্রুপে দৃষ্টিহীনরা অভিনয় করে। কিন্তু পরিচালনা বা প্রযোজনা করে না। এই প্রশ্নে ২০০৬ সালে ব্লাইন্ড অপেরা ভেঙে আরো একটি থিয়েটার গ্রুপ তৈরি হয় যেখানে দৃষ্টিহীন নাট্যকর্মীরা অভিনয় এবং প্রযোজনা দুটোয় করে। বর্তমানে এর প্রযোজক হলেন সুভাষ দে। অভিনয় শিক্ষা সম্পর্কে তিনি বলেন যে, বিভিন্ন মূর্তিকে স্পর্শ করে দৃষ্টিহীন শিল্পীরা হাসি-কান্না-বিরক্তির মতো অভিব্যক্তিগুলি প্রকাশ করার অভ্যাস করে। শারীরিক অঙ্গভঙ্গির ক্ষেত্রে এভাবে তাদের পাঠ দেওয়া হয়। মঞ্চে দড়ির সাহায্যে সীমানা নির্দিষ্ট করা হয় যা অভিনেতারা পায়ের দ্বারা স্পর্শ করে বোঝে।

শিল্পীরা মঞ্চে সাবলীল অভিনয় করার জন্য নিয়মিত শরীরীভাষা শিক্ষা, শরীরচর্চা, নাচ-গান এবং বাচিক অভিনয় অভ্যাস করে থাকে।

দৃষ্টিহীনদের নাট্যদল প্রতিষ্ঠা ভারতীয় নাট্য আন্দোলনের ইতিহাসে এক নতুন মাত্রা যোগ করে। এদের লড়াইয়ের ইতিহাস যেমন দীর্ঘ তেমনই সাফল্যের খতিয়ানও বড়ো কম নয়। ২০০১ সালে ব্লাইন্ড অপেরার *রক্তকরবী* নাটকের অভিনয় উক্ত বছরে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য অ্যাকাডেমির বিচারে সেরা প্রযোজনার সম্মান লাভ করে। ২০১২ সালে জাতীয় স্তরে দিল্লি রঙ মহোৎসবে অন্যদেশের প্রযোজনায় নাটকটি অভিনয়ের সুযোগ পায়। ২০১৬ সালে থিয়েটার অলিম্পিক ফেস্টিভলে নাটকটি অভিনীত হয় অন্যদেশের প্রযোজনায় এবং ভূয়সী প্রশংসা লাভ করে। অন্যদেশের প্রযোজিত 'কালীয়দমন' নাটকটি প্রথম কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক অনুমোদন লাভ করে। বর্তমানে অভিনয় জগতে তাদের সাফল্য প্রমাণিত হয়েছে তার ফল স্বরূপ আমরা দেখতে পাই কোনো কোনো চলচ্চিত্রে দৃষ্টিহীন অভিনেতাদের কেউ কেউ অভিনয়ের সুযোগ পেয়েছে। এই দুটি নাট্যদলের কাজ বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার সীমানা ছাড়িয়ে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। তবে কেন্দ্র সরকারের তরফে কিছু সাহায্য পাওয়া গেলেও রাজ্য সরকারের তরফে সহযোগিতার অভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তার মধ্যেও দৃষ্টিহীন নাট্য আন্দোলনের কর্মীরা তাদের লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।

২.১৩ দৃষ্টিহীনদের ক্রীড়া চর্চা

খেলাধুলা আমাদের সংস্কৃতির অঙ্গ। প্রাচীনকালেও ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় শরীরচর্চার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। মহাভারত ও পুরাণে দেখতে পাই শাস্ত্র ও শস্ত্রে বিদ্বান ব্যক্তি সমাজে সম্মানের আসন লাভ করতো। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় খেলাধুলাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেন যে ছাত্ররা *গীতা* পাঠ অপেক্ষা ফুটবল চর্চা করলে স্বর্গের

নিকটে পৌঁছে যাবে।[২৭] তাঁর এই মন্তব্য থেকে শরীরচর্চা এবং শরীর ও মনের গভীর যোগাযোগের বিষয়টি স্পষ্ট হয়।

দৃষ্টিহীনদের ক্রীড়া চর্চার বিষয়টি সাম্প্রতিক কালে আমাদের নজরে এলেও প্রাচীনকাল থেকেই প্রতিস্পর্ধী ব্যক্তিরা শরীরচর্চার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মহাভারত এর ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন শস্ত্র ও শাস্ত্রে পণ্ডিত ব্যক্তি। অন্ধক মুনি জ্ঞান চর্চার দ্বারা ঋষিত্ব অর্জন করেছিলেন। তৃতীয় লিঙ্গের অন্তর্গত শিখণ্ডী ভীষ্মের প্রতিস্পর্ধী যোদ্ধা হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। অষ্টাবক্র মুনিও শারীরিক প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে ঋষিত্ব অর্জন করেছিলেন। আমরা সাম্প্রতিক কালে দৃষ্টিহীনদের ক্রীড়াচর্চা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করব। সেই আলোচনার মধ্যে দিয়ে সংস্কৃতির অগ্রগতির ইতিহাস বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব।

দৃষ্টিহীনদের জন্য প্রতিষ্ঠিত বিশেষ বিদ্যালয়গুলিতে indoor এবং outdoor game দু'ধরনের খেলাধূলাতেই গুরুত্ব দেওয়া হয়। দাবা খেলা, সাঁতার, এথলেটিক্সের পাশাপাশি সাউণ্ড বলের মাধ্যমে ক্রিকেট এবং ফুটবলের মতো খেলাতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। কখনো স্কুলগুলির তরফ থেকে কখনো বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে রাজ্য স্তরে এবং জাতীয় স্তরে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। দীর্ঘ দিন পর্যন্ত দৃষ্টিহীনদের ক্রীড়া চর্চা বিশেষ বিদ্যালয়গুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু বর্তমানে গণমাধ্যমের একাংশের প্রচেষ্টায় এবং ক্রিকেট জগতে দৃষ্টিহীনদের সাফল্যের নিরিখে বিষয়টি জনসমক্ষে আসে।

অন্যান্য খেলাধুলার তুলনায় বর্তমানে গ্রহণযোগ্যতা ও সাফল্যের নিরিখে এগিয়ে রয়েছে দৃষ্টিহীনদের ক্রিকেট খেলা। ২০১২ সালের ডিসেম্বর মাসে এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে *ভিসুয়ালি ইম্পেয়ারমেণ্ট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন ফর ডি বেঙ্গল* সংক্ষেপে ভিক্যাব নামে একটি সংগঠন গড়ে উঠেছে। এই সংগঠনটি ক্রিকেট ছাড়াও রাজ্যস্তরে নানান ক্রীড়া

প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। পশ্চিমবঙ্গসহ ভারতের অন্যান্য রাজ্য থেকে দৃষ্টিহীন খেলোয়াররা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে খেলার সুযোগ পেয়েছে। ১৯৯৮ সালে ভারতে প্রথম দৃষ্টিহীন ক্রিকেট বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয়। ওই বছর স্পেনে দৃষ্টিহীনদের নিয়ে বিশেষ অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ভারত থেকে তিনজন দৃষ্টিহীন খেলোয়ার প্রতিনিধিত্ব করে। প্রকৃতপক্ষে এই সময় থেকে নানান সংবাদপত্র, অল ইণ্ডিয়া রেডিও, এ.বি.পি আনন্দের মতো জনপ্রিয় গণমাধ্যমগুলি সেই খবর সম্প্রচার করে। এছাড়া অনলাইন মাধ্যমে বিষয়গুলি অনেক মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। দ্বিতীয় ক্রিকেট বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয় ভারতে ২০০৬ সালে এবং ভারত সেই প্রথম বিশ্বকাপ জেতে। এর ফলে দৃষ্টিহীন ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা আরো বৃদ্ধি পায়। ২০১২ সালে ভারতে দৃষ্টিহীনদের টি. টোয়েন্টি বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয়। ক্রিকেট ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন দেশগুলির মধ্যে যে প্যারা অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয় সেখানে নানান ধরনের প্রতিস্পর্ধী খেলোয়ার যোগদান করে। ভারতের তরফ থেকে এই অলিম্পিকে বেশ কিছু খেলোয়ার যোগদান করে।

দৃষ্টিহীন ও অন্যান্য প্রতিস্পর্ধীদের ক্ষেত্রে খেলাধুলার জগতে সাফল্যের খতিয়ান ক্রমশ বেড়ে চলেছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গসহ ভারতের বেশ কিছু রাজ্যে সরকারি তরফে কোনোরকম সহযোগিতা পাওয়া যায় না। কোনো দৃষ্টিহীন খেলোয়ার যদি খেলাধুলার মধ্যেই তার লক্ষ্যকে সীমাবদ্ধ রাখে তবে তার ক্ষেত্রে স্বাচ্ছন্দ্য জীবনযাপন কঠিন হয়। কারণ আর্থিক অনটন। ভিক্যাবের মতো প্রতিষ্ঠানগুলি সরকারি ও বেসরকারি তরফে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পায় না। গণমাধ্যমগুলিও সবসময় এ ব্যাপারে সদর্থক ভূমিকা পালন করে না। তাই দৃষ্টিহীন ক্রিকেটসহ অন্যান্য খেলাধুলায় উন্নতির যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকলেও অনিশ্চয়তা রয়ে গেছে। এ প্রসঙ্গে ভিক্যাবের সম্পাদক চন্দন মাইতি বলেন যে আর্থিক সমস্যার কারণে ভালো ভালো দৃষ্টিহীন খেলোয়াররা অন্যান্য পেশায় যেতে বাধ্য হচ্ছে।[২৮] তাছাড়া একাধিক

ক্রীড়া নিয়ামক সংগঠনের পরিবর্তে সমস্ত সংগঠনকে যদি এক ছাতার তলায় আনা যায় তাহলে সংঘবদ্ধভাবে উন্নয়ন আরো সহজ হবে।

দৃষ্টিহীনদের সাহিত্য-সংস্কৃতির ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা গেল সাহিত্য-সংস্কৃতির নানা শাখায় এরা অনেক দূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু শিক্ষা ও পুনর্বাসনের মতো সরকারি ও বেসরকারি তরফে অনাগ্রহ এবং সমাজের নেতিবাচক মানসিকতা এদের উন্নতির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে চলেছে। এদের প্রতি মানুষের দয়া বা সহানুভূতির মানসিকতার পরিবর্তে সমানুভূতি ও দায়িত্ববোধের মানসিকতা সৃষ্টি করতে পারলে সার্বিক উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধকতাগুলি দূর হতে পারে।

দৃষ্টিহীনদের শিক্ষা ও পুনর্বাসনের ইতিহাস আলোচনার প্রেক্ষিতে একথা বলা যায় যে, বিগত দুশো বছরে এদের শিক্ষা ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে সামাজিকভাবে বেশ কিছু সদর্থক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে তারা আজ এদেশে এবং অন্যান্য দেশে শিক্ষা ক্ষেত্রে ও বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে গুরুত্বপূর্ণ পদে কর্মদক্ষতার পরিচয় দিয়ে আসছে। ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেকেই শিক্ষকতার পদে অধিষ্ঠিত। রেল ও অন্যান্য সরকারি দপ্তরে অনেকেই দীর্ঘকাল ধরে উপযুক্ত পরিষেবা দিয়ে আসছেন। বেসরকারি ক্ষেত্রে বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে সচেতনতার অভাবে দৃষ্টিহীন কর্মীর সংখ্যা নগণ্য। সামাজিক ক্ষেত্রে সচেতনতার অভাব থাকলেও একথা স্পষ্ট করে বলা যায় বিগত দুশো বছরে আর্থ সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে দৃষ্টিহীনদের সামাজিক অবস্থানের বিবর্তন ঘটেছে। এ বিষয়ে সুস্পষ্ট আইন প্রণয়ন ও সামাজিক আন্দোলনের প্রয়োজন আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু দৃষ্টিহীনদের সামাজিক অবস্থানের বিবর্তন সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের ইঙ্গিতবাহী এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

২.১৪ দৃষ্টিহীনদের বিজ্ঞান প্রযুক্তির ব্যবহার

প্রাচীনকালে যখন ব্রেল পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়নি তখন দৃষ্টিহীনদের পঠন-পাঠন চলতো মূলত শ্রুতি মাধ্যমে। সে যুগে শ্রুতি ও স্মৃতির ওপর নির্ভর করে কোনো-কোনো দৃষ্টিহীন ব্যক্তি জ্ঞান ও প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ দৃষ্টিহীনদের কাছে জ্ঞানের দরজা বন্ধ ছিল। ব্রেল পদ্ধতির আবিষ্কার ও প্রচলনের ফলে অনেকের কাছে পঠনপাঠন সহজ হয়েছে। বর্তমানে ব্রেল পাঠ্যবই ছাড়াও শ্রুতিগ্রন্থের সাহায্যেও অনেকে পড়াশোনা করেন। এর মূল কারণ হলো পর্যাপ্ত ব্রেল বইয়ের অভাব। শ্রুতিগ্রন্থও প্রয়োজন অনুযায়ী পর্যাপ্ত নয়। তবে বর্তমানে স্মার্টফোন ল্যাপটব, কম্পিউটারের সাহায্যে দৃষ্টিহীনরা আগের তুলনায় অনেক বেশী জ্ঞানলাভের সুযোগ পেয়েছে। স্মার্টফোনের ক্ষেত্রে টকব্যাক্ এবং কম্পিউটারের ক্ষেত্রে জস ও এনভিডিয়ের মতো সফটওয়্যার দৃষ্টিহীনদের পঠন ও লিখনের ক্ষেত্রে সহায়ক। এ সম্বন্ধে আরো গবেষণা ও চর্চার প্রয়োজন কিন্তু সফটওয়্যার কোম্পানিগুলি বাজার অনুযায়ী তাদের গবেষণা ও উৎপাদন চালায়। যদি সরকারি তরফে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয় তাহলে দৃষ্টিহীনদের পঠনপাঠনের জগতে আরো বিকাশ ও উন্নতি ঘটতে পারে। প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মাধ্যমে মানুষ তার নানান ধরনের অক্ষমতাকে কাটিয়ে উঠতে সক্ষম।

২.১৫ প্রতিবন্ধকতা ও বর্তমান প্রজন্ম: একটি সমীক্ষা

অন্যান্য সামাজিক ধারণার মতো প্রতিবন্ধকতার ধারণাও বদলাচ্ছে। প্রশ্ন হলো সেই বদল বর্তমান প্রজন্মের চিন্তাভাবনায় কতখানি ধরা পড়েছে তা আমাদের দেখতে হবে। বর্তমান প্রজন্মের ছাত্রছাত্রীরাই হলো আগামীর চালিকাশক্তি। তাদের মধ্যে উক্ত বিষয়ে কতখানি সচেতনতা গড়ে উঠেছে তার ওপর ভবিষ্যৎ সমাজের অগ্রগতি ও বিবর্তন বহুলাংশে নির্ভর করছে। আমরা বর্তমান প্রজন্মের চিন্তাভাবনা বোঝার উদ্দেশ্যে কলেজের ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি সমীক্ষার ব্যবস্থা করি। ২০২০ সালের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে

কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে শতাধিক কলেজ ছাত্রছাত্রীর ওপর এই সমীক্ষা চালানো হয়। আমরা উক্ত সমীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর বিশ্লেষণ করে তার ফলাফল বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব।

১। তুমি কি কোনো প্রতিষ্ঠিত প্রতিবন্ধী মানুষকে দেখেছো?

সাধারণত অধিকাংশ মানুষ মনে করে প্রতিস্পর্ধী ব্যক্তিরা বিশেষত যারা দৃষ্টিহীন তারা গান-বাজনা ছাড়া অন্য কিছু পারে না। সমাজের নানাক্ষেত্রে তারা অনুপস্থিত। এই ধারণা যাচাই করার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা প্রতিষ্ঠিত প্রতিস্পর্ধী মানুষ সম্পর্কে অবগত কিনা। এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে একশো ছয়জন। তার মধ্যে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী জানায় যে, তারা প্রতিষ্ঠিত প্রতিস্পর্ধী মানুষ সম্পর্কে অবগত। বিষয়টি সমাজের সামগ্রিক অগ্রগতির পক্ষে ইতিবাচক।

২। রাস্তায় কোনো প্রতিবন্ধী মানুষকে দেখলে তুমি কী করবে?

সমাজে যারা নানা শারীরিক সমস্যার শিকার অনেক সময় রাস্তাঘাটে তাদের অন্যের সাহায্য প্রয়োজন হয়। কিন্তু বাস্তবে সব সময় তথাকথিত স্বাভাবিক লোকজন তাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে না। নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের সে সম্পর্কে ধারণা কি তা জানার জন্য প্রশ্ন করা হয়েছে যে এমন পরিস্থিতিতে তারা কি করবে? এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে একশো তিনজন। সকলেই সাহায্য করার পক্ষে মতামত দিয়েছে। এ ক্ষেত্রেও বিষয়টিকে ইতিবাচক ইঙ্গিত হিসেবে ধরতে হবে।

৩। প্রতিবন্ধী মানুষদের সম্পর্কে তোমার ধারণা কী?

প্রতিস্পর্ধী মানুষ সম্পর্কে সমাজে অনেকেরই ধারণা নেতিবাচক। তাই সে সম্পর্কে নতুন প্রজন্মের ধারণা জানতে চাওয়া হয়েছে। প্রশ্নটির উত্তর দিয়েছে তিরানব্বই জন। এ সম্পর্কে অধিকাংশেরই ধারণা সদর্থক। সামান্য সংখ্যক তাদের আলাদা বলে মনে করে।

৪। এদের কি সবসময় দয়া বা সহানুভূতির চোখে দেখা উচিত?

সাধারণত সমাজে যারা নানান অঙ্গহানির শিকার তাদের অনেকেই দয়া বা সহানুভূতির চোখে দেখে থাকে। আসলে প্রয়োজন সমানুভুতি বা সামাজিক দায়িত্ববোধের মানসিকতা। সে সম্পর্কে নতুন প্রজন্মের মতামত চাওয়া হয়েছে। এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে একশো চারজন। তার মধ্যে অর্ধেক জন মনে করে সহানুভূতি বা দয়ার চোখে তাদের দেখা উচিত। আবার অর্ধেকজন সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখার বিপক্ষে। এমনও হতে পারে অনেকের কাছে সহানুভূতি ও সমানুভূতি সমর্থক।

৫। তোমার পরিবারে যদি কেউ প্রতিবন্ধী হয় তাহলে তার জন্য তুমি কী ধরনের উদ্যোগ নেবে?

সাধারণত মানুষের অজ্ঞতা বা অসচেতনতার জন্য মানুষ প্রতিবন্ধকতার শিকার হয়। সমাজে ও পরিবারে তাদের শিক্ষার ও পুনর্বাসনের জন্য সঠিক সময়ে সঠিক ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। অনেক ক্ষেত্রে তারা নানান নেতিবাচক মানসিকতা বা অবহেলার শিকার হয়। সে সম্পর্কে নতুন প্রজন্মের ধারণা জানার জন্য উপরিউক্ত প্রশ্নটি করা হয়েছে। প্রশ্নটির উত্তর দিয়েছে নিরানব্বই জন। অধিকাংশই মনে করে যে, তাকে অনাদর বা অবহেলা না করে পরিবারের একজন হিসেবে মনে করে তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। বিষয়টি সমাজের পক্ষে সদর্থক।

৬। মানুষ কেন প্রতিবন্ধী হয়? এ সম্পর্কে তোমার মতামত কী?

মানুষের প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে সমাজে অনেক নেতিবাচক ও অবৈজ্ঞানিক ধারণা প্রচলিত আছে। নতুন প্রজন্মের ধারণা সে সম্পর্কে কত দূর বৈজ্ঞানিক তা দেখার জন্য এমন প্রশ্ন করা হয়েছে। এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে তিরানব্বই জন। প্রায় সকলেই বিজ্ঞানসম্মত কারণ দেখিয়েছে। আমরা বলতে পারি সময়ের সঙ্গে সমাজের অজ্ঞতা অনেক কমেছে।

৭। সমাজে প্রতিবন্ধীদের জন্য কি আলাদা সুযোগসুবিধা থাকা উচিত?

সাধারণত শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে প্রতিস্পর্ধীদের জন্য কিছু পদ সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকে। বিষয়টিকে অনেকেই ভালো চোখে দেখে না। উক্ত বিষয়টিকে এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা কিভাবে দেখে তা জানার জন্য এই ধরনের প্রশ্ন করা হয়েছে। প্রশ্নটির উত্তর দিয়েছে একশো তিন জন। প্রায় সকলেই মনে করে আলাদা সুযোগ সুবিধা থাকা উচিত।

৮। প্রতিবন্ধী মানুষদের সঙ্গে কি সমাজের আর পাঁচজনের মতো সমান ব্যবহার করা উচিত?

সমাজে যারা প্রতিবন্ধকতার শিকার শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে, সমাজ ও পরিবারে অনেকেই তাদের সঙ্গে আপত্তিকর আচরণ করে। এ সম্পর্কে নতুন প্রজন্মের ধারণা জানার জন্য প্রশ্ন করা হয়েছে। এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে একশো তিন জন। অধিকাংশই মনে করে আর পাঁচ জনের মতো সমান ব্যবহার করা উচিত। বিষয়টি আগামী দিনে অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গড়ার পক্ষে সদর্থক।

৯। তুমি কি এমন কোনো কবি শিল্পী বা নাট্যকারে কথা জানো যিনি প্রতিবন্ধী ছিলেন?

সমাজে প্রতিস্পর্ধীরাও যে সাহিত্য শিল্পসংস্কৃতির নানান শাখায় সম্মানের আসন লাভ করেছে সে সম্পর্কে অনেকেই অবগত নয়। আমরা নতুন ছেলেমেয়েদের এ সম্পর্কে

মতামত জানার জন্য এমন প্রশ্ন করেছি। প্রশ্নটির উত্তর দিয়েছে সাতানব্বই জন। অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী এ সম্পর্কে সচেতন। তারা জানায় যে তারা এমন নজির দেখেছে।

১০। মানুষের শারীরিক প্রতিবন্ধকতার কারণে মেধা বা বুদ্ধির কোনো পার্থক্য হতে পারে? অনেকে মনে করে মানুষের অঙ্গহানির কারণে বোধ হয় মেধা বা বুদ্ধিরও পার্থক্য হয়। তারা অন্যদের তুলনায় নানা বিষয়ে কম জানে। এ সম্পর্কে নতুন ছেলেমেয়েদের ধারণা জানার জন্য উক্ত প্রশ্নটি করা হয়েছে। এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে একশো চার জন। অর্ধেকের মতামত হলো পার্থক্য থাকে। বাকি অর্ধেক মনে করে কোনো পার্থক্য থাকে না। বাস্তবে পার্থক্য থাকার বিষয়টি বিজ্ঞান দ্বারা সমর্থিত নয়।

দৃষ্টিহীনদের সামাজিক অগ্রগতি ও বিবর্তনে বিষয়টি বোঝার জন্য নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের ওপর যে সমীক্ষা চালানো হয় তার ফলাফল মোটের ওপর ইতিবাচক। উক্ত সমীক্ষায় যারা উত্তর দিয়েছে তাদের মধ্যে অর্ধেক নারী ও অর্ধেক পুরুষ। এদের বয়স ১৭-৩৭ এর মধ্যে। এদের মতামতের ওপর ভিত্তি করে আমরা বলতে পারি যে সমাজে দৃষ্টিহীন ও অন্যান্য প্রতিস্পর্ধীদের সম্পর্কে ধারণা বদলাচ্ছে। আগামী ভবিষ্যৎ সুস্থ ও উন্নততর অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজের দিকে এগিয়ে চলেছে।

২.১৬ উপসংহার

আমরা দৃষ্টিহীনদের সামাজিক অবস্থান ও অগ্রগতি প্রসঙ্গে শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও সাহিত্য-সংস্কৃতির ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখেছি যে বিগত দু'শো বছরে উক্ত ক্ষেত্রগুলিতে বেশ কিছু প্রগতিশীল পদক্ষেপ গৃহীত ও স্বীকৃত হয়েছে। শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে দৃষ্টিহীন ব্যক্তিরা তথাকথিত সক্ষম ব্যক্তিদের সঙ্গে কোনো কোনো ক্ষেত্রে একাসন লাভ করেছে। সাহিত্য ও সংস্কৃতির জগতেও তারা সম্মানজনক অবস্থান অর্জন করেছে। বর্তমান প্রজন্মের যুবক-

যুবতীদের ওপর করা সমীক্ষা থেকে দেখেছি তাদের প্রতিস্পর্ধীদের সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি মোটের ওপর ইতিবাচক। যদিও সমাজের বৃহত্তর ক্ষেত্রে আরো বদল আসা প্রয়োজন যাতে মানুষের অঙ্গবৈকল্যকে আমরা মানববৈচিত্রের অংশ হিসেবে গ্রহণ করে সজাগ ও সক্রিয় উন্নততর অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনের দিকে অগ্রসর হতে পারি। তবে আধুনিক কালে মানবিক অধিকার ও বিজ্ঞানচর্চার যুগে পুরোনো সক্ষমতা ও অক্ষমতার ধারণা বদলেছে। সেই বদলের দিক থেকে আমরা আধুনিক বাংলা সাহিত্যে সৃষ্ট চরিত্রগুলির বিচার-বিশ্লেষণ করব। চরিত্রগুলির চর্চা ও অবস্থানের মধ্যে দিয়ে আমরা লেখকদের সমাজমনস্কতা বোঝার চেষ্টা করব। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে বাংলা সাহিত্যের ক্রম অনুযায়ী মূল আলোচনাটি অগ্রসর হবে।

তথ্যসূত্র

১। সাক্ষাৎকার বিশ্বজিৎ ঘোষ, অধ্যক্ষ নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন ব্লাইণ্ড বয়েজ অ্যাকাডেমি, ২৫ জানুয়ারি, ২০১৯।

২। পূর্বোক্ত, ২০১৯।

৩। নন্দ, বিষ্ণুপদ ও ঘোষ, সনৎ কুমার। *বিশেষ শিক্ষার ইতিহাস*। রবীন্দ্রভারতী: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯। পৃ. ৯।

৪। পূর্বোক্ত, পৃ. ১০।

৫। পূর্বোক্ত, পৃ. ১০।

৬। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩।

৭। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩।

৮। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬।

৯। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫।

১০। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭।

১১। পূর্বোক্ত, পৃ. ১০।

১২। পূর্বোক্ত, পৃ. ২১।

১৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩।

১৪। পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪।

১৫। পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭।

১৬। *স্বামীজির আহ্বান,* উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা। পৃ. ২৯।

১৭। রাহা, দিলীপ। *পথ দেখালো যারা*। কলকাতা: নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম ব্লাইন্ড বয়েজ অ্যাকাডেমি, ১৯৮২। পৃ. ১০

১৮। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫।

১৯। দে, বেলা। *বিশ্ববন্দিত প্রতিবন্ধী*। কলকাতা: এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৯। পৃ. ৪৫।

২০। সাক্ষাৎকার নারায়ণ গাঙ্গুলি, সভাপতি ব্লাইন্ড পারসন্স অ্যাসোসিয়েশন। ৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯।

২১। সাক্ষাৎকার কৌশিক গাঙ্গুলি, চিত্রপরিচালক। ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৯।

২২। সাক্ষাৎকার সত্যজিৎ মণ্ডল, সম্পাদক *স্পর্শনন্দন* পত্রিকা। ১৭ জুন, ২০১৯।

২৩। সাক্ষাৎকার বিষ্ণুপদ নন্দ, সম্পাদক *প্রতিস্পর্ধী* পত্রিকা। ১৩ অক্টোবর, ২০২০।

২৪। সাক্ষাৎকার সৈকত কর, যুগ্ম সম্পাদক *শ্রুতিকল্প* পত্রিকা। ১৭ অক্টোবর, ২০২০।

২৫। সাক্ষাৎকার তারক হালদার, সহসম্পাদক *সূর্যমুখী* পত্রিকা। ১৮ অক্টোবর, ২০২০।

২৬। সাক্ষাৎকার সুভাষ দে, নাট্যপরিচালক অন্যদেশ। ১৯ অক্টোবর, ২০২০।

২৭। *স্বামীজির আহ্বান,* পৃ. ২৫।

২৮। সাক্ষাৎকার চন্দন মাইতি, সম্পাদক *ভিক্যাব*। ১৫ অক্টোবর, ২০২০।

তৃতীয় অধ্যায়

আধুনিক বাংলা কাব্য ও নাটকে দৃষ্টিহীনতা প্রসঙ্গ

৩.১ সূচনা

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে প্রতিবন্ধকতা ও দৃষ্টিহীনতা কী ও কেমন তত্ত্বগতভাবে তার একটি রূপরেখা অঙ্কনের চেষ্টা করেছি। এর পর আমরা আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিবর্তনের কথা স্মরণে রেখে দৃষ্টিহীনতা ও প্রতিবন্ধকতার বিষয়টি আলোচনা করব। প্রাথমিকভাবে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে যেখানে যেখানে দৃষ্টিহীনতার প্রসঙ্গ এসেছে তার একটি তালিকা যেমন প্রস্তুত করা হবে তেমনই পাঠ বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমাজে ও সাহিত্যে দৃষ্টিহীনদের চর্চা ও অবস্থান নির্ধারণের চেষ্টা করব। সাহিত্যিকদের সমাজমনস্কতার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিচার করা হবে। পাশাপাশি প্রতিবন্ধকতার সামাজিক নির্মাণ ও সাহিত্যিক নির্মাণের তুলনামূলক আলোচনাও গুরুত্ব পাবে।

৩.২ সাহিত্য সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা

সমাজ ও সাহিত্য বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। প্লেটো (আনুমানিক ৪২৮ খ্রীঃ পূর্বাব্দে) তাঁর *রিপাবলিক* গ্রন্থে কাব্যকে জগতের নিছক অনুকৃতি বলে মনে করেছেন। তাই তিনি কবিদের মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে *আদর্শ রাষ্ট্র* থেকে তাদের নির্বাসন দিয়েছেন। প্লেটোর শিষ্য অ্যারিস্টটল তার *পোয়েটিক্স* গ্রন্থে সাহিত্যকে পুনর্বাসন দিয়েছেন। তিনি সাহিত্যের সত্যকে সবার ওপরে স্থান দিয়েছেন। উনিশ শতকে ফ্রান্সে ও আমেরিকায় শিল্পের জন্য শিল্পতত্ত্বটি গুরুত্ব পায়। এডগার অ্যালান পো, মালার্মে প্রমূখ ব্যক্তিবর্গ সাহিত্যের বাস্তব উপযোগিতার তত্ত্বকে আবিষ্কার করেছেন। আবার অনেকে সাহিত্যকে বলেছেন জীবনের সমালোচনা 'a criticism of life.'[১] মার্কসবাদী সাহিত্যচর্চার

যুগে শিল্পসাহিত্যকে বলা হয়েছে সমাজের 'super structure'। অনেকে সাহিত্যকে সমাজের দর্পণ বলে আখ্যা দিয়েছেন। তবে সাহিত্য সরাসরি সমাজের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত করে না। সাহিত্য হলো এক ধরনের নির্মাণ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১ খ্রিঃ) মন্তব্যটি এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য- "অন্তরের জিনিসকে বাহিরের, ভাবের জিনিসকে ভাষার এবং ক্ষণকালের জিনিসকে চিরকালের করিয়া তোলা সাহিত্যের কাজ।"[২] সাহিত্যের সংজ্ঞা ও স্বরূপ সম্পর্কে তাত্ত্বিক বিতর্কের অবসান আজও হয়নি। তবে সাধারণভাবে বলা যায় যে সাহিত্য বলতে বোঝায় কাব্য, নাটক, ছোটোগল্প, উপন্যাসের মতো সৃজনশিল্প, যার মাধ্যমে এক হৃদয়ের সঙ্গে আর এক হৃদয়ের সংযোগ স্থাপিত হয়। পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব এবং ভারতীয় পুরাকথা অনুযায়ী সাহিত্যের আদি রূপ হলো কাব্য। প্রাথমিকভাবে কাব্য ও নাটকের মধ্যে কোনো বিভাজন ছিল না। সংস্কৃত সাহিত্যে নাটককে বলা হয় দৃশ্যকাব্য। আধুনিক কালে কাব্য ও নাটক স্বতন্ত্র শিল্পরূপ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। বর্তমান অধ্যায়ে আধুনিক বাংলা কাব্য ও নাটকে দৃষ্টিহীনতার প্রসঙ্গ পর্যালোচনা করা হবে। সাহিত্যের মূল আলোচনায় প্রবেশের আগে আমরা সমাজমনস্কতা বিষয়টি বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব।

৩.৩ সাহিত্য ও সমাজমনস্কতা

সমাজকে বাদ দিয়ে যেমন সাহিত্যের কথা ভাবা যায় না তেমনই সাহিত্য ও সমাজমনস্কতা বিষয় দুটি গভীরভাবে সংযুক্ত। সাম্প্রতিককালে সাহিত্য সমালোচনায় সাহিত্য ও সাহিত্যকার সম্পর্কে কথাটি ব্যবহৃত হচ্ছে। সমাজমনস্কতার কোনো বাংলা প্রতিশব্দ সংসদ বাংলা অভিধান বা বাংলা কোষগ্রন্থে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তবে সমাজমনস্ক শব্দটিকে ভাঙলে আমরা পাই সমাজের প্রতি মন বা চিন্তা যার। বাংলা অভিধানে শব্দটির অনুপস্থিতির কারণ

সম্ভবত সাম্প্রতিকতা। ইদানিং কালে সাহিত্য সমালোচনায় শব্দটির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তাই আমরা প্রায়োগিক দিক থেকে শব্দটিকে গ্রহণ করবো।

কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে আমরা যখন সমাজমনস্কতা কথাটি ব্যবহার করি তখন আমরা বলতে চাই ওই ব্যক্তি সমাজ সম্পর্কে সচেতন। এখানে সমাজসচেতনতার অর্থ হলো সমাজ নামক প্রতিষ্ঠানে নিহিত থাকা নানান ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের মত, বিশ্বাস, উন্নতি, অবক্ষয় এবং নানান সংঘাত ও সম্ভাবনা সম্পর্কে অবগত থাকা। সেই অর্থে সমাজমনস্কতা হলো শিল্প সাহিত্যের গোড়ার কথা। তবে কবি ও লেখকদের সকলে সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে সামাজিক দায়বদ্ধতাকে আবশ্যিক বলে মনে করেন না। বাংলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর (১৮৯৪ - ১৯৫০ খ্রীঃ) লেখায় সমাজের ছবি থাকলেও তিনি কোনো সামাজিক প্রশ্নকে উত্থাপন করেননি। কিন্তু শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৮ – ১৯৩৮ খ্রীঃ) তাঁর সাহিত্যে ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যেকার নানা প্রশ্নকে উত্থাপন করেছেন। ফরাসী বিপ্লব-এর (১৭৮৯ খ্রীঃ) ক্ষেত্রে কবিসাহিত্যিকদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। আবার রুশ বিপ্লব-এর (১৯১৭ খ্রীঃ) পরবর্তীকালে বিশ্বসাহিত্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। বাংলা সাহিত্যে মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬ - ২০১৬ খ্রীঃ) প্রান্তিক সম্প্রদায়ের জীবনচিত্র অঙ্কনের ক্ষেত্রে নানান সমস্যা ও সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেছেন। তবে সাহিত্য ও সমাজমনস্কতার বিষয়টি একমুখী বা সরলরৈখিক নয়। কখনো সমাজ সাহিত্যকে প্রভাবিত করে আবার সাহিত্য বা সাহিত্যকারের সমাজ ভাবনা সমাজকে প্রভাবিত করে।

সাহিত্যে যখন কোনো সামাজিক সমস্যাকে পরিবেশন করা হয় তখন তা আমাদের ভাবায়। অনেক ক্ষেত্রে সাহিত্যকার শুধু সমস্যার কথা উপস্থাপন করেই ক্ষান্ত হন না নতুন সম্ভাবনা বা ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে নিহিত নানান আকাঙ্ক্ষার প্রতি অঙ্গুলি সংকেত করেন। প্রকৃতপক্ষে সাহিত্য হলো সামাজিক নির্মাণকে অতিক্রম করে এক নতুন জগতের নির্মাণ।

যেমন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর (১৯১০ - ১৯৫৬ খ্রীঃ) *পদ্মানদীর মাঝি* (১৯৩৬ খ্রীঃ) উপন্যাসে ময়নাদ্বীপের পরিকল্পনা আমরা লক্ষ্য করেছি। আবার উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে মানবতাবাদ প্রসারের যুগে বাংলা সাহিত্যে নারী মুক্তির আকাঙ্ক্ষা সমাজকে প্রভাবিত করে। মধুসূদন দত্ত (১৮২৪ - ১৮৭৩ খ্রীঃ) তাঁর *বীরাঙ্গনা* (১৮৬২ খ্রীঃ) কাব্যে পৌরাণিক নারী চরিত্রের পুনর্নির্মাণের মধ্যে দিয়ে নারীমনের অবরুদ্ধ বাসনার দ্বার উদ্ঘাটন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১ - ১৯৪১ খ্রীঃ)-এর *চিত্রাঙ্গদা* (১৮৯২ খ্রীঃ) কাব্যে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, নারী শুধু পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী নয় বরং, জীবনে চলার পথে সুখদুঃখের সমান অংশীদার। কাজী নজরুল ইসলামের সাম্যবাদী কবিতাগুচ্ছের নারী বিষয়ক কবিতাগুলিও এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। এখানেই এসে পড়ে সাহিত্যকারের সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রশ্ন। আমরা আধুনিক বাংলা সাহিত্যে দৃষ্টিহীনতা প্রসঙ্গে সামাজিক দায়বদ্ধতা বা সমাজসচেতনতা অর্থে সমাজমনস্কতার অনুসন্ধান করবো।

৩.৪ আধুনিক বাংলা কবিতায় দৃষ্টিহীনতা প্রসঙ্গ

সাহিত্যের আধুনিকতা বিষয়টি তাত্ত্বিক ও কাব্য সমালোচকগণ নানা দিক থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। সেই আলোচনায় সব চেয়ে গুরুত্ব পেয়েছে সময়ের সাথে সাহিত্যের সম্পর্ক। বাংলায় আধুনিক শব্দটি ব্যুৎপত্তিগতভাবে সংস্কৃত অধুনা শব্দ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। অধুনা শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো ‘এখন’। বাংলা সাহিত্যের যুগ বিভাজনের ক্ষেত্রে অধিকাংশ তাত্ত্বিক ও সাহিত্য সমালোচকগণ তুর্কি আক্রমণকে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বিভাজন রেখা বলে মেনে নিয়েছেন। একইভাবে মধ্য ও আধুনিক যুগের বিভাজন রেখা বলা হয় ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার কালপর্বকে। মোটামুটিভাবে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আধুনিক বাংলা কাব্যের জয়যাত্রা শুরু হয়। তবে রবীন্দ্রনাথের আগে সেভাবে বাংলা কাব্যে দৃষ্টিহীনতার

প্রসঙ্গের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা বাংলা কাব্যের যে দু'একটি ক্ষেত্রে দৃষ্টিহীনতার প্রসঙ্গ পেয়েছি সে সম্পর্কে পর্যালোচনা করবো।

৩.৫ সহজপাঠের আলোচনায় দৃষ্টিহীনতা প্রসঙ্গ

১৮৬১ থেকে ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনের সময় কাল। দীর্ঘ আশি বছরের জীবনে সাহিত্যের প্রায় সব শাখাতেই তিনি তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। তবে তাঁর কবি প্রতিভার বৈচিত্র ও ব্যাপকতার জন্য তিনি বাংলা সাহিত্যের কবিকুলের আদর্শ। "ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধকে যেমন বঙ্কিমযুগ নাম দেওয়া হয়, তেমনই বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধকে রবীন্দ্রযুগ নাম দেওয়া যেতে পারে।"[৩] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ কাব্যগ্রন্থ যেখানে নিজস্ব কবিপ্রতিভার স্বাক্ষর রয়েছে যেমন, *মানসী* (১৮৯০খ্রীঃ), *সোনার তরী* (১৮৯৪ খ্রীঃ), *চিত্রা* (১৮৯৬ খ্রীঃ), *চৈতালী* (১৮৯৬ খ্রীঃ), উনিশ শতকের শেষ ভাগে প্রকাশিত হয়েছিল। তবে বিংশ শতাব্দীতে তাঁর নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর থেকে বাংলা সাহিত্যে তাঁর প্রভাব অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। বাংলা তথা বিশ্ব সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যেমন তিনি নিজেকে বারবার বদলেছেন তেমনই মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে তাঁর কবিসত্তা স্পর্শ করার চেষ্টা করেছে। *শিশু* (১৯০৯ খ্রীঃ), *শিশু ভোলানাথ* (১৯২২ খ্রীঃ), *সহজ পাঠ* (১৩৩৭ বঙ্গাব্দ) ইত্যাদি গ্রন্থগুলি বাংলা শিশুসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। তাঁর স্ত্রী মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর পর তিনি শিশু গ্রন্থটি রচনা করেন। সে প্রসঙ্গে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন - "মাতৃহারা শিশুকটিকে আনন্দ দেবার জন্য কবি রূপকথা প্রিয় শিশুচিত্তের অপূর্ব কাব্য রচনা করলেন। এই শিশু কাব্য শিশুমনের কাব্যকবিতা হিসেবে অতি বিস্ময়কর। কেউ কেউ শিশুজীবনের রূপকে অনেক তত্ত্বকথা বলেছেন বটে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো শিশুমনের অন্তঃপুরে আর বড়ো কেউ প্রবেশ করতে পারেননি।" [৪]

উনিশ শতকের শেষভাগে শিলাইদহে থাকাকালীন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর *সহজ পাঠ* -এর খসড়া রচনা করেন। তার অনেক দিন পর বিশ শতকের তিনের দশকে *সহজ পাঠ* গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। বইটিতে সহজ সরল, অনাড়ম্বর ভাষায় টুকরো টুকরো গ্রামবাংলার ছবি, সঙ্গে নন্দলাল বসুর দৃষ্টিনন্দন চিত্রকলা বইটিকে আকর্ষণীয় শিশুপাঠ্যের মর্যাদা দিয়েছে। শিশুদের ছবির সাহায্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সাথে পরিচয় ঘটানো এই বইয়ের প্রধান উদ্দেশ্য। প্রাথমিকভাবে বইটি শিশুপাঠ্যের উদ্দেশ্য পূরণ করলেও এর ছত্রে ছত্রে লুকিয়ে আছে আমাদের গ্রামবাংলার কত শত চেনা ছবি। হয়তো শব্দ দিয়ে ছবি আঁকার খেয়ালেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলাদেশের প্রান্তিক মানুষ হিসেবে দৃষ্টিহীন মানুষের কথা বলেছেন। এইসব টুকরো টুকরো জীবনের ছবি তৎকালীন সমাজে দৃষ্টিহীনদের অবস্থাকে বুঝতে কিছুটা সাহায্য করে। 'হাট' কবিতায় তিনি লিখেছেন,

"অন্ধকানাই পথের পরে,
গান শুনিয়ে ভিক্ষা করে"।[৫]

সমাজের এই ছবি দেখে মনে হয় যে, জনবহুল স্থানে দৃষ্টিহীনদের গান গেয়ে ভিক্ষা করাই ছিল তৎকালীন সমাজের পরিচিত ছবি। এই পেশার সঙ্গে জড়িয়ে আছে প্রান্তিকতা বা বিচ্ছিন্নতার ধারণা। *সহজ পাঠ* দ্বিতীয় ভাগের ত্রয়োদশ পাঠে আমরা কুঞ্জ নামক এক চরিত্রের কথা পাই সেখানে এই প্রান্তিকতার ধারণাটি আরো স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। অঞ্জনা নামক নদীর তীরে চন্দনি গাঁয়ে দৃষ্টিহীন কুঞ্জ আশ্রয় নিয়েছে-

"জীর্ণ ফাটল ধরা এক কোণে তারি
অন্ধ নিয়েছে বাসা কুঞ্জবিহারি"।[৬]

এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, সমাজের মূল স্রোতে তার স্থান হয়নি। পরবর্তী ছত্রে বিচ্ছিন্নতার বিষয়টি আরো তীব্র হয়ে ওঠে। তাই কবি লিখেছেন,

"আত্মীয় কেহ নাই নিকট কি দূর,
আছে এক লেজ কাটা ভক্ত কুকুর"।[৭]

একতারাই কুঞ্জবিহারির জীবনের সঙ্গী। এর সাহায্যে সে গান শুনিয়ে উদরপূর্তির ব্যবস্থা করে। গঞ্জের জমিদার দয়া করে তাকে দুবেলা দুমুঠো অন্য দান করেন। তার গান শুনে কেউ-কেউ তাকে শীতবস্ত্র দান করে।

"ভঞ্জের পিসি তাই সন্তোষ পান,
কুঞ্জকে করেছেন কম্বল দান"।[৮]

সমাজের কাছাকাছি থেকেও দৃষ্টিহীনতার কারণে সে সমাজের মূল স্রোত থেকে আলাদা। গানবাজনা, ভিক্ষাবৃত্তি, দয়া-দাক্ষিণ্য তার বেঁচে থাকার মূল উপাদান। বিশ শতকের তিনের দশকে দৃষ্টিহীনদের একাংশ আলোকপ্রাপ্ত হয়ে আর্থসামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ সে সম্বন্ধে অবগতও ছিলেন। 'দৃষ্টিদান' (১৩০৫ বঙ্গাব্দ) গল্পের কুমুর মধ্যে আমরা তীব্র সমাজ সচেতনতা লক্ষ্য করেছি। তবে কুমু চরিত্রে প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করার মধ্যে সমাজসচেতনতা যেমন আছে তেমনই একে আমরা তৎকালীন সমাজের প্রেক্ষিতে একধরনের সাহিত্যিক নির্মাণও বলতে পারি। কেননা, সাহিত্যকার যেমন বাস্তব সমাজজীবনের ছবি আঁকেন তেমনই তিনি সমাজকে যেভাবে দেখতে চান সাহিত্যে ব্যক্তি ও সমাজের সেই আকাঙ্খা রূপায়িত হয়। তবে একথা বলা যেতে পারে সহজপাঠে অনাড়ম্বর জীবনের ছবি আঁকার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ কোনো সমাজভাবনার দ্বারা পরিচালিত হননি। শিশুর মতো মন নিয়ে তিনি জীবনের ছবি এঁকেছেন।

৩.৬ যতীন্দ্রমোহন বাগচী (১৮৭৮-১৯৪৮)

যতীন্দ্রমোহন বাগচী করুণানিধানের কিছুকাল পরে কাব্য-সাধনা আরম্ভ করেন এবং রবীন্দ্রনাথের প্রভাবকে স্বীকার করে সেই আদর্শে *অপরাজিতা* (১৯১৯ খ্রীঃ), *নাগকেশর*

(১৯১৭ খ্রীঃ), *নীহারিকা* (১৯২৭ খ্রীঃ), *মহাভারতী* (১৯৩৬ খ্রীঃ) প্রভৃতি কাব্যের সাহায্যে একদা পাঠকমনে নতুন রস সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন।[৯] তিনি রবীন্দ্রযুগের একজন উল্লেখযোগ্য কবি। অনাড়ম্বর ভাষায় তিনি বাংলার গ্রামজীবনের ছবি এঁকেছেন। সাধারণ মানুষের সুখদুঃখের কথা যেমন তার কাব্যের আদর্শ তেমনই ইতিহাসচেতনা, অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সম্পর্ক, স্বদেশপ্রেম ইত্যাদি উপাদান তাঁর কাব্যকে বিশিষ্ট মাত্রা দিয়েছে। রবীন্দ্র প্রভাব সত্ত্বেও একটা সুস্থ, বাস্তব জীবনবোধ তাঁকে বাংলা সাহিত্যে স্বতন্ত্র স্থান দিয়েছে। আমাদের আলোচ্য 'অন্ধ বধূ' কবিতাটি *যতীন্দ্রমোহন বাগচীর শ্রেষ্ঠ কবিতা* থেকে সংগৃহীত।

অন্ধ বধূ: আলোচ্য 'অন্ধ বধূ' কবিতাটি বাংলা আধুনিক কাব্যের একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রতিস্পর্ধীকেন্দ্রিক সাহিত্য-ভাবনার প্রথম নিদর্শন হলো বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *রজনী*। উক্ত উপন্যাসের রজনী দৃষ্টিহীনা। কিন্তু আধুনিক বাংলা কাব্যে 'অন্ধ বধূ' নতুন সংযোজন। এক দৃষ্টিহীনা গ্রাম্যবধূর জীবন-যন্ত্রণাকে কবি কাব্যের বিষয় করেছেন। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন লিঙ্গ-বৈষম্যের কারণে মানুষ যেমন সামাজিক বৈষম্যের শিকার হয় তেমনই প্রতিবন্ধকতার কারণেও সে একইভাবে সামাজিক বৈষম্যের মুখোমুখি হয়। প্রতিবন্ধকতা এবং লিঙ্গবৈষম্য দুটোয় সামাজিক নির্মাণ। কোনো ব্যক্তি যদি একই সঙ্গে নারী ও প্রতিবন্ধী হয় তাহলে তাকে বেশী বৈষম্যের শিকার হতে হয়। রজনীর ক্ষেত্রে আমরা একই বিষয় লক্ষ্য করেছি। উক্ত কবিতাতেও দৃষ্টিহীনা গ্রাম্যবধূর জীবন-যন্ত্রণা বড় হয়ে উঠেছে।

কবি আত্মকথনের ভঙ্গিটি ব্যবহার করেছেন। দৃষ্টিহীনা বধূর জবানিতে তিনি তার জীবনযন্ত্রণার কথা পরিবেশন করেছেন। রজনীর মতো তার জীবনে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের

কোনো ভূমিকা নেই। তার জগৎ শব্দ-গন্ধ এবং স্পর্শ ইন্দ্রিয়ের উপাদান দ্বারা গঠিত। কবিতার শুরুতেই তার তীব্র ইন্দ্রিয় সচেতনতার পরিচয় পাই।

"পায়ে তলায় নরম ঠেকলো কি!
আস্তে একটু চল না ঠাকুরঝি
ওমা, এ যে ঝরা বকুল! নয়?"[১০]

এর পর বধূটি তার ঠাকুরঝিকে নানান প্রশ্ন করে। সেই প্রশ্ন করার মধ্যে দিয়ে যেমন তার সংবেদনশীলতার পরিচয় পাওয়া যায় তেমনই তার জগত যে অন্যদের চেয়ে কিছুটা আলাদা তাও বোঝা যায় 'আমের গায়ে বরণ দেখা যায়?'[১১] কিম্বা 'কোকিল - ডাকা শুনেছি সেই কবে'[১২] পঙক্তিগুলি লক্ষ্য করার মতো। দৃষ্টিহীনতার কারণে সে পরিবারের মধ্যে থেকেও নির্বাসিতা। 'তোমার ভাইয়ের সবই স্বতন্তর - ফিরে' আসার নাই কোন উদ্দেশ!'।[১৩] বোঝা যায় যে সে স্বামীর কাছে অবজ্ঞার শিকার হয়েছে। ছত্রটি একই সঙ্গে তার বিচ্ছিন্নতার কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ফাল্গুনী ভট্টাচার্যের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য- "তাঁর অন্ধত্বের সঙ্গে আর একটি বিষণ্ণতা যুক্ত হয়েছে সেটি স্বামীসঙ্গহীনতার একাকিত্ব।"[১৪] তার মধ্যে একটা উদাসীনতার ভাব লক্ষ্য করা যায়। একলা গৃহকোণ অপেক্ষা তার ভালো লাগে মুক্ত প্রকৃতির বুকে দীঘির জলের শীতল স্পর্শ। তার জীবনের একাকিত্ব আরো তীব্র হয়ে ওঠে যখন সে বলে -

"টানিস কেন? কিসের তাড়াতাড়ি-
সেই ত ফিরে' যাব আবার বাড়ী,
একলা থাকা সেই ত গৃহকোণ-"।[১৫]

পুকুরঘাটের পিছল পথে সে সাবধানে পা টিপে চলে। ঠাকুরঝিকে বলে, "এইখানেতে একটু ধরিস ভাই,"।[১৬] কথাটির মধ্যে তার সজাগ মনোভাবটি লক্ষ্য করা যায়। একইসাথে সামাজিক ও পারিবারিকভাবে নানান বৈষম্যের শিকার হলেও সে ভালোভাবে বাঁচতে চায়।

তার জীবনপিপাসাও লক্ষ্য করার মতো। কিন্তু সমাজে ও পরিবারে শেষ পর্যন্ত সে বাঁচার ভরসা খুঁজে পায় না। তাই তার মনে হয়-

"শেওলা-দীঘির শীতল অতল নীরে-
মায়ের কোলটি পাই যেন ভাই ফিরে!"[১৭]

কবিতাটি আমাদের সমাজে দৃষ্টিহীনা নারীর অবস্থান সম্পর্কে অবগত করে। নারীত্ব ও প্রতিবন্ধকতা বিষয়টির যোগসূত্রটিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গ্রাম্যবধূর জীবন-যন্ত্রণা চিত্রণে, অনুভূতির তীব্রতায় কবিতাটি তাই আধুনিক বাংলা কাব্যের নবতম সংযোজন। সমালোচকের মতে, "প্রতিবন্ধী নারীচরিত্র হিসেবে যতীন্দ্রমোহন বাগচীর অন্ধ বধূ অবশ্য উল্লেখ্য"[১৮]

৩.৭ রবীন্দ্রনাটকে দৃষ্টিহীনতা প্রসঙ্গ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার কাব্য সম্বন্ধে একদা লিখেছিলেন-

"আমার কবিতা, জানি আমি,
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সর্বত্রগামী।"[১৯]

এখানে শিল্পী ও স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানবজীবনের সর্বস্তরে প্রবেশের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রসাহিত্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তিনি সাহিত্যের নানা শাখাতে যেমন অবাধে বিচরণ করেছেন তেমনই ব্যক্তিগত শ্রেণীচেতনা অতিক্রম করে মানবজীবনের বিচিত্র অবস্থাকে বোঝার চেষ্টা করেছেন। নিজে জমিদার পরিবারের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও 'শাস্তি' গল্পে জমিদার শ্রেণীর নৃশংসতাকে দেখিয়েছেন। আসলে তাঁর শিল্পসত্তা সচেতন ও অচেতনভাবে শ্রেণী, জাতি, দেশকালকে অতিক্রম করে গেছে।

রবীন্দ্রসাহিত্যের নানা শাখায় বিভিন্ন সময় নানান প্রতিবন্ধকতার প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। 'দৃষ্টিদান' (১৩০৫) গল্পের কুমু তার স্বামীর ভুল চিকিৎসায় দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছে।

দৃষ্টিহীনতার কারণে দাম্পত্যজীবনে সমস্যা এবং শেষ পর্যন্ত সেই সমস্যাকে অতিক্রম করে কুমু তার প্রতিবন্ধকতাকে জয় করেছে। 'সুভা' (১২৯৯) গল্পের জন্মগতভাবে মুখ ও বধির সুভাষিণী এবং 'শুভদৃষ্টি' (১৩০৫) গল্পের মূক ও বধির বালিকা প্রতিবন্ধকতার কারণে সমাজে ও পরিবারে বৈষম্য ও নির্যাতনের শিকার হয়েছে। কাব্য ও নাটকেও সমাজের প্রান্তিক মানুষ হিসেবে আমরা বেশ কয়েকটি প্রতিবন্ধী চরিত্রের দেখা পাই। *সহজপাঠ* এর আলোচনায় আমরা দৃষ্টিহীনতা ও সঙ্গীতবিদ্যার প্রসঙ্গ পেয়েছি। এই নিদর্শনকে আমরা সমাজ ইতিহাসের প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করতে পারি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত প্রতিবন্ধকতাকে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে দেখা হতো। তৎকালীন সমাজে গানবাজনাই ছিলো দৃষ্টিহীনদের অর্থোপার্জনের মূল অবলম্বন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গীতিনাট্য ও কাব্যনাট্য সম্বন্ধে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন- "কৈশোর-যৌবনে লেখা রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি কাব্যনাট্য ও গীতিনাট্য প্রকাশিত হয়েছিল, যাতে লিরিক আবেগ, নাটকীয় ঘটনার বিকাশ এবং গীতিধর্ম (music) মিশে গিয়ে এক ধরনের বিচিত্র রস সৃষ্টি করেছিল।"[২০] তাঁর কাব্যনাট্য বা নাট্যকাব্যগুলি গীতিময়তা, ভাষারীতি এবং নাট্যরসের দিক থেকে বাংলা নাট্যসাহিত্যের অনন্য সম্পদ। এই শ্রেণীর নাটকগুলির মধ্যে *প্রকৃতির প্রতিশোধ* (১৮৮৪ খ্রীঃ), *মায়ারখেলা* (১৮৮৮ খ্রীঃ), *বাল্মীকি প্রতিভা* (১৮৮১ খ্রীঃ), *বিদায় অভিশাপ* (১৮৯৪ খ্রীঃ) এবং *চিত্রাঙ্গদার* (১৮৯২ খ্রীঃ) নাম উল্লেখযোগ্য। ঠাকুরবাড়ির নাট্যচর্চার পরিবেশ এবং জোড়াসাঁকো নাট্যমঞ্চের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা নানাভাবে তাঁর নাটক রচনাকে প্রভাবিত করেছিল। তবে এই শ্রেণীর নাটকগুলি প্রচলিত নাট্যধারা থেকে কিছুটা আলাদা। নাটক রচনার উদ্দেশ্যে তিনি অনেক ক্ষেত্রে ইতিহাস, পুরাণ ও মহাকাব্যের ঘটনাবলীকে আশ্রয় করেছেন। মহাভারতের ঘটনা অবলম্বনে 'বিদায় অভিশাপ' কাব্যনাট্যে কচ ও দেবযানী এই দুটি চরিত্রের মাধ্যমে তিনি যেভাবে

প্রেমের রক্তরাগ, ব্যর্থতা এবং পরিশেষে প্রসন্নতার বাতাবরণ সৃষ্টি করেছেন তা নাট্যসাহিত্যে অতুলনীয়। 'কর্ণকুন্তী সংবাদ', 'গান্ধারীর আবেদন' প্রভৃতিতে মহাকাব্য, গীতিকাব্য ও নাটকের আশ্চর্য সমন্বয় হয়েছে।[২১]

গান্ধারীর আবেদন: মহাভারতের সভাপর্বের ঘটনা অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার 'গান্ধারীর আবেদন' কাব্যনাট্য রচনা করেন। মহাভারতের মূল বিষয়কে অক্ষুণ্ণ রেখে রবীন্দ্রনাথ গান্ধারী, ধৃতরাষ্ট্র, দুর্যোধন চরিত্রগুলিকে তাঁর প্রজ্ঞা ও মননশীলতা দিয়ে নতুনভাবে নির্মাণ করেছেন। ১৮৯৭-৯৮ সালে ব্রিটিশ সরকার ভারত-বিরোধী সিডিশন বিল পাস করে। এই সময় থেকে ভারতীয় জনসমাজে শাসক-বিরোধী মানসিকতা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। সেই প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথ দুর্যোধনকে নির্মাণ করেছেন শাসককুলের প্রতিনিধিরূপে। এই নাটকে আমাদের আলোচ্য দুটি চরিত্র হলো গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্র। একজন জন্মগতভাবে দৃষ্টিহীন, আর একজন ছদ্ম প্রতিবন্ধকতাকে আশ্রয় করে জীবন অতিবাহিত করে।

ধৃতরাষ্ট্র: পাণ্ডবরা ছলের দ্বারা দ্যূতক্রিড়ার পরাজিত হয়ে রাজ্য ও সম্মান হারিয়ে বনবাসের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। সেই প্রেক্ষাপটে সম্রাট ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে তার পুত্র দুর্যোধন এবং মহারানী গান্ধারীর কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে নাটকটি নির্মিত হয়েছে। দুর্যোধন তার পিতাকে বলে এত দিনে তার রাজ্য লাভের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছে। সুখ তার জীবনের কাম্য নয়, সে জয় চায়। তাই সে বলে, "আজ আমি সুখী নহি, আজ আমি জয়ী"।[২২] পিতা ধৃতরাষ্ট্র বলে, 'আজই ধর্ম পরাজিত'[২৩] পুত্রের ছলনা ও কপটতা সম্পর্কে সে সচেতন। কিন্তু পুত্রকে নিবৃত করার ক্ষমতা তার নেই। এখানে তার পিতৃধর্ম ও রাজধর্মের মধ্যে বিরোধ বেধেছে। তার গলায় তীব্র আক্ষেপের সুর শোনা যায়, "অন্ধ আমি অন্তরে বাহিরে চিরদিন"।[২৪] সে তার বাস্তবিক অন্ধতাকে অনুভব করে কিন্তু অতিক্রম করতে পারে না। অনেকটা 'সধবার

একাদশী' নাটকের নিমচাঁদ চরিত্রের মতো। নিমচাঁদ উনিশ শতকের আচারভ্রষ্ট যুবকসম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। ইংরাজি সভ্যতা সংস্কৃতির অনুকরণে অতিরিক্ত মদ্যপান তার জীবনে সর্বনাশ বয়ে আনে। নিজের ভ্রষ্টাচারের জন্য সে অনুতপ্ত কিন্তু নিজেকে সংযত করতে পারে না।

স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের অনন্যতা এখানেই তিনি চরিত্রটিকে মহাভারতের সীমানা অতিক্রম করে আমাদের কালে এনে দাঁড় করিয়েছেন। এখানে তার শারীরিক সমস্যা অপেক্ষা হৃদয়ের সমস্যা বড়ো হয়ে উঠেছে। পিতৃস্নেহ তাকে অন্ধ বানিয়ে রেখেছে।

গান্ধারী: গান্ধারী চরিত্রটি ভারতীয় নারীসমাজের এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। সে পতির দৃষ্টিহীনতার কারণে সারাজীবন আলোর জগৎ থেকে স্বেচ্ছানির্বাসন বেছে নিয়েছে। ত্যাগ ও সহমর্মিতার দৃষ্টিতে দেখলে বিষয়টি অন্য মাত্রা পায় কিন্তু সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে যদি বিষয়টিকে দেখা যায় তাহলে বলতে পারি তার ছদ্ম প্রতিবন্ধকতা তার স্বামী ও পুত্রদের জীবনে নানান প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। গান্ধারী তার ছদ্ম প্রতিবন্ধকতা ত্যাগ করলে তার দৃষ্টির সজাগ ব্যবহার স্বামী ও পুত্রদের সঠিক পথে পরিচালনার প্রয়োজনে কাজে লাগতে পারতো। তবে এই নাটকে গান্ধারী তার স্বামীকে মানবধর্ম ও রাজধর্ম সম্পর্কে সচেতন করে দিয়েছে। তার পরামর্শ 'ত্যাগ করো এইবার'।[২৫] কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের বক্তব্য হলো, 'আমি পিতা'।[২৬] পুত্র অধর্মের পথে চলেছে ঈশ্বর তাকে শাস্তি দেবে। গান্ধারী বারবার রাজধর্ম সম্পর্কে সচেতন করে বলেছে-

> "দণ্ডিতের সাথে
> দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে
> সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার"।[২৭]

দুরাচারী পুত্রকে শাস্তি দেওয়া তার কর্তব্য। কিন্তু স্বামীকে সঠিক পথে আনতে না পেরে সে সাধ্য মত প্রতিবাদ করেছে। একজন আদর্শবাদী স্ত্রী হিসেবে তার বিশিষ্টতা এখানেই।

গান্ধারীকে নাট্যকার নির্মাণ করেছেন ধৃতরাষ্ট্রের বিপরীতে। ধৃতরাষ্ট্র চরিত্রে পিতৃধর্ম ও রাজধর্মের মধ্যে যখন বিরোধ বেধেছে তখন রাজধর্ম পরাজিত হয়েছে। কিন্তু গান্ধারী চরিত্রে মাতৃধর্ম ও মানবধর্মের মধ্যে বিরোধে ন্যায়ধর্ম বা মানবধর্ম প্রধান হয়ে উঠেছে। একে আমরা সাহিত্যিক নির্মাণ বলতে পারি। নাট্যকার এখানে পৌরাণিক ঘটনাকে তৎকালীন সমাজবাস্তবতার প্রেক্ষিতে নতুন দৃষ্টিকোণে নির্মাণ করেছেন। আবার পুরুষতান্ত্রিক সমাজকাঠামোর মধ্যে নারীর কণ্ঠস্বর কিভাবে অবদমিত হয় গান্ধারীর প্রতিবাদ ও পরামর্শের ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে সেটাও দেখানো হয়েছে। এ প্রসঙ্গে *চিত্রাঙ্গদা* নাটকটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। চিত্রাঙ্গদা চরিত্রের মধ্যে তিনি নারীর সচেতন রূপটি দেখিয়েছেন। "এই কাহিনির ওপর ভিত্তি করে লেখা চিত্রাঙ্গদা কাব্যনাট্যে রবীন্দ্রনাথ দেখালেন, নারী শুধু পুরুষের নর্মসহচরী নয়, সে তার সুখদুঃখের অংশভাগিনী, সর্বকর্মের সঙ্গেই যুক্ত।"[২৮]

ফাল্গুনী (১৯১৬ খ্রীঃ): রবীন্দ্রনাথের নাট্যসাহিত্যের মধ্যে তাঁর রূপক-সাংকেতিক নাটকগুলির স্থান স্বতন্ত্র। এই নাটকগুলির সাথে কবিধর্মের একটা সুগভীর সম্পর্ক নাটকগুলিকে অন্য মাত্রা দান করেছে। প্রতীকধর্মীতা তাঁর কবিস্বভাবের বৈশিষ্ট্য যা নাটকগুলিকে সমৃদ্ধ করেছে। এ প্রসঙ্গে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "সাংকেতিকতা রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। ধর্মসাধনা থেকে শুরু করে সাহিত্যসাধনা পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারতীয় মন সাংকেতিকতার দ্বারা পরিচালিত হয়।"[২৯] রূপক-সাংকেতিক নাটকগুলির মধ্যে দিয়ে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা নিজস্ব জীবনদর্শন বা তত্ত্বচিন্তা প্রকাশিত হয়েছে। এই শ্রেণীর নাটকগুলির মধ্যে *রাজা* (১৯১০ খ্রীঃ), *ডাকঘর* (১৯১২ খ্রীঃ), *রক্তকরবী* (১৯১৬ খ্রীঃ) *এবং মুক্তধারা* (১৯২৫ খ্রীঃ) উল্লেখযোগ্য। আমরা 'ফাল্গুনী' নাটকে দৃষ্টিহীনতার প্রসঙ্গটি পর্যালোচনা করে দেখব। ফাল্গুনী নাটক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন- "ঋতুনাট্যের বৎসরে বৎসরে শীতবুড়োটার ছদ্মবেশ খসিয়ে তার

বসন্তরূপ প্রকাশ করা হয়, দেখি পুরাতনটাই নূতন"।[৩০] নাটকটি প্রকাশিত হয় ১৯১৬ সালে। এটি একটি তত্ত্বনাটক। একই বছর তাঁর *বলাকা* (১৯১৬ খ্রীঃ) কাব্যটি প্রকাশিত হয় যেখানে যৌবনের জয়গান ঘোষিত হয়েছে। '*ফাল্গুনী* নাটকে নাট্যকার যৌবন ও বসন্ত উৎসবকে মিলিয়ে দিয়েছেন। প্রাচীনের মধ্যেই তিনি চিরনতুনের সন্ধান করেছেন। আমাদের আলোচ্য চরিত্র হল অন্ধ বাউল।

এই নাটকে মনে হয় অন্ধ ও বাউল দুটি বিপরীত সত্তা। সাধারণত অন্ধ বলতে বোঝানো হয় দৃষ্টিহীনতা। এই কথাটির মধ্যে না দেখা, বিচারবুদ্ধিহীনতা ও অজ্ঞানতার ব্যঞ্জনা লুকিয়ে রয়েছে। কিন্তু উক্ত নাটকে বাউলকে লোকে অন্ধ বলে বিশ্বাস করতে চায় না। নাট্যকার দেখিয়েছেন তার দৃষ্টি তথাকথিত দৃষ্টিমান অপেক্ষা প্রখর। কেউ যা দেখতে পাই না সে তাই দেখে। তাই সে যুবকদলকে পথ দেখাতে সম্মত হয় কিন্তু তারা তাকে বিশ্বাস করে না। চন্দ্রহাসকে সেই সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত তার দৃষ্টিকে সবাই বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়। শেষে তার নির্দেশিত পথে যখন জরা বৃদ্ধকে গুহার ভেতর থেকে বের করে আনা হলো, দেখা গেল যাকে তারা জরা বৃদ্ধ মনে করেছিল সে আসলে যৌবনের মূর্ত প্রতীক। "বাইরে থেকে, দূরে থেকে দেখলে তাকে জরা বৃদ্ধ বলে মনে হয়, আসলে সে যৌবনেরই প্রতীক। এই তত্ত্বকথাটি 'ফাল্গুনী'র মূল ফলশ্রুতি।"[৩১]

নাটকটি যেহেতু তত্ত্বপ্রধান তাই এখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশেষ ধরনের দর্শনচিন্তা গুরুত্ব পেয়েছে। সমাজবাস্তবতার প্রসঙ্গ এখানে গৌণ। তবে তাঁর দার্শনিক চিন্তার মধ্যে কোনো নেতিবাচকতা প্রাধান্য পায়নি।

৩.৮ বিজন ভট্টাচার্য (১৯১৭-১৯৭২ খ্রীঃ)

বিজন ভট্টাচার্যের জীবনের সময় কাল ১৯১৭-১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ। বাংলা গণনাট্য আন্দোলনের পথিকৃৎ বিজন ভট্টাচার্য ছিলেন একাধারে অভিনেতা, নাট্যকার এবং একজন সঙ্গীতবিদ্।

সাহিত্যিক চেতনার দিক থেকে তিনি ছিলেন মার্কসবাদী ধারার নাট্যকার। তিনি লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে অংশ নেন এবং ছাত্রজীবনে সক্রিয়ভাবে ছাত্র আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন। ১৯৪২ সালে তিনি মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পীসংঘ, প্রগতি লেখক সংঘের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত হন, আই পি টি এ-র সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। পরবর্তী কালে গণনাট্য ছেড়ে দিলেও মার্কসবাদী দর্শনে তাঁর আস্থা ছিল। যুদ্ধ, মন্বন্তর, কালোবাজারী ইত্যাদি সমকালীন সমস্যাকে তিনি তাঁর নাটকে রূপায়িত করেন। তার *আগুন* (১৯৪৩ খ্রীঃ) নাটকের অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে গণনাট্যসংঘের পথ চলা শুরু হয়। তাঁর রচিত অন্যান্য নাটকগুলির মধ্যে *দেবীগর্জন* (১৯৬৯ খ্রীঃ), *জবানবন্দী* (১৯৪৩ খ্রীঃ), *নবান্ন* (১৯৪৪ খ্রীঃ) *এবং গোত্রান্তর* (১৯৫৭ খ্রীঃ) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। আমাদের আলোচ্য 'মরাচাঁদ' নাটকটি লেখেন ১৯৪৬ সালে। এই নাটকের প্রধান চরিত্র পবন বৈরাগী জন্মগতভাবে দৃষ্টিহীন। সাংস্কৃতিক উৎপাদন ব্যবস্থায় তার শিল্পী জীবনের সংকট এই নাটকে রূপায়িত।

মরাচাঁদ (১৯৪৬ খ্রীঃ): পবন বৈরাগী স্বভাবে একজন কবিয়াল। গানই তার জীবনের বেঁচে থাকার মূল প্রেরণা। স্ত্রী রাধার আগমনে তার জীবনে নতুন সংকট তৈরি হয়। সে রাধাকে নিয়ে সুখী ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু দুজন মানুষের অন্নসংস্থান করার অবস্থা তার নেই। স্ত্রী রাধা সুন্দরী। এখানে তার দেহসৌন্দর্য হয়ে উঠেছে বেঁচে থাকার হাতিয়ার। বিষয়টি পবন কিছুতে মেনে নিতে পারে না। সে ভালোভাবে বাঁচতে চায় কিন্তু প্রচলিত সমাজকাঠামো তাকে ভালোভাবে বাঁচতে দেয় না। তার দাম্পত্যজীবনে সংকট ঘনিয়ে ওঠে। স্ত্রীকে সে মেনে নিতে পারে না। শেষ পর্যন্ত রাধা তাকে ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। কবিয়ালের গান গাওয়ার জৌলুস চলে যায়। কিন্তু গ্রামের মাথা শচীনবাবু বলে তাকে গ্রামের সভায় গান গাইতে হবে। এই নাটকে পবনের বেঁচে থাকার মূল অবলম্বন গান। স্বাধীনতার পূর্ব

থেকে দৃষ্টিহীনরা ধীরে-ধীরে আর্থসামাজিক কর্মকাণ্ডে প্রবেশ করেছে। এই নাটকে তার কোনো প্রতিফলন নেই। অবশ্য গ্রামীণ পটভূমিতে পবনের চরিত্রায়ন বাস্তবধর্মী হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, দৃষ্টিহীনতা ও দাম্পত্যসমস্যা এখানে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। দৃষ্টিহীনতার কারণে সে তার স্ত্রীকে বেশী মাত্রায় সন্দেহ করে। বাস্তবে বিষয়টি নেতিবাচক। পূর্ববর্তী অনেকগুলি রচনায় আমরা একই ধরনের প্রবণতা লক্ষ্য করেছি। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *রজনী* উপন্যাসে অলৌকিকতার সাহায্যে প্রতিবন্ধকতাকে লীন করে দেওয়া হয়েছে। অনুরূপা দেবীর *মহানিশা* উপন্যাসে দাম্পত্য সমস্যার কারণে ধীরার জীবনের মর্মান্তিক পরিণতি ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দৃষ্টিদান' গল্পের কুমু শেষ পর্যন্ত তার দাম্পত্য সমস্যাকে অতিক্রম করেছে নিজের শক্তিতে।

তৃতীয়ত, সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থায় শিল্পী জীবনের সংকটকে নাট্যকার দেখিয়েছেন। শিল্পী জীবনের যন্ত্রণা ও উত্তরণের সম্ভাবনা এই নাটকে গুরুত্ব পেয়েছে। পবনের শিল্পীসত্তার কাছে প্রতিবন্ধী সত্তা শেষ পর্যন্ত গৌণ হয়ে যায়। তবে দারিদ্র্য ও দৃষ্টিহীনতা তার জীবনের সংকটকে ত্বরান্বিত করেছে।

৩.৯ উপসংহার

আধুনিক বাংলা কাব্য নাটকের ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে যে, দৃষ্টিহীনতার প্রসঙ্গ এসেছে এমন সৃষ্টির সংখ্যা হাতে গোণা। তবু সামগ্রিকভাবে সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করার ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিবর্তনটি বিশ্লেষণ করা জরুরি। তাই আমরা যেখানে যেখানে দৃষ্টিহীনতার প্রসঙ্গ এসেছে সেগুলিকে প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত করেছি এবং পাঠ বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে সামাজিক ও সাহিত্যিক নির্মাণকে বোঝার চেষ্টা করেছি। কাব্য ও নাটক বিশ্লেষণ করে আমরা কতগুলি নির্দিষ্ট প্রবণতা বা লক্ষণকে চিহ্নিত করেছি। সেগুলি হল -

প্রথমত, সমাজে দৃষ্টিহীনদের সম্পর্কে নানান মিথ বা নেতিবাচক ধারণা প্রচলিত আছে যেমন - তারা সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শী এবং সমাজে দয়া বা দানের পাত্র, তারা সামাজিকভাবে অক্ষম ইত্যাদি। বাংলা কাব্য ও নাটকে আমরা তার প্রতিফলন লক্ষ্য করেছি।

দ্বিতীয়ত, সামাজিকভাবে তারা যে বিচ্ছিন্ন বা প্রান্তেবাসী সাহিত্যিক নিদর্শনের মাধ্যমে সেটাই দেখানো হয়েছে। আমরা একে সমাজবাস্তবতা নির্মাণের ক্ষেত্রে কবিদের সমাজমনস্কতা বলতে পারি কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা সামাজিক নির্মাণকে অতিক্রম করে বৃহত্তর সাহিত্যিক নির্মাণের দিকে অগ্রসর হয়নি।

তৃতীয়ত, স্বাধীনতার কিছু কাল পূর্ব থেকেই দৃষ্টিহীনরা আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে প্রবেশ করেছে। বাংলা কাব্য ও নাটকে তার কোনো প্রতিফলন নেই। কবি ও নাট্যকারগণ উন্নয়নশীল নাগরিক প্রেক্ষাপট অপেক্ষা পিছিয়ে থাকা গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে দৃষ্টিহীনদের অবস্থা চিত্রণে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন যা তাদের সমাজমনস্কতাকে চিহ্নিত করে কিন্তু কোনো সম্ভাবনা বা সাহিত্যিক নির্মাণের বিষয়টি গুরুত্ব পায়নি।

চতুর্থত, কোথাও কোথাও তত্ত্ব বা প্রতীকের আড়ালে দৃষ্টিহীনতাকে উজ্বলভাবে আঁকা হয়েছে। সেখানে সাহিত্যিক নির্মাণের বিষয়টি লক্ষ্য করা গেলেও বাস্তব সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে তার বড়ো একটা সম্পর্ক নেই। আমরা পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে দৃষ্টিহীন চরিত্র নির্মাণ প্রসঙ্গে অন্যান্য সাহিত্যসংরূপের ক্ষেত্রে কী ঘটেছে তা আলোচনা করে দেখব।

তথ্যসূত্র

১। চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল। *সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ।* কলকাতা: রত্নাবলী, ১৯৯৫। পৃ. ১

২। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *সাহিত্যের বিচারক রবীন্দ্র রচনাবলী,* কলকাতা: বিশ্বভারতী ১৪০১ বঙ্গাব্দ। পৃ. ৩৫২।

৩। বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার। *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত,* কলকাতা: মডার্ণ বুক এজেন্সী। ১৯৬৬। পৃ. ৪১৩।

৪। পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২২।

৫। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *সহজ পাঠ দ্বিতীয় ভাগ, রবীন্দ্র রচনাবলী* (পঞ্চদশ খণ্ড)। কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ।পৃ. ৪৫৮।

৬। পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬৭।

৭। পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬৭।

৮। পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬৮।

৯। *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত,* পূর্বোক্ত পৃ. ৪৬৬।

১০। বাগচী, যতীন্দ্রমোহন। *যতীন্দ্রমোহন বাগচীর শ্রেষ্ঠ কবিতা।* কলকাতা: ভারবি, ২০০১। পৃ. ৬৭

১১। পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭।

১২। পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭।

১৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ৮২৫।

১৪। ভট্টাচার্য, ফাল্গুনী। *'সাহিত্য ও সিনেমায় প্রতিবন্ধী*, পরম্পরা: কলকাতা। ২০১১। পৃ. ১২৯।

১৫। *যতীন্দ্রমোহন বাগচীর শ্রেষ্ঠ কবিতা,* পূর্বোক্ত পৃ. ৬৮।

১৬। পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮।

১৭। পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯।

১৮। *'সাহিত্য ও সিনেমায় প্রতিবন্ধী,* পূর্বোক্ত পৃ. ১২৯।

১৯। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ।*সঞ্চয়িতা।* কলকাতা: বিশ্বভারতী ,পৌষ ১৩৩৮। পৃ. ৮২৫।

২০। *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত,* পূর্বোক্ত পৃ. ৪২৯।

২১। পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৯।

২২। *সঞ্চয়িতা,* পূর্বোক্ত পৃ. ৩৭৬।

২৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৭।

২৪। পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮১।

২৫। পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮৩।

২৬। পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮৪।

২৭। পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮৯।

২৮। *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত,* পূর্বোক্ত পৃ. ৪৩০।

২৯। পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৪।

৩০। মণ্ডল, স্নিগ্ধা, সেন, মল্লিক সম্পাদিত। *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস: আধুনিক যুগ*। কলকাতা: গৌরী পাবলিশিং, পৃ. ১১০।

৩১। *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত,* পূর্বোক্ত পৃ. ৪৩৭।

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলা উপন্যাসে দৃষ্টিহীনদের চর্চা ও অবস্থান

৪.১ সূচনা

আমাদের মূল আলোচ্য আধুনিক বাংলা সাহিত্যে দৃষ্টিহীনদের চর্চা ও অবস্থান। কথাসাহিত্যের ক্রম-অনুসারে বাংলা উপন্যাসের জন্ম ছোটোগল্পের জন্মের পূর্ববর্তী ঘটনা। বাংলা কথাসাহিত্যের বিপুল ভাণ্ডার মন্থন করে আমরা দৃষ্টিহীন চরিত্র আছে এমন এগারোটি উপন্যাসের সন্ধান পেয়েছি। বিগত দু'শো বছরে দৃষ্টিহীনদের জন্য আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বেশ কিছু সদর্থক পদক্ষেপ গৃহীত ও স্বীকৃত হয়েছে। ফলে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে তাদের অবস্থানের ছবিটা কিছুটা বদলেছে। উক্ত উপন্যাসগুলিতে সেই বদলের ছবি কতখানি ধরা পড়েছে সে বিষয়টি এখানে পর্যালোচনা করা হবে। সেই বদলের নিরিখে তাদের সামাজিক ও সাহিত্যিক অবস্থানটি নির্ধারণের চেষ্টা করব। সেইসব চরিত্র বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করব লেখকরা কতখানি সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা মাথায় রেখে এ জাতীয় চরিত্র নির্মাণ করেছেন। সমাজে দৃষ্টিহীনতা সম্পর্কে প্রচলিত নানান মিথ এবং ভ্রান্ত ধারণার দ্বারা তারা কতখানি প্রভাবিত হয়েছেন সে বিষয়টিও আমাদের আলোচ্য। বিভিন্ন উপন্যাস থেকে প্রাপ্ত ধারণাগুলি অক্ষমতা বিদ্যাচর্চার নিরিখে বিচার করে আমরা দৃষ্টিহীনদের সার্বিক অবস্থান এবং লেখকদের সমাজমনস্কতার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট, যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্তের দিকে অগ্রসর হব। প্রসঙ্গত উপন্যাসের শিল্পগত কাঠামোর দিকেও আমরা নজর দেব। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিল্পের সীমাবদ্ধতার কথাও আমাদের মনে রাখতে হবে।

৪.২ বাংলা উপন্যাসের উদ্ভব ও বিকাশ

উপন্যাসকে বলা হয় আধুনিক যুগের মহাকাব্য।[১] মহাকাব্যের মতো বৃহৎ জীবনদৃষ্টি, পূর্ণাঙ্গ চরিত্রের নির্মাণ, প্রতিবেশ ও পটভূমি উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। ইতালীয় শব্দ নভেলা থেকে নভেল শব্দটির জন্ম হয়েছে যার বাংলা প্রতিশব্দ হলো উপন্যাস।[২] আধুনিক কালে গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের উত্থান এবং পত্র-পত্রিকার প্রচলনের পথ বেয়ে উপন্যাস সাহিত্যের জন্ম ও বিকাশ ঘটেছে। তবু বিশ্বসাহিত্যের নিরিখে উপন্যাস সাহিত্যের বয়স দু'শো বছরের কিছু বেশী। তবে বাংলা উপন্যাসের বয়স প্রায় দেড়শো বছর।

ভারতীয় সাহিত্যে আখ্যানধর্মী কাব্য, সংস্কৃত গদ্য আখ্যায়িকা, *পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশের* মতো গদ্যকাহিনির প্রচলন থাকলেও উপন্যাসের জন্ম হয়েছে পাশ্চাত্য শিক্ষার অভিঘাতে ব্রিটিশ শাসনের যুগে। অধিকাংশ সাহিত্য সমালোচক এ বিষয়ে এক মত যে, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রথম সার্থক বাংলা উপন্যাস সৃষ্টি করেছিলেন।[৩] বঙ্কিম পূর্ব যুগে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *নববাবু বিলাস* (১৮২৩ খ্রীঃ), কালীপ্রসন্ন সিংহ-এর (১৮৪০-১৮৭০ খ্রীঃ) *হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা* (১৮৬২ খ্রীঃ) এবং প্যারীচাঁদ মিত্র-এর (১৮১৪-১৮৮৩ খ্রীঃ) *আলালের ঘরের দুলাল*-এর (১৮৫৮ খ্রীঃ) মধ্যে কিছু পরিমাণ উপন্যাস লক্ষণ থাকলেও তা ছিল আসলে তৎকালীন সমাজের ব্যঙ্গ বা নক্সাচিত্র। পূর্ণাঙ্গ চরিত্রায়ন এবং বৃহৎ জীবনদৃষ্টি না থাকার কারণে তা শেষ পর্যন্ত উপন্যাস সাহিত্যের লক্ষণগুলি পূরণ করতে ব্যর্থ হয়। বঙ্কিমচন্দ্রই নানা জাতীয় উপন্যাস রচনা করে বাংলা সাহিত্যের নবাগত এই ধারাটি পুষ্ট করেন। বঙ্কিম উত্তর যুগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং ত্রয়ী বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাস সাহিত্যের ধারাটিকে আপন প্রতিভার স্পর্শে বহুমুখী ধারায়

পরিপূর্ণ করে তুলেছেন। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত নব নব ধারায় বাংলা উপন্যাস সহৃদয় পাঠকের মনোজগৎকে আবিষ্ট করে রেখেছে।

বিষয়বস্তুর দিক থেকে বাংলা উপন্যাসকে নানা ভাগে ভাগ করা হয়েছে যথা ১। ইতিহাস ও রোমান্সধর্মী উপন্যাস, ২। ঐতিহাসিক উপন্যাস, ৩। সমাজ ও গার্হস্থধর্মী উপন্যাস, ৪। মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস ইত্যাদি। আবার শৈলীগত দিক থেকেও অনেকে বাংলা উপন্যাসের বিভাজন করেছেন, যথা - কাব্য-উপন্যাস, আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনিমূলক উপন্যাস ইত্যাদি। বর্তমান কালেও বিষয় ও শৈলীর নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়ে চলেছে। তবে আমরা সংক্ষেপে উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যগুলিকে এইভাবে সূত্রবদ্ধ করতে পারি।

১। আখ্যানভাগ: সাধারণত উপন্যাসে একটি নিটোল কাহিনি পরিবেশনের চেষ্টা থাকে।

২। চরিত্রায়ন: নাটকের মতো উপন্যাসের চরিত্র চিত্রণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সংলাপ ও বর্ণনার সাহায্যে ঔপন্যাসিক এক বা একাধিক চরিত্র সৃষ্টিতে মনোযোগী হন। তবে সাধারণত উপন্যাসে বহু চরিত্রের ভিড় এবং তারা তাদের বিশেষ আদর্শ ও ব্যক্তিত্ব নিয়ে হয়ে ওঠে ভালো-মন্দে মেশানো বাস্তব সমাজ পরিবেশের প্রতিনিধি।

৩। পটভূমি ও প্রতিবেশ: পটভূমি ও প্রতিবেশ উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। দেশকাল ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে একটি সুনির্দিষ্ট সময়সীমার সাপেক্ষে ঔপন্যাসিক তার চরিত্রগুলিকে পাঠকের দরবারে হাজির করেন।

৪। দৃষ্টিভঙ্গি: ছোটোগল্পের মতো খণ্ডচিত্র নয়, ঔপন্যাসিকের থাকে একটি নিজস্ব জীবনবোধ ও পূর্ণাঙ্গ জীবনদৃষ্টি। যদিও তার এই দৃষ্টিভঙ্গি কখনো দেশকাল ও সমাজনিরপেক্ষ হতে পারে না তবু কখনো কখনো শিল্পীসত্তা সমস্ত কিছু কে ছাপিয়ে অনন্য হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গত

মনে রাখা প্রয়োজন যারা শিল্পের জন্যই শিল্প এই মতবাদের সমর্থক বাস্তবে তাদের শিল্পকর্মও কোনো আকাশজাত বায়বীয় পদার্থ নয়।

৪.৩ বাংলা উপন্যাসে দৃষ্টিহীন চরিত্র

উপন্যাস সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ আধুনিক যুগের ঘটনা। প্রাচীন ও মধ্যযুগের পুরাণ ও মহাকাব্যে আমরা যেসব চরিত্রের দেখা পাই তারা বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করে। সেখানে ধর্মের মোড়কে মানুষের কথা বলা হয়েছে। আধুনিক যুগে প্রথম সাহিত্যে সরাসরি মানুষের কথা এসেছে। যদিও তারা বিশেষ দেশ কাল ও সমাজের প্রতিনিধি তবু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। সবচেয়ে বড়ো কথা হলো ধর্মীয় বাতাবরণ থেকে মুক্ত হয়ে শিল্প স্বাধীন প্রকাশের পথ পেয়েছে।

আমরা পুরাণ ও মহাকাব্যের যুগে যেসব শারীরিক প্রতিবন্ধকতাযুক্ত চরিত্রের দেখা পেয়েছি তারা কখন অঙ্গবৈকল্যের কারণে সামাজিক বৈষম্যের শিকার, কখনো আবার তাদের অঙ্গবৈকল্যকে কবিরা বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছেন। কোথাও শারীরিক অঙ্গহানি হয়ে উঠেছে প্রতীকী । *মহাভারতের* ধৃতরাষ্ট্র, *রামায়ণ* এর অন্ধক মুনি, *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যের আয়ান ঘোষ, *লোরচন্দ্রানী* কাব্যে চন্দ্রানীর স্বামী তার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

আধুনিক যুগে উপন্যাসে সূচনালগ্নে আমরা প্রথম বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *রজনী* উপন্যাসে এ জাতীয় চরিত্রের দেখা পাই। উক্ত উপন্যাসের রজনী জন্মগতভাবে দৃষ্টিহীনা। সে সময় থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত বহু খ্যাত ও অখ্যাতনামা উপন্যাসে আমরা শারীরিক ও মানসিক সমস্যাগ্রস্ত নানান চরিত্রের দেখা পেয়েছি। প্রতিবন্ধকতা কখনো হয়ে উঠেছে শোষণ ও বঞ্চনার মাধ্যম, কখনো দয়া ও সহানুভূতির বিষয়, কখনো আবার ব্যক্তি ও সমাজের নানান অবস্থাকে বোঝানোর জন্য লেখকরা প্রতিবন্ধকতাকে ব্যবহার করেছেন

প্রতীকী মাধ্যম হিসেবে। আমরা বাংলা সাহিত্যের বিপুল ভাণ্ডার থেকে দৃষ্টিহীন চরিত্র আছে এমন এগারোটি উপন্যাস অনুসন্ধান করেছি। তার একটি তালিকা নিচে দেওয়া হল।

দৃষ্টিহীন চরিত্র আছে এমন উপন্যাসের তালিকা

ক্রম	উপন্যাস	ঔপন্যাসিক	প্রকাশকাল	চরিত্র
১	রজনী	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৮৭৭	রজনী
২	মহানিশা	অনুরূপা দেবী	১৯১৯	ধীরা
৩	তৃতীয় নয়ন	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	১৯৩৩	মিহির
৪	ভুবনপুরের হাট	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৬৪	নব ঠাকুর
৫	কান্না	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৬৫	জন
৬	শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন	বিমল মিত্র	১৯৭১	বকুল
৭	পূর্ণ অপূর্ণ	বিমল কর	১৯৭৯	নির্মলা
৮	নীলিমায় নীল	নারায়ণ সান্যাল	১৯৮৩	আনন্দ
৯	আলোক অভিসারে	নন্তু সরকার	১৯৯৪	কমলা
১০	লালুভুলু	নীহাররঞ্জন গুপ্ত	২০১২	লালু ও ভুলু
১১	অন্ধ জন্মান্ধদের কথা অথবা একটি প্রেমের উপাখ্যান	সমীর রক্ষিত	২০১৬	পবন

৪.৪ অক্ষমতাবিদ্যাচর্চার মূল কথা

অক্ষমতাবিদ্যাচর্চা আধুনিক কালে মানবীবিদ্যার মতো এমন একটি বিষয় যার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত হয়ে আছে সমাজতত্ব, মানবতাবাদ ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী। এর মূল কথাগুলি হলো, প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিরা সামাজিকভাবে একটি অবহেলিত শ্রেণী। এরা বহুক্ষেত্রে সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন। সমাজ নির্ধারিত স্বাভাবিকতার নিরিখে তথাকথিত সক্ষম

ও স্বাভাবিক ব্যক্তিদের দ্বারা এরা নানাভাবে শোষিত। প্রতিবন্ধকতাকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের দিক থেকে দেখার যে রেওয়াজ সমাজে বহুকাল যাবৎ প্রচলিত আছে অক্ষমতাবিদ্যাচর্চা তাকে নাকচ করে। প্রকৃত পক্ষে প্রতিবন্ধকতা বিশেষ আর্থসামাজিক প্রেক্ষিতে সৃষ্ট একটি সাংস্কৃতিক সমস্যা। তাই এ জাতীয় সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে আমাদের মানবিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারস্থ হতে হবে। অক্ষমতাবিদ্যাচর্চার মূল ধারণাগুলি স্মরণে রেখে আমরা আলোচ্য উপন্যাসগুলি বিচার-বিশ্লেষণ করব এবং লেখকদের সমাজমনস্কতার বিষয়টি অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হবে।

৪.৫ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪ খ্রীঃ)

সাহিত্যের প্রথম যুগে সার্থক উপন্যাস সৃষ্টির গৌরব যাঁর প্রাপ্য তিনি সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এপ্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি প্রণীধানযোগ্য- "বঙ্কিমের হাতে বাংলা উপন্যাস পূর্ণ যৌবনের শক্তি ও সৌন্দর্য লাভ করিয়াছে।"[৪] ১৮৩৮-৯৪ খ্রীষ্টাব্দ তাঁর জীবনের সময়কাল। এই স্বল্পায়ু জীবনে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি করতে-করতে তিনি ১৪ টি বাংলা উপন্যাস লিখেছিলেন। অধিকাংশ উপন্যাসের কাহিনি নির্মাণে ইতিহাস ও রোমান্সের আশ্রয় নিয়েছেন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিকে প্রধান দুভাগে ভাগ করেছেন। "বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি স্থূলত দুইভাগে বিভক্ত- এক শ্রেণী সম্পূর্ণ বাস্তব, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের বর্ণনা ও ব্যাখ্যাই তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় শ্রেণী ঐতিহাসিক বা অসাধারণ ঘটনাবলীর উপরে প্রতিষ্ঠিত।"[৫] *রজনী* তাঁর ব্যতিক্রমী সৃষ্টি। ১৮৭৭ সালে উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসটি রচনার পূর্বে ১৮৭৫ সালে *চন্দ্রশেখর* রচনা করেন। ১৮৭৮ সালে বাংলা সাহিত্যের প্রথম মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস *কৃষ্ণকান্তের উইল* প্রকাশিত হয়। *রজনী* ও *কৃষ্ণকান্তের উইল* এ বঙ্কিমচন্দ্র সমাজবাস্তবতার ছবি এঁকেছেন। প্রসঙ্গত বলে রাখা

প্রয়োজন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যেমন একাধারে উপন্যাস শিল্পের সার্থক রূপকার অন্যদিকে তিনি নব্য হিন্দু সমাজ ও পৌরাণিক সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। তাঁর গদ্য প্রবন্ধগুলি এর সাক্ষ্য বহন করে। এই প্রতিভাবান শিল্পী তাঁর উপন্যাসে ব্যক্তির প্রবৃত্তি ও সমাজকে রূপায়িত করেছেন। আদর্শগত দিক থেকে তিনি নিজেও একই সাথে রক্ষণশীল এবং প্রগতিশীল ভাবনার যথার্থ প্রচারক, তিনিই প্রথম মার্কসবাদের স্বপক্ষে তাঁর *সাম্য (১৮৭৯ খ্রীঃ)* গ্রন্থটি রচনা করেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ প্রচলনকে সমর্থন করতে পারেননি। তার সাহিত্য সৃষ্টিতে এই রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল মনোভাবের টানাপোড়েন ধরা পড়েছে। বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব সম্পর্কে বলতে গিয়ে কবি ও সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার লিখেছেন, "লগ্নটি বিশেষ করিয়া সেই কালের একটা সাহিত্যিক-সন্ধিক্ষণ, ভাব ও অভাবের গোধূলিলগ্ন, ঠিক সেই লগ্নটিতে সন্ধ্যাকাশে বঙ্কিমচন্দ্রের উদয় হইয়াছিল।"[৬]

রজনী (১৮৭৭ খ্রীঃ): আমরা রজনী চরিত্রের বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে তার সামাজিক ও সাহিত্যিক অবস্থানটি নির্ধারণের চেষ্টা করব। বঙ্কিমের অন্যান্য উপন্যাসের তুলনায় *রজনীর* আলোচনা অল্পই হয়েছে এবং যেটুকু হয়েছে সেখানে বঙ্কিমচন্দ্রের তত্ত্বচিন্তা এবং উপন্যাসকাঠামোকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তবে সমাজতাত্ত্বিক দিক থেকে রজনীর প্রতিবন্ধকতার প্রসঙ্গটি অন্যতর আলোচনার দাবি রাখে।

উপন্যাস সৃষ্টির প্রথম যুগে '*রজনী*' উপন্যাসটি নানান কারণে অভিনবত্বের দাবিদার। এই উপন্যাসে প্রথম দৃষ্টিপ্রতিস্পর্ধীদের কথা উঠে এসেছে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ফাল্গুনী ভট্টাচার্য বলেন, "বঙ্কিমচন্দ্র এক অন্ধ রমণীর জীবনকথা বিবৃত করার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে দৃষ্টি-প্রতিবন্ধী মানুষের স্থান করে দিয়েছেন।"[৭] বাংলা কথাসাহিত্যে দৃষ্টিহীনদের চর্চা ও অবস্থানের বিষয়টি স্মরণে রেখে বলা যায় প্রথম প্রতিস্পর্ধীকেন্দ্রিক গল্পভাবনার

নিদর্শন হিসেবে *রজনীর* আলোচনা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। আরও একটি কারণে উপন্যাসটির অভিনবত্ব স্বীকার করতে হয় তা হলো উপন্যাস সৃষ্টির প্রথম পর্বে গঠন ও কাহিনি বিন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসে মৌলিকতা দেখিয়েছেন, এখানে প্রত্যক্ষ কোনো কথক নেই, চরিত্ররা নিজেরা নিজেদের কথা বলেছে। "*ইন্দিরা ও রজনী*তে বঙ্কিম উপন্যাস-ক্ষেত্রে একটি নূতন প্রণালী প্রবর্তন করিয়াছেন, আখ্যায়িকাটি নিজে না বলিয়া উপন্যাসের চরিত্রগুলিকেই বক্তার আসনে বসাইয়াছেন।" রজনীর বয়ানে তার জীবন কাহিনি তাই চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে। "তোমাদের সুখ দুঃখে আমার সুখ দুঃখ পরিমিত হইতে পারে না। তোমরা আর আমি ভিন্ন প্রকৃতির। আমার সুখে তোমরা সুখী হইতে পারিবে না- আমার দুঃখ তোমরা বুঝিবে না- আমি একটি ক্ষুদ্র যূথীকার গন্ধে সুখী হইব আর ষোলো কলা শশী সহস্র নক্ষত্রমণ্ডল মধ্যস্থ হইয়া বিকশিত হইলেও আমি সুখী হইব না। আমার উপাখ্যান কী তোমরা মন দিয়া শুনিবে? আমি জন্মান্ধ। কি প্রকারে বুঝিবে! তোমাদের জীবন দৃষ্টিময়- আমার জীবন অন্ধকার- দুঃখ এই, আমি ইহা অন্ধকার বলিয়া জানি না। আমার এ রুদ্ধ নয়নে আলো! না জানি তোমাদের আলো কেমন!"[৮] রজনীর আত্মবিবৃতির মধ্যে যেমন তার জীবন-যন্ত্রণার ছবি ধরা পড়েছে তেমনই উপন্যাসের শুরুতে দৃষ্টিমান এবং দৃষ্টিহীন জগতের মধ্যবর্তী সীমারেখাটিও প্রকাশিত হয়েছে যাকে আমরা বলতে পারি প্রতিবন্ধী ও অপ্রতিবন্ধী জগতের মধ্যবর্তী সীমারেখা। প্রথম থেকেই লেখক আমাদের রজনীর জগত সম্পর্কে সচেতন করে দিয়েছেন। যদিও লেখক উপন্যাসের শেষে সেই সীমারেখাকে অতিক্রম করেছেন রোমান্স বা অলৌকিকতার সাহায্য নিয়ে।

উপন্যাসের প্রধান চরিত্রের মধ্যে রজনী, অমরনাথ, লবঙ্গলতা এবং শচীন্দ্রের নাম উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে রামসদয় মিত্র, মনোহর দাস এবং হরেকৃষ্ণ দাসের

নাম করা যায়। এই সব চরিত্রের ভীড়ে রজনীর জীবন কাহিনি হারিয়ে যায়নি। নানান ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে রজনীর জীবনের উত্থান-পতন এই উপন্যাসের মূল উপজীব্য।

উপন্যাসের প্রধান চরিত্র রজনী, সে জন্মগতভাবে দৃষ্টিহীন এবং দরিদ্র ফুল বিক্রেতার পালিতা কন্যা। সে তার দৃষ্টিহীনতা নিয়ে সামাজিক এবং পারিবারিক ক্ষেত্রে যে লাঞ্ছনা ও বঞ্চনা ভোগ করে এবং শেষে তার সামাজিক অবস্থানের পরিবর্তনের মাধ্যমে শচীন্দ্রের সাথে বিবাহ- বন্ধনে আবদ্ধ হয়, ক্রমান্বয়ে লেখক রজনীর পরিণতির মধ্যে দিয়ে উপন্যাসটি সমাপ্ত করেছেন। তার জীবন বৃত্তান্ত উপন্যাসের উপজীব্য। তাই সে দিক থেকে উপন্যাসটির নাম *রজনী* রাখা হয়েছে। অন্য অর্থে রজনী শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো রাত্রি। রজনীর জীবনে বাইরের আলো প্রবেশ করতে পারে না, সেদিক থেকেও উপন্যাসটির নামকরণ ব্যঞ্জনাধর্মী হয়েছে।

এই উপন্যাসে রজনীর মনোজগৎ সম্পর্কে আলাদা করে আলোচনার অবকাশ আছে। রজনীর অন্তর জগতে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ্যের প্রভাব নেই। তার মনোজগৎ শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ এই চারটি ইন্দ্রীয়-উপাদান দ্বারা নির্মিত। তাই সে অনায়াসে 'বীণার ধ্বনিবৎ' স্পর্শের কথা বলে। শচীন্দ্রের স্পর্শের সঙ্গে ফুলের স্পর্শের তুলনা করে। তার সাংসারিক জ্ঞান বা দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা সম্পর্কে শ্রীকুমারবাবু বলেন, "তাহার কথাবার্তায় যেরূপ গভীর সংসারাভিজ্ঞতার নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহাও তাহার মত সমাজসংস্রবরহিত, সরল, অন্ধ যুবতীর পক্ষে অনধিগম্য বলিয়াই মনে হয়।"ঔপন্যাসিক তার প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার নিখুঁত বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর এই বিবরণ যেমন গভীর জীবনদৃষ্টির পরিচায়ক তেমনই আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার দ্বারা সমর্থিত। সে গৃহকর্মে নিপুণা, নিখুঁতভাবে ফুলের মালা গাঁথে, লাঠি হাতে কলকাতার পথ-ঘাট একাই অতিক্রম করতে পারে। এক্ষেত্রে দৃষ্টিহীনতা কোনো

প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে নি। কিন্তু সে দেখতে সুশ্রী হওয়ার সত্ত্বেও সমাজে পাত্রপক্ষ এবং অন্যান্য মানুষের কাছে যোগ্য সম্মান ও মর্যাদা অর্জন করতে পারেনি।

প্রকৃতপক্ষে তার ব্যক্তিগত প্রেম এবং বিবাহের উদ্যোগকে ঘিরে জীবনে জটিলতা তৈরি হয়। "অন্ধের বিবাহে বড় গোল। কানা বলিয়া আমার বিবাহ হইল না।"[৯] সে দরিদ্র পরিবারের পালিতা কন্যা, আবার দৃষ্টিহীন। তাই বিয়ের সময় পেরিয়ে গেলেও যোগ্য পাত্রের সন্ধান পাওয়া যায় না। জমিদার বাড়ির শচীন্দ্র তার ছোটোমাকে দিয়ে রজনীর বিবাহের ব্যবস্থা করে। কিন্তু রজনী এই বিয়েতে রাজি হয় না। সে এই বিয়ের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য এক অপরিচিত যুবক হীরালালের সঙ্গে ঘর ছাড়ে। যে হীরালালকে সে প্রাথমিকভাবে বিশ্বাস করেছিল মাঝপথে সে তার দ্বারা আক্রান্ত এবং বিপদসঙ্কুলে স্থানে পরিত্যক্ত হয় কারণ সে হীরালালের বিবাহ প্রস্তাবে রাজি হয় না। রজনী অন্য কোনো পাত্রকে বিয়ে করতে রাজি ছিল না কারণ সে মনে মনে শচীন্দ্রকে কামনা করে। তার সামাজিক অবস্থানের কারণে রজনী তার প্রেমের কথা প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত হয়। হয়তো তার এই বেদনা সকলের অজ্ঞাতেই থেকে যেত তার সামাজিক অবস্থানের পরিবর্তন না ঘটলে।

শচীন্দ্র যে জমিদারী ভোগ করত তা আসলে রজনীর প্রাপ্য। ঘটনাচক্রে একদিন রজনী আইনের সহায়তায় সে সম্পত্তিতে ভোগদখলের অধিকার পায়। কিন্তু এই সময় হৃত সম্পত্তি রজনীর হাতে যাওয়ার আগে রজনীর সঙ্গে শচীন্দ্রের শুভ বিবাহ সুসম্পন্ন হয়। বঙ্কিমচন্দ্র তার স্বভাবসিদ্ধ নিয়মে উপন্যাসের শেষে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন এক সন্ন্যাসীর সহায়তায় রজনীর দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। এপ্রসঙ্গে শ্রীকুমারবাবু বলেন, "তবে গ্রন্থশেষে রজনীর দৃষ্টিশক্তি- লাভের কাহিনিটি রোমান্সের অভাবনীয় বৈচিত্র্যের নিকটে ঔপন্যাসিক বঙ্কিমের সম্পূর্ণ ও অনুচিত আত্মসমর্পণ ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।"[১০]

সচেতন পাত্রপক্ষ হিসেবে তিনি দৃষ্টিহীন কন্যার বিবাহ দিতে পারেননি। তৎকালীন সামাজিক অবস্থাকে এর জন্য দায়ি না বলে পারা যায় না।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক কালে সমাজে দৃষ্টিপ্রতিস্পর্ধীদের সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমাণে সচেতনতা ছিল না। সর্বোপরি, উপন্যাস সৃষ্টির সূচনালগ্নে বাস্তব সমাজ জীবনের কাহিনি তৎকালীন পাঠক কিভাবে গ্রহণ করবেন লেখকের মনে এই সম্বন্ধে দ্বিধা থাকা সম্ভব ছিল। নানান সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র তার প্রতিভাবলে রজনীর অনুভূতির জগৎ তৎকালীন সমাজের প্রেক্ষিতে যেভাবে চিত্রিত করেছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। সংক্ষেপে এই উপন্যাসের আলোচ্য বিষয়গুলি এইভাবে সূত্রবদ্ধ করতে পারি,

প্রথমত, রজনীর মনোজগৎ ও তীব্র ইন্দ্রিয়সচেতনতা এই কাহিনিতে গুরুত্ব পেয়েছে।

দ্বিতীয়ত, দৃষ্টিহীনতা, দারিদ্র এবং লিঙ্গগত কারণে নারী হওয়ার জন্য সে সামাজিকভাবে অবদমিত।

তৃতীয়ত, দৃষ্টিহীনতা এবং লিঙ্গগত কারণে নারী হওয়ার জন্য সে পুরুষের লালসার শিকার হচ্ছে। এখানে দৃষ্টিহীনতা এবং নারীত্ব পুরুষের অত্যাচারের কারণ হিসেবে সক্রিয়।

চতুর্থত, রজনীর আর্থিক অবস্থানের পরিবর্তনের সঙ্গে তার সামাজিক অবস্থানের পরিবর্তন ঘটছে।

৪.৬ অনুরূপা দেবী (১৮৮২-১৯৫৮ খ্রীঃ)

বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস সৃষ্টির প্রথম যুগে মহিলা ঔপন্যাসিকের অস্তিত্ব ছিল না। পরবর্তী পর্যায়ে পুরুষ ঔপন্যাসিকদের পাশাপাশি মহিলারাও উপন্যাস রচনায় এগিয়ে আসেন। সে প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন- "বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় ঘটনা মহিলা-ঔপন্যাসিকের আবির্ভাব। উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য বিষয় - প্রেম, নরনারীর পরস্পরের প্রতি নিগূঢ় আকর্ষণ-রহস্য; ইহারই অফুরন্ত বিচিত্রতা উপন্যাসের

পৃষ্ঠায় পল্লবিত হইয়াছে। এই প্রেম-চিত্রণে ভার যদি সম্পূর্ণরূপে পুরুষেরই একচেটিয়া হয় তাহা হইলে ইহা যে খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ ও একদেশদর্শী হইবে ইহা অনুমান করা কঠিন নয়।"[১১] বঙ্কিম উত্তর যুগে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে অনেক দিন পর্যন্ত কোনো মহিলা ঔপন্যাসিকের রচনা পাওয়া যায়নি। তাই একথা বললে অত্যুক্তি হবে না মহিলা ঔপন্যাসিকের আবির্ভাবের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে যেসমস্ত নারী চরিত্র চিত্রিত হয়েছে সেগুলি সবই পুরুষের চোখ দিয়ে দেখা। কিন্তু নারীরও যে একটা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি এবং স্বতন্ত্র সুর আছে, নিজস্ব বলবার কথা আছে যা নানা ক্ষেত্রে পুরুষের চেয়ে আলাদা সাহিত্যে তার কোনো প্রতিফলন ঘটেনি। তবে বিশ শতকের শেষ ভাগ থেকে নিরুপমা দেবী, স্বর্ণকুমারী দেবী, অনুরূপা দেবী প্রমূখ মহিলা ঔপন্যাসিকের আবির্ভাবে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে সেই অভাবকিয়দাংশে পূর্ণ হয়েছে আমরা অনুরূপা দেবীর *মহানিশা* উপন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করবো।

মহানিশা (১৯১৯ খ্রীঃ): অনুরূপা দেবীর সময়কাল ১৮৮২ থেকে ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ। তার রচিত উপন্যাসগুলির মধ্যে *মহানিশা* (১৯১৯ খ্রীঃ), *পথহারা, মন্ত্রশক্তি*-র (১৯১৫ খ্রীঃ) নাম উল্লেখযোগ্য। *রামগড় ও ত্রিবেণী*-র (১৯২৮ খ্রীঃ) মতো ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখলেও সামাজিক ও পারিবারিক কাহিনি সৃষ্টিতে তিনি সাফল্য দেখিয়েছেন। আমাদের আলোচ্য *মহানিশা* উপন্যাসটির মধ্যেও দুটি পরিবারের কাহিনি স্থান পেয়েছে। এই উপন্যাসে প্রধান চরিত্র ধীরা দৃষ্টিপ্রতিবন্ধকতার শিকার। *রজনীর* পর বাংলা সাহিত্যে দৃষ্টিপ্রতিস্পর্ধী চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে লেখিকা যেন বিপরীত পথে যাত্রা করেছেন। এর এক বছর আগে প্রকাশিত নিরুপমা দেবীর *শ্যামলী* উপন্যাসে শ্যামলী নাম্নি মূক ও বধির এবং জড়বুদ্ধিসম্পন্ন এক কন্যার কাহিনি স্থান পেয়েছে। সেখানে স্বামী ও শ্বশুর বাড়ির সঙ্গ লাভে শ্যামলীর মধ্যে জীবনের নতুন সম্ভাবনার বিকাশ লক্ষ্যণীয়। কিন্তু এই উপন্যাসে লেখিকা ধীরা চরিত্রের

বিকাশের ক্ষেত্রে বিপরীত পথে যাত্রা করেছেন। ধীরা চরিত্র সম্পর্কে ক্ষেত্র গুপ্ত লেখেন, "সমকালীন বাংলা সাহিত্যে অন্যান্য প্রতিবন্ধীদের চেয়ে সে ভাগ্যবতী। সে ধনী কন্যা, বিয়ের আগে প্রেমিক এবং বিয়ের পর স্বামী নির্মলের ভালোবাসা সে পেয়েছিল।"[১২] কথাটি বহুলাংশে সত্য হলেও এ কথা অনস্বীকার্য যে, শেষ পর্যন্ত দৃষ্টিহীনতার কারণে তার জীবনে আত্মহত্যার মতো করুণ ট্র্যাজেডি নেমে এসেছে।

ধীরা ধনী ব্যবসায়ী মুরলিধরের কন্যা। সম্ভবত অর্থকৌলিন্যের জোরে তার নির্মলের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। কিন্তু সে প্রেম-প্রণয় বিষয়ে যেমন অনভিজ্ঞা তেমনই সাংসারিক কাজকর্মের তার দক্ষতা নেই। লেখিকা কারণ হিসেবে যেমন দৃষ্টিহীনতাকে দায়ী করেছেন তেমনই তার বাবার স্নেহ এবং মাতৃহীনতা, যা তার চরিত্র ও মনের বিকাশে বাধা সৃষ্টি করেছে। "ধীরার অন্ধত্ব, মাতৃহীনতা ও অবিরত পিতৃসাহচর্য তাহার চারিদিকে এমন একটা দুর্ভেদ্য অন্তরালের সৃষ্টি করিয়াছে যাহার ভিতর দিয়া সাংসারিক প্রণয় বিষয়ক জ্ঞান প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই।"[১৩] কিন্তু দৃষ্টিপ্রতিস্পর্ধী কেন্দ্রিক পূর্ববর্তী রচনা 'রজনী' ও 'দৃষ্টিদান' গল্পে আমরা দেখেছি যে, দৃষ্টিহীনতা সত্ত্বেও রজনী এবং কুমু সাংসারিক কাজকর্মে এবং প্রেম বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞা। দৃষ্টিহীনতা যে মানুষের জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করছে না লেখকরা সে বিষয়ে সচেতন ছিলেন। এখানে দৃষ্টিহীনতা এবং অতিশয় পিতৃস্নেহ ধীরার জীবনে বিকাশকে চারিদিক থেকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। দৃষ্টিহীনতার কারণে তার মানসিক দুর্বলতাও তাকে জীবন সংগ্রামে পিছিয়ে দিয়েছে। ধীরা স্বামীর সেবাযত্ন এবং বাড়ির পরিচারিকার কাছে প্রেমের সহজপাঠের শিক্ষা গ্রহণ করলেও তাতে তার মনের দৈন্য এবং নির্মলের মনের অতৃপ্তি দূর হয়নি যা শেষ পর্যন্ত নির্মলকে অন্য নারীর প্রতি এবং ধীরাকে আত্মহননের দিকে ঠেলে দিয়েছে। তবে সমালোচকের মতে তার আত্মহনন 'আরোপিত'-[১৪] পূর্ববর্তী উপন্যাসগুলি এ জাতীয় চরিত্রে

উত্তরণের যে সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল লেখিকা তার বিপরীত পথে হেঁটে দৃষ্টিহীনতাজনিত মানসিক জটিলতাব্যখ্যা করতে গিয়ে আত্মহননের প্রসঙ্গটি ব্যবহার করেছেন। তবে ধীরা চরিত্রে যে মানসিক জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে তার জন্য তার দৃষ্টিহীনতা শুধুমাত্র দায়ী নয়, তার প্রতি নির্মলের আচরণকেও সমানভাবে দায়ী বলতে হয়। তাই আত্মহত্যার পরিবর্তে সমাজসচেতনতা বা উত্তরণের প্রসঙ্গটি এখানে স্থান পেতে পারত।

উক্ত উপন্যাসটি তাই আশার পরিবর্তে হতাশা জাগায় জীবনসংগ্রামের পরিবর্তে সহানুভূতিকে প্রাধান্য দেয়। সমাজমনস্কতার প্রশ্নে লেখিকার ভূমিকা আমাদের ভাবিত করে। তবে নানান ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও ধীরার মানসিক যন্ত্রণা লেখিকা যেভাবে রূপায়িত করেছেন তা প্রশংসার দাবী রাখে। ধীরা চরিত্রের মানসিক জটিলতা ও হীনমন্যতাবোধ ক্রমশ কিভাবে তাকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে গেছে তা নারী চরিত্রের অন্য এক মানসিক রূপকে উদ্ঘাটিত করে। সমালোচকের মতে "বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে 'মহানিশা'র উচ্চ স্থান অবিসংবাদিত"[১৫]। এই উপন্যাসটি থেকে প্রাপ্ত ধারণাগুলি হলো - ১। প্রতিবন্ধকতা হয়ে উঠেছে বঞ্চনার মাধ্যম।

২। অর্থকৌলিন্যের জোরে সাময়িকভাবে প্রতিবন্ধকতাকে এড়িয়ে গেলেও এর জন্য যুগোপযোগী শিক্ষা ও মানসিকতা গড়ে তোলা প্রয়োজন।

৪.৭ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৮৬ খ্রীঃ)

কল্লোল যুগের কবি ও কথাকার অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত সম্পর্কে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন- "অচিন্ত্যকুমার কল্লোলগোষ্ঠীর প্রতিভাবান লেখক। ইনি পুরানো পথ পরিহার করে উপন্যাসকে নতুন আকার দিয়েছেন ও নতুন পথে পরিচালিত করেছেন। পরিকল্পনা ও রচনাভঙ্গীর মৌলিকতা বিষয়ে ইনি পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের থেকে স্বতন্ত্র গোত্রের। অচিন্ত্যকুমারের উপন্যাস ব্যাপক ও গভীরভাবে গীতিকাব্যধর্মী। তাঁর উপন্যাসে মনস্তত্ত্ব

বিশ্লেষণ বড় নয়, কাব্যোচ্ছ্বাসেরই প্রাধান্য।"[১৬] তাঁর সময়কাল ১৯০৩ থেকে ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ। কল্লোল যুগে কবি ও কথাকার হিসেবে বাংলা সাহিত্যে তিনি আত্ম প্রকাশ করেন। বুদ্ধদেব বসু , প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ এক দল তরুণ যারা বাংলা সাহিত্যে ভাব ও ভাষার প্রশ্নে নতুন পথের সন্ধান করছিলেন অচিন্ত্যকুমার তাদেরই দলভুক্ত। বুদ্ধিদীপ্ত গদ্যশৈলী এবং কল্লোলীয় দৃষ্টিভঙ্গির গুণে তিনি বাংলা সাহিত্যে স্বতন্ত্র স্থান করে নিয়েছিলেন। তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে *বেদে* (১৯২৭ খ্রীঃ), *ঊর্ণনাভ* (১৯৩৩ খ্রীঃ), *আসমুদ্র* (১৯৩৪ খ্রীঃ), *আকস্মিক* (১৯৩০ খ্রীঃ), *প্রচ্ছদপর্ব* (১৯৩৪ খ্রীঃ) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। *ইতি* (১৯৩২ খ্রীঃ) ও *অকাল বসন্ত* গল্পগ্রন্থগুলি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। সাহিত্য সমালোচকের মতে "অতি-আধুনিক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে বুদ্ধদেব বসু ও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। রচনার অজস্রতা ও অভিনব লিখনভঙ্গি- এই দুই দিক দিয়াই তাঁহারা খ্যাতি ও বৈশিষ্ট্য অর্জনের অধিকারী।"[১৭] আমাদের আলোচ্য *'তৃতীয় নয়ন'।* উপন্যাসটি তাঁর রচনাবলী চতুর্থ খণ্ড থেকে সংগৃহীত।

তৃতীয় নয়ন (১৯৩৩ খ্রীঃ): *তৃতীয় নয়ন* উপন্যাসটি ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১৯২৭ সালে অচিন্ত্যকুমার লেখেন 'বেদে' উপন্যাসটি, সেখানে সমাজের নিচু তলার মানুষের জীবনচিত্র গুরুত্ব পেয়েছে। এই উপন্যাসে ঘটনাচক্রে স্থান পেয়েছে বাতাসী নাম্নী যুবতী এবং এক বিকলাঙ্গ যুবকের কথা। আমাদের আলোচ্য উপন্যাসের প্রধান পুরুষ চরিত্র দৃষ্টিপ্রতিস্পর্ধী মিহির। আকস্মিক অসুখে তার দু'চোখের দৃষ্টি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে এবং তার ব্যক্তিজীবনে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে লেখক শিল্পসম্মতভাবে আমাদের সামনে সেই সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন। মিহির সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। কবিতা লেখা এবং ছবি আঁকায় সে পারদর্শী। আকস্মিক দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় সে অন্ধকার জগতে নির্বাসিত। তার এই দুর্ঘটনা মায়ের অসুখ বাড়িয়ে তাকে

মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে। মিহিরের দাদা বৌদি চাকরি সূত্রে বাইরে চলে গেছে। তাকে দেখাশোনা করার জন্য বাড়ির চাকর এবং তার বাল্যসাথী মিনতি একমাত্র ভরসা।

মিনতির সাথে তার সম্পর্ক প্রেমের কিন্তু তার দৃষ্টিহীনতার সুযোগে আরো দুজন পুরুষ যথাক্রমে নৃপতি ও শীতেশবাবু প্রবেশ করার চেষ্টা করেছে। যদিও মিনতির ভালোবাসা তাতে কমে নি তবে সে চেয়েছে মিহিরের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়ে সামাজিকভাবে সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিতে। মিহিরের নিজের জন্য যতখানি তার চেয়েও যেন বেশী প্রয়োজন সমাজকে দেখানো যে মিহির আর পাঁচটা পুরুষের তুলনায় কিছু কম নয়। সেই জন্য মিনতি সোমানন্দ নামে এক সন্ন্যাসীর সাহায্যে তার দৃষ্টি ফিরিয়ে দিতে চেয়েছে। মিনতির এই উক্তিটি লক্ষ্য করার মতো, "তোমার জন্যে না হোক, আমার জন্যে এই আলো চাই।"[১৮]

এই উপন্যাসে দৃষ্টিশক্তি হারানোর কারণে মিহির আর পাঁচটা পুরুষের থেকে আলাদা অর্থাৎ স্বাভাবিক পুরুষ নয়। আবার অন্যদিকে মিনতি হয়ে উঠেছে মিহিরের জীবনের প্রধান অবলম্বন বা তৃতীয় নয়ন। শেষ পর্যন্ত অন্যের ওপর নির্ভরতাই এখানে তৃতীয় নয়ন হিসেবে প্রতিকায়িত। "দুইচোখ হারালেও হয়তো মিনতির এই প্রেম তার জীবনে হয়ে উঠেছে তৃতীয় নয়ন - অন্যতর দৃষ্টিশক্তি।"[১৯] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *দৃষ্টিদান* গল্পের কুমু চরিত্রের মতো দৃষ্টিশক্তি হারানোর পর মিহিরের অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সক্রিয়তা বিজ্ঞানসম্মত। তবে *রজনীর* মতো এই উপন্যাসে সন্ন্যাসীর সাহায্যে মিহিরের দৃষ্টি ফিরিয়ে দেওয়ার প্রসঙ্গ আছে যা আধুনিকতার পরিপন্থী। যদিও শেষ পর্যন্ত এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। আবার মানুষের পরনির্ভরতার নামই তৃতীয় চক্ষু এই ধারণাটিও আধুনিকতার বিরোধী। আধুনিক বিজ্ঞানমনস্কতা ব্যক্তি মানুষের স্বাধীন জীবন যাপনের ওপর গুরুত্ব দেয়। দৃষ্টিহীনতার কারণে স্বাভাবিক পুরুষ হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা হারানোর বিষয়টি আমাদের সমাজে দৃষ্টিহীনদের সামাজিক অবস্থানকে চিহ্নিত করে। অক্ষমতাবিদ্যাচর্চাই তত্ত্বগতভাবে এই

সমাজ আরোপিত স্বাভাবিকতার ধারণার বিরোধিতা করা হয়েছে। স্বাভাবিকতা ব্যাপারটি কখনো সমাজ ও সময় নিরপেক্ষ হতে পারে না। সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে সৃষ্ট এই ধারণাটি এক দল মানুষকে সমাজ থেকে আলাদা করে দিচ্ছে।

চমকপ্রদ গদ্যশৈলী এবং আকস্মিক দৃষ্টিশক্তি হারানো মিহিরের জীবন যন্ত্রণা লেখক যেভাবে চিত্রিত করেছেন তা প্রশংসার দাবি রাখে। দৃষ্টিহীনদের সামাজিক অবস্থান এবং সমাজমনস্কতার প্রশ্নে তাঁর এই উপন্যাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। "শিল্পী জীবনের অন্ধত্বকে বর্ণনা করতে গিয়ে ঔপন্যাসিকও শিল্প নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন।"[২০] উক্ত উপন্যাস থেকে প্রাপ্ত মূল ধারণাগুলি এইভাবে বলা যেতে পারে-

১। লেখক প্রতিবন্ধকতা ও স্বাভাবিকতার প্রশ্নটি উত্থাপন করেছেন।

২। মানুষের পরনির্ভরতার নামই তৃতীয় নয়ন।

৩। প্রতিবন্ধকতা বঞ্চনার মাধ্যম হয়ে উঠেছে।

৪.৮ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১ খ্রীঃ) এর দুটি উপন্যাস

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সময়কাল ১৮৯৮ থেকে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ। *কল্লোল* গোষ্ঠীর লেখক রূপে বাংলা সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করলেও পরবর্তী কালে তিনি বিস্তৃত ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পরেছিলেন। "তারাশঙ্কর একদা 'কল্লোলে'র দলে ঠাঁই পেয়েছিলেন, কিছু কিছু কবিতাও লিখেছিলেন, কিন্তু পরে তিনি নিজের প্রতিভা ও স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে সচেতন হন। মানব জীবনের বিশাল রূপ কথাসাহিত্যের মার্ফতে ফুটিয়ে তোলাই যে তাঁর একমাত্র ব্রত তা তিনি অচিরেই বুঝতে পারলেন এবং 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর খোপ থেকে বেরিয়ে বিশাল প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়লেন।"[২১] দীর্ঘ সাহিত্যজীবনে তিনি কথাসাহিত্যের চরম সীমায় পৌঁছেছিলেন। মূলত রাঢ় বাংলার জীবনচিত্র চিত্রণের জন্য তিনি বাংলা সাহিত্যে জনপ্রিয় হলেও তার মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান দিয়েছে। *ধাত্রী দেবতা* (১৯৩৯ খ্রীঃ), *গণদেবতা*

(১৯৪২ খ্রীঃ), *কালিন্দী* (১৯৪০ খ্রীঃ), *হাঁসুলিবাঁকের উপকথা* (১৯৪৭ খ্রীঃ) প্রভৃতি উপন্যাস রচনার জন্য তিনি বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয়। কোনো আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি নয়, দেহধারি মানুষের সুখ-দুঃখ, উত্থান-পতনের ছবি আঁকার জন্যই তার সাহিত্য সাধনা। নবীন ও প্রাচীনের মধ্যে নবীনের অবশ্যম্ভাবী প্রতিষ্ঠা এবং প্রাচীনের কালের অন্তরালে অন্তর্হিত হওয়ার দর্শন বারবার তাঁর সাহিত্যে ফিরে এসেছে। নিজের অভিজ্ঞতার জগতকে তিনি বাংলাসাহিত্যে নির্মোহ দৃষ্টিতে পরিবেশন করেছেন। "তাঁর উপন্যাসে মুমূর্ষু সামন্ততান্ত্রিক ব্যক্তি, জীবন ও সমাজের ছবিটি অপূর্ব করুণায় ও মমতায় বর্ণিত হয়েছে। একটা যুগের অবসান হচ্ছে, আর একটা যুগ আসছে। পুরাতন গ্রামীণ জমিদারী আবহাওয়া চলে যাচ্ছে, আর সেই শূন্যস্থান পূরণ করতে আসছে শিল্পপতির দল। গ্রাম জনপদ যন্ত্রদানবের কৃপায় রাতারাতি আধা শহরে পরিণত হচ্ছে।"[২২]

কান্না (১৯৬৫ খ্রীঃ): আমাদের আলোচ্য *কান্না* উপন্যাসটি তাঁর 'রচনাবলী অষ্টম খণ্ড' থেকে সংগৃহীত। উক্ত উপন্যাসটির বিষয় ও পটভূমি কিছুটা আলাদা। এর প্রেক্ষাপটে রয়েছে কলকাতার অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান এবং বস্তিবাসী মুসলিম সমাজের জীবনযাত্রার ছবি। উক্ত উপন্যাসে লনা অস্থিপ্রতিস্পর্ধী আর আমাদের আলোচ্য দৃষ্টিপ্রতিস্পর্ধী চরিত্র হলো জন। জনের বিচিত্র জীবনকথা এবং দৃষ্টিশক্তি হারানোর পর সমাজে তার অবস্থান এই উপন্যাসের উপজীব্য।

জন কোনো এক ভদ্র পরিবারের সন্তান। কিন্তু ঘটনাচক্রে আশ্রয় নিয়েছে কলকাতার এক বস্তিতে নানির কাছে। একদিন সেখান থেকে পালিয়ে ফাদারের আশ্রয় গ্রহণ করেছে। ফাদারের প্রচেষ্টায় তার জীবনে রুচিশীল শিক্ষা-দীক্ষার সূচনা হলেও বস্তিজীবনের অমোঘ আকর্ষণ তার চরিত্রে সক্রিয়। একদিন কৈশোরে যে রশ্মিকে তার ভালো লেগেছিল সেই স্মৃতি সে ভুলতে পারে না। ঘুমের মধ্যে নানির নাম ধরে কেঁদে ওঠে। এসবের মধ্যেও তার

সঙ্গীতের প্রতি আকর্ষণ তাকে একজন যন্ত্রী ও গায়ক করে তোলে। পিছনে পড়ে আছে প্রথম কৈশোরের প্রেমের স্মৃতি আর বস্তিজীবনের বন্য-আনন্দের আকর্ষণ। সঙ্গীতের সূত্র ধরেই তার জীবনে একাধিক নারীর আগমন ঘটে। অস্থিপ্রতিস্পর্ধী লনার সান্নিধ্য তাকে সুখি করতে পারে না। ফাদারের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও সে যথেচ্ছ জীবন যাপন করে। একদিন পুরোনো প্রেমিকা রশ্নির সঙ্গ করতে গিয়ে তার ডাকাত অভিভাবক পল্টনের দ্বারা সে আক্রান্ত হয়ে চোখের দৃষ্টি এবং গলার স্বর হারায়।

প্রকৃতপক্ষে বন্যজীবনের আকর্ষণ আর নারীসঙ্গ লাভের প্রবণতা থেকেই তার জীবনে দৃষ্টিহীনতা নেমে আসে। দৃষ্টিহীন জীবনে যখন সে আর গাইতে পারে না তখন বেহালা বাজিয়ে উপার্জন করে। কখনো ভিক্ষাবৃত্তিও করতে হয় তাকে। এই বিপর্যয়ের দিনে তার আবার লনার কথা মনে পড়ে। তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে উপন্যাসের একটি চিঠির উদ্ধৃতি প্রণিধানযোগ্য- "অন্ধ হয়েছি। আমার চোখ কেড়ে নিলে, পাপ নিলে, এমন কণ্ঠস্বর নিলে তবু এর কি অমোঘ আকর্ষণ ডেভিট, অন্ধ আমি নারী দেহ খুঁজছি।"[২৩]

উক্ত উপন্যাসে দেখানো হয়েছে মানুষ মানুষকে প্রতিবন্ধী বানায় নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য। জন একদিন উৎশৃঙ্খল জীবন যাপনের জন্য পল্টনের হাতে দৃষ্টি হারিয়েছে। মানুষকে প্রতিবন্ধী বানিয়ে অর্থোপার্জনের প্রসঙ্গটিও লেখক সচেতনভাবে তুলে ধরেছেন। "এই উপন্যাসে আমরা পাচ্ছি ছোট ছেলেমেয়েদের খোঁড়া অন্ধ বানিয়ে ভিক্ষাবৃত্তিতে (ব্যবসার) বাধ্য করার কথা।"[২৪] বস্তিনিবাসীনি জনের নানি আসলে একজন শিশু পাচার কারি মহিলা। জনকেও সে বেচে দিতে চেয়েছিল পাঁচশো টাকার বিনিময়ে। উপযুক্ত দাম না পাওয়ায় এবং জনের প্রতি তার স্নেহের উদ্রেক হওয়ায় জন রক্ষা পেয়েছিল। অর্থের বিনিময়ে শিশুদের নিয়ে গিয়ে একদল মানুষ তাদের প্রতিবন্ধী করে ভিক্ষে করায়। তাই মানুষের প্রতিবন্ধকতা যে একটি শোষণের মাধ্যম এই উপন্যাসে সে কথা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আবার যারা গায়ক জনের আকর্ষণে একদিন তাকে আপন করে নিয়েছিল দৃষ্টিশক্তি হারানোয় তারা সবাই জনের সঙ্গ ত্যাগ করেছে।

সঙ্গীতবিদ্যাকে এখানে জনের জীবনের উত্থান-পতনের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। জনের জীবনের যাবতীয় উত্তরণ এবং বেঁচে থাকা তা এই সঙ্গীত দক্ষতাকে কেন্দ্র করে। কখনো সে সুকণ্ঠ গায়ক আবার, কখনো বেহালাবাদক যন্ত্রী বা পথের ভিখারি। দৃষ্টিশক্তি না থাকার সাথে মানুষের জৈবিক প্রবৃত্তির যে কোনো সম্পর্ক নেই সে বিষয়টিও এখানে লক্ষ্যণীয়। তবে জন দৃষ্টি হারানোর পর নতুন উপলব্ধিতে পৌঁছেছে। তাই সে বলে, "চোখ নিলে, পাপ নিলে।"[২৫] সম্ভবত জনের করুণ জীবনবৃত্তান্ত চিত্রণের মূলে প্রভাব ফেলেছে লেখকের ব্যক্তিগত একটি অভিজ্ঞতার স্মৃতি- "পরিণত বয়সে তিনি চৌরাঙ্গী অঞ্চলের এক অন্ধ ফিরিঙ্গি বেহালাবাদক ভিক্ষাজীবি দেখে আকৃষ্ট হন। তার অপূর্ব সুর জ্ঞান ও মর্যাদাব্যঞ্জক আচরণ তার প্রতি আকৃষ্ট হবার অন্যতম কারণ। এমন অনুমান অসঙ্গত হবে না, সহানুভূতিশীল তারাশঙ্করের কাছে অন্ধ মানুষটি তার জীবনের ব্যর্থতার কথা বলে থাকবে।"[২৬] ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে সৃষ্ট জন চরিত্রটি বাংলা কথাসাহিত্যে প্রতিবন্ধকতার অন্য ধরনকে তুলে ধরেছে। এই উপন্যাস থেকে প্রাপ্ত ধারণাগুলি হলো –

১। প্রতিবন্ধকতা হয়ে উঠেছে শোষণ ও স্বার্থসিদ্ধির মাধ্যম।

২। দৃষ্টিহীনতা ও সঙ্গীতবিদ্যার প্রসঙ্গ আছে।

৩। মানুষের কামনার মতো জৈবতার সাথে দৃষ্টিহীনতার সম্পর্কটি অবশ্যম্ভাবী নয়।

৪। দৃষ্টিহীনতা ও সামাজিক বিচ্ছিন্নতার প্রসঙ্গ আছে।

৫। লেখকের সমাজমনস্কতা লক্ষ্যণীয়।

ভুবনপুরের হাট (১৯৬৪ খ্রীঃ): তারাশঙ্করের কথাসাহিত্যে আমরা অনেকগুলি প্রতিস্পর্ধী চরিত্রের দেখা পাই। 'নারী ও নাগিনী' গল্পের খোঁড়া শেখ, 'তমসা' (১৩৫২) গল্পের পঞ্চে,

পঞ্চপুত্তলি (১৯৫৫ খ্রীঃ) উপন্যাসের ফড়িং তার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। আমাদের আলোচ্য দৃষ্টিপ্রতিস্পর্ধী খোকা ঠাকুর চরিত্রটি তার *'ভুবনপুরের হাট'* উপন্যাসের অন্তর্গত। ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত উক্ত উপন্যাসটি তাঁর রচনাবলীর অষ্টাদশ খণ্ড থেকে সংগৃহীত। এই উপন্যাসে নবঠাকুর বা খোকা ঠাকুরের বসন্ত রোগে দৃষ্টিশক্তি হারানোর প্রসঙ্গ আছে। *কান্না* উপন্যাসের জন বা বাচ্চির মতো জীবনের মাঝপথে উপন্যাসের নায়ক তার দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছে।

বসন্তরোগে দৃষ্টিশক্তি হারানোর পর তার বাহ্যিক চেহারার পরিবর্তন যেমন ঘটেছে তেমনই তার জীবন ও উপলব্ধির পরিবর্তনও লক্ষ্যণীয়। এ প্রসঙ্গে তার একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য – "জানিস, চোখ গিয়েছে আজ পাঁচ ছ-বছর বসন্ত রোগ হয়ে গেল। তারপর একটা জিনিস বুঝতে পারলাম আমি পারি। আমি হাত বুলিয়ে রূপ বুঝতে পারি আর গায়ের গন্ধে মানুষের মন বুঝতে পারি।"[২৭] তার এই উক্তি নব ঠাকুরের উপলব্ধির জগৎ ও তীব্র ইন্দ্রিয় সচেতনতাকে প্রকাশ করে। সে প্রাণ খুলে ভুবনপুরের হাটে গান গেয়েছে। তার রূপে নয়, গান শুনে মালতী নিজেকে তার কাছে সমর্পণ করেছে। *কান্না* উপন্যাসের মতো এখানে সঙ্গীতবিদ্যার প্রসঙ্গকে লেখক ব্যবহার করেছেন। দৃষ্টিহীন ব্যক্তিদের সঙ্গীতই একমাত্র ভরসা, লেখক এই ধারণার বশবর্তী হয়ে থাকতে পারেন। তার অনেকগুলি ছোটোগল্প ও উপন্যাসে আমরা একই ধরনের অনুষঙ্গ পাচ্ছি। 'তমসা'র পঙ্খে, 'কান্না'র জন এবং উক্ত উপন্যাসের নবঠাকুর তার নিদর্শন। কিন্তু এমন অনুমানও অসঙ্গত নয় তিনি নিজেও ছিলেন একজন সঙ্গীতরসিক ও গীতিকার। এই রচনাগুলির মধ্যে তারও প্রভাব পড়ে থাকতে পারে। উক্ত উপন্যাস থেকে প্রাপ্ত ধারণাগুলি হলো-

১। দৃষ্টিহীনতা ও সঙ্গীতবিদ্যার প্রসঙ্গ আছে।

২। তীব্র ইন্দ্রিয় সচেতনতা আছে।

৩। সামাজিক বিচ্ছিন্নতা থেকে সম্পর্কের দিকে যাত্রার ইঙ্গিত আছে।

৪.৯ বিমল কর (১৯২১-২০০৩ খ্রীঃ)

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের কথাকারদের মধ্যে বিমল কর অন্যতম। সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে তিনি নিরেট কাহিনি বুননের পরিবর্তে মানুষের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও প্রতীকী ব্যঞ্জনার দিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। মানুষের মনের গভীরে অবগাহন করে অবচেতন মনের রহস্যকে প্রতীকী ব্যঞ্জনার সাহায্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। এ প্রসঙ্গে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য- "কোনো কোনো কথাকার দেশ-কালের পরিব্যাপ্ত না হয়ে ব্যক্তির কূটৈষণাকে কেন্দ্র করে এমন সমস্ত মনোবিকারের ছবি আঁকছেন যে, এর স্বাদবৈচিত্র্যও এক শ্রেণীর পাঠককে উতলা করে তুলেছে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, বিমল কর, সন্তোষ ঘোষ, সমরেশ বসু, বুদ্ধদেব গুহ শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেশ মজুমদার প্রভৃতির গল্প-আখ্যানে, উপন্যাসে অদ্ভুত প্রতিভা স্বীকার করতেই হবে।"[২৮] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে লেখা তাঁর *দেওয়াল (প্রথম খণ্ড ১৯৫৬ এবং দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৫৮ খ্রীঃ)* উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। অন্যান্য রচনার মধ্যে *যদুবংশ, নিরস্ত্র, ইল্লিগড়ের রূপকথা, পঞ্চাশটি গল্প,* উল্লেখযোগ্য। আমাদের আলোচ্য *পূর্ণ অপূর্ণ* উপন্যাসটি তাঁর *উপন্যাস সমগ্র* এর অন্তর্গত। উক্ত উপন্যাসে দৃষ্টিপ্রতিস্পর্ধী পার্শ্ব চরিত্র হিসেবে লেখক নির্মলাকে হাজির করেছেন।

পূর্ণ অপূর্ণ (১৯৭৯ খ্রীঃ): এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র সুরেশ্বর বিহারের প্রত্যন্ত এলাকায় দৃষ্টিহীনদের জন্য একটি আশ্রম তৈরি করেছে। সেখানে চক্ষুচিকিৎসা এবং হাতের কাজ শেখানো হয়। হৈমন্তী চোখের ডাক্তার হিসেবে এই আশ্রমে যোগ দিয়েছে। কিন্তু সে সুরেশ্বরের সাথে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নভঙ্গের বেদনা নিয়ে সে একদিন এই আশ্রম থেকে বিদাই নেয়। সুরেশ্বর দৃষ্টিহীনদের সেবায় উৎসর্গীকৃত। তার কাছে এর চেয়ে বড়ো

আদর্শ আর কিছু নেই। এই কারণেই হৈমন্তী আর সুরেশ্বরের পথ একদিন আলাদা হয়ে যায়। সুরেশ্বরের জীবনে দৃষ্টিবতী হৈমন্তীর ভালোবাসা সেই পূর্ণতার সন্ধান দিতে পারেনি যা দৃষ্টিহীনা নির্মলা তাকে শিখিয়েছে। তাই দৃষ্টিহীনতা এই উপন্যাসে শেষ পর্যন্ত প্রতীকী মাত্রা পেয়েছে। "তার অন্ধত্ব উপন্যাসের প্রধান চরিত্র সুরেশ্বরের জীবনে অন্য একটি পূর্ণতার সন্ধান দিয়েছে।"[২৯] তত্ত্বগতভাবে স্বাভাবিকতার প্রশ্নটি এখানে অস্বীকার করা হয়েছে।

নির্মলার উপস্থিতি এই উপন্যাসে সামান্য হলেও তার প্রভাব সারা উপন্যাস জুড়ে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আকস্মিক দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হলেও তার সঙ্গ সুরেশ্বরকে ছকে বাঁধা জীবন পেরিয়ে অন্য পথে পূর্ণতার সন্ধান দিয়েছে। "আমার চোখ দুটোয় কি আমি?.....তাহলে সে আমি কিছুই না।"[৩০] তার এই উক্তি মানুষের অঙ্গবৈকল্য এবং সমাজ নির্ধারিত স্বাভাবিকতার ধারণাকে আঘাত করেছে। এই উপন্যাসে দেখানো হয়েছে দার্শনিক দৃষ্টিতে সকলেই অপূর্ণ। মানুষের কাল্পনিক ঈশ্বর এক মাত্র পূর্ণ। মানুষ সেই পূর্ণ ঈশ্বরের প্রতিস্পর্ধী হয়ে উঠতে চায়। আবার এই পূর্ণতার ধারণাটিও ব্যক্তি বিশেষের ওপর নির্ভর করে। সকলের পূর্ণতার ধারণা একইরকম নয়। এই উপন্যাস থেকে প্রাপ্ত ধারণাগুলি হল-

১। দার্শনিক দৃষ্টিতে কেউ পূর্ণ বা স্বাভাবিক নয়।

২। মানুষের পূর্ণতা ও স্বাভাবিকতা ব্যক্তিসাপেক্ষ।

৩। অঙ্গবৈকল্যের নিরিখে যে স্বাভাবিকতা তা সমাজ দ্বারা নির্ধারিত।

৪.১০ বিমল মিত্র (১৯১২-১৯৯১ খ্রীঃ)

এ যুগের একজন অন্যতম কথাকার বিমল মিত্র। কথাসাহিত্যে পুরোনো মূল্যবোধের ভাঙন এবং নতুন মূল্যবোধের অনুসন্ধান তার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। কলকাতার বিত্তশালী সমাজ থেকে নিম্নবিত্ত সমাজের নানান চিত্র উঠে এসেছে তার লেখায়। *একক দশক শতক, নিবেদন ইতি, সাহেব বিবি গোলাম, কড়ি দিয়ে কিনলাম* তার উপন্যাসগুলির মধ্যে

উল্লেখযোগ্য। সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর অনুরাগ এতটাই গভীর যে, তিনি মনে করতেন সাহিত্যের জন্য আর সব কিছু ত্যাগ করা যায়। কিন্তু কোনো কিছুর জন্য সাহিত্যকে ত্যাগ করা যায় না। এই কারণে তাঁকে সাহিত্যতপস্বী আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আমাদের আলোচ্য *শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন* উপন্যাসটি তার রচনাবলী সপ্তম খণ্ড থেকে সংগৃহীত।

শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন (১৯৭১ খ্রীঃ): উক্ত উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র হলো লোকনাথ। দৃষ্টিপ্রতিস্পর্ধী পার্শ্ব চরিত্র হিসেবে আমরা এই উপন্যাসে বকুলের উল্লেখ পাচ্ছি। বিত্তশালী পরিবারের সন্তান লোকনাথ। ইংরাজি সাহিত্য আর অর্থনীতিতে উচ্চশিক্ষা লাভ করার পর সে অটো ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার পরিচালনার দায়িত্ব পায়। এই সম্পত্তি তার পৈতৃকসূত্রে প্রাপ্ত। একদিন হিরোসিমায় পরমাণু হামলা বিষয়ক বই পড়ে তার মনোজগতের চেহারা বদলে যায়। "সে অটো ইঞ্জিনিয়ারিং এর ওয়ার্কসের ম্যানেজিং ডিরেক্টর হয়ে বেশ আরামেই ছিল। কিন্তু হঠাৎ সব ওলটপালট হয়ে গেল একদিন। ১৯৪৫ সালের ৫-ই আগস্টের ৮টা ১৬ মিনিটের একটা ঘটনা তার জীবনকে একেবারে অন্য খাতে বয়ে দিলে। তার জীবনকে তছনছ করে দিলে।"[৩১] রবীন্দ্রনাথ, যীশু খ্রীষ্ট ও বুদ্ধদেবের মূল্যবোধগুলি তার মিথ্যে মনে হয়। সে কারখানার মালিকানা বিলিয়ে দেয় শ্রমিকদের মধ্যে। কলকাতার রাস্তায় ঘুরতে-ঘুরতে একদিন জানালার ধারে এক ছোটো বালিকার সাথে তার পরিচয় হয়। তার নাম বকুল। ছাপোষা পরিবারের সন্তান, দৃষ্টিহীনা। তার বাবা-মার সুচিকিৎসা করানোর সাধ্য নেই। কিন্তু মেয়েটি দেখার বাসনায় ব্যাকুল। লোকনাথ তার বসতবাড়ি বন্ধক দিয়ে এক বিদেশী ডাক্তারের সাহায্যে তার চোখে অস্ত্রপাচার করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক হানাহানিতে বোমার আঘাতে বকুলের ক্ষীণ দৃষ্টিটুকুও নষ্ট হয়ে যায়। বোমার আঘাতে লোকনাথের মৃত্যু হয়।

এই উপন্যাসে লেখক সমকালীন সমাজের রাজনৈতিক সংঘর্ষ এবং মূল্যবোধের ভাঙনের ছবি এঁকেছেন। পৃথিবীতে একদল মানুষ আলো জ্বালানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে। আর এক দল চেষ্টা করছে মানব সভ্যতার সব আলো নিভিয়ে দিতে। ট্রুম্যান, স্ট্যালিন, চার্চিল প্রমুখ ব্যক্তিত্বের বিপ্রতীপে লেখক তাই এক জন বাতিওয়ালা এবং লোকনাথের ছবি এঁকেছেন। উপন্যাসের শেষে বালিকা বকুলের মন্তব্যটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য- "বাতিওয়ালা এল না কেন মা, বাতিওয়ালা কখন আসবে"[৩২] বকুলের দেখার আকাঙ্ক্ষা এবং দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাওয়া এখানে হয়ে উঠেছে প্রতীকী। ক্ষমতা আর অর্থের মোহে মানুষ অন্ধ হয়ে আছে। নানাভাবে লেখক এই তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই উপন্যাস থেকে প্রাপ্ত ধারণাগুলি হলো –

১। প্রতিবন্ধকতা হয়ে উঠেছে প্রতীকী।

২। মানুষ নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য মানুষকে অন্ধ করে রাখে।

৩। তীব্র সমাজমনস্কতা আছে।

৪.১১ নারায়ণ সান্যাল (১৯২৪-২০০৫ খ্রীঃ)

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের একজন প্রগতিশীল লেখক হলেন নারায়ণ সান্যাল যিনি গদ্যসাহিত্যের নানা শাখায় অবাধে বিচরণ করেছেন। কথাসাহিত্য রচনার পাশাপাশি তিনি ইতিহাস, স্থাপত্য, ভ্রমণ ও স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থ রচনা করেছেন। অজন্তা ও আগ্রার স্থাপত্য নিয়ে যেমন গ্রন্থ লিখেছেন তেমনই 'ষাট একষট্টি'র মতো স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থ তার উল্লেখযোগ্য রচনা। সামাজিক উপন্যাসের মধ্যে 'সত্যকাম', 'তাদের স্বপ্ন', 'আবার যদি ইচ্ছা করো' উল্লেখযোগ্য। তার রচিত নাটকগুলির মধ্যে 'আমি নেতাজীকে দেখেছি', 'আমি রাশবিহারীকে দেখেছি', 'রানি কাদম্বিনী' বাংলা নাট্যসাহিত্যের সম্পদ। দীর্ঘ সাহিত্যজীবনে তিনি প্রায় দেড়শোটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির গুণে বাংলা সাহিত্যে তিনি

স্মরণীয়। মননশীলতা ও বিজ্ঞানমনস্কতা তার রচনার বৈশিষ্ট্য। সময়ের দিক থেকে তিনি নাট্যকার বাদল সরকার (১৯২৫-২০১১ খ্রীঃ), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৪-২০১২ খ্রীঃ), সুচিত্রা ভট্টাচার্য (১৯৫০-২০১৫ খ্রীঃ) প্রমূখ কবি ও সাহিত্যিকদের সমসাময়িক। আমাদের আলোচ্য *নীলিমায় নীল* উপন্যাসটি ১৯৮৩ সালে দেজ পাবলিশিং হাউস থেকে প্রকাশিত হয়।

নীলিমায় নীল (১৯৮৩ খ্রীঃ): আলোচ্য উপন্যাসের কেন্দ্রিয় নারী ও পুরুষ চরিত্র হলো শর্মিলা ও আনন্দ। আর্থ-সামাজিকভাবে অসম দুই পরিবারের যুবক-যুবতী প্রেম সম্পর্ক থেকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তাদের দাম্পত্য জীবনের টানাপোড়েন ও উত্থান-পতনের কাহিনি এই উপন্যাসে দেখানো হয়েছে। কলেজের অধ্যাপক আনন্দ তার স্ত্রীর দাদার বিয়েতে উপহার যোগান দিতে গিয়ে যে কঠোর পরিশ্রম করে তাতে তার দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। দৃষ্টিহীনতার কারণে তার অধ্যাপনার চাকরি যায়। আর্থিক বৈষম্য, দৃষ্টিহীনতা ও নারীত্বের অবমাননা বিবাহ বিচ্ছেদের পটভূমি প্রস্তুত করে। উপন্যাসের কাহিনিবৃত্তে রয়েছে একটি প্রতিবন্ধী আশ্রমের কথা। শর্মিলা ও আনন্দ দুজনেই সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে ব্যর্থ হয়ে মানব সেবার মধ্যে জীবনের সার্থকতা খুঁজে নিতে চায়। তারা বিশ্ববন্ধু আশ্রমের সাথে যুক্ত হয়। এরই মধ্যে পরিবারের পক্ষ থেকে শর্মিলার দ্বিতীয় বিয়ের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঘটনাচক্রে আনন্দ ও শর্মিলার পুনর্মিলন ঘটে।

ঔপন্যাসিক শর্মিলার দৃষ্টিকোণে কাহিনিবৃত্তটি বিশ্লেষণ করেছেন। শর্মিলা সুন্দরী ও শিক্ষিতা। সে আর্থিক অনটন অপেক্ষা নারীত্বের অবমাননায় বেশী আহত হয়। আনন্দের কাছে সে যতখানি মনোযোগ প্রত্যাশা করে ততখানি পায় না। সেখান থেকেই তাদের সম্পর্কের টানাপোড়েন শুরু হয়। তার সাথে আর্থিক অনটন নতুন মাত্রা যোগ করে। তবে আনন্দের দিক থেকে দেখলে বিষয়টি একটু অন্যরকম। সে একজন পড়ুয়া ছাত্র এবং কৃতি

অধ্যাপক। জীবনের অধিকাংশ সময় তার বই পড়া এবং বই লেখায় খরচ হয়। সে সাধ্য মতো চেষ্টা করে পরিবারের আর্থিক অভাব দূর করতে। কিন্তু সম্ভ্রান্ত পরিবারে মেয়ে শর্মিলার কাছে তা সামান্য বলে মনে হয়। তবে আনন্দের নির্বিকার স্বভাব, উদাসীনতা ও পড়ালেখার প্রতি একমুখী মনোভাব তাদের মধ্যে ব্যবধান বাড়িয়ে তোলে।

বিশ্ববন্ধু আশ্রমের কর্ণধার হলেন আনন্দের স্কুলের অবসর প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক। এই আশ্রমের উদ্দেশ্য হলো বিকলাঙ্গ ছেলেমেয়েদের পড়ালেখা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার মাধ্যমে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা। এই আশ্রমটি সৃষ্টির পিছনে রয়েছে বিশ্ববন্ধু নামে এক মেধাবী ছাত্রের করুণ আত্মহত্যার কাহিনি। এক দুর্ঘটনায় তার দুটি পা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। একই ঘটনায় তার মায়ের মৃত্যু ঘটে। বাবা মনীশ চেষ্টা করে তার ছেলেকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে। কিন্তু মানসিক অবসাদ থেকে সে আত্মহত্যা করে। মনীশের স্বপ্ন অধরা থেকে যায়। সুইসাইড নোটে তার ছেলে লিখে যায় যে, "এদেশে প্রতিবন্ধীদের বেঁচে থাকার কোনো মানে হয় না।"[৩৩] এই কথাটি মেনে নিতে পারে না মনীশ। সে তার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির বিনিময়ে এই আশ্রমটি গড়ে তোলে। তাই মনে হয় এই আশ্রম গড়ে তোলার পিছনে রয়েছে কিছু মানুষের সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রতিস্পর্ধী শিশুদের লড়াইকে সার্থক করে তোলার বাসনা।

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র আনন্দ সম্ভ্রান্ত পরিবারের যথাযোগ্য উপহারের মূল্য দিতে গিয়ে নিজের দৃষ্টিশক্তি হারায়। দৃষ্টিহীনতার কারণে তার চাকরি যায় এবং অঙ্গহানি বিবাহবিচ্ছেদের যথাযথ কারণ হিসেবে গণ্য হতে পারে তা মনে করেন অনেকে। এই দৃষ্টিভঙ্গি একইসঙ্গে নেতিবাচক এবং প্রগতিশীলতার বিরোধী। বর্তমান সময়ে অনেক দৃষ্টিহীন ব্যক্তি সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত, এই সামাজিক বিবর্তনকে এখানে গুরুত্ব দেননি লেখক। এর কারণ নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নয়, এর মূলে থাকতে পারে

ঔপন্যাসিকের যথাযথ অভিজ্ঞতার অভাব। অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে তথাকথিত পূর্ণাঙ্গ ও বিকলাঙ্গদের এক সঙ্গে এগিয়ে চলাই প্রয়োজন এবং সমাজ সেই লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু এখানে শারীরিক অঙ্গহানি বিবাহ বিচ্ছেদের কারণ হতে পারে এ জাতীয় মনোভাবকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যদিও শেষ পর্যন্ত মানবিকতা জয়ী হয়েছে। শর্মিলা আনন্দের জীবনে ফিরে এসেছে। তাই এই অভিযোগ থেকে লেখককে আমরা নিষ্কৃতি দিতে পারি। এই উপন্যাসে আরো একটি বিষয় লক্ষ্য করার মতো, প্রতিবন্ধী শব্দের পরিবর্তে এখানে বিকলাঙ্গ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে এবং তার বিপরীত শব্দ হিসেবে পূর্ণাঙ্গ শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা গেছে। অক্ষমতাবিদ্যাচর্চার আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, তত্ত্বগতভাবে কোনো মানুষ সর্বাঙ্গসুন্দর হতে পারে না। নিখুঁত দেহ আসলে ঐশ্বরিক দেহ। মানুষের অঙ্গহানি বাস্তব হলেও অক্ষমতা বিষয়টি সামাজিকভাবে আরোপিত। এই উপন্যাসের মূল বিষয়গুলিকে এইভাবে সূত্রাকারে বলা যায় যে -

১। কাহিনি ও উপকাহিনির মধ্যে দিয়ে আর্থিক বৈষম্য, প্রতিবন্ধকতা এবং নারীত্বের অবমাননার সমস্যাকে তুলে ধরা হয়েছে। ঔপন্যাসিক এসবের মধ্যে অন্তর্লীন যোগসূত্রটি আবিষ্কার করতে চেয়েছেন।

২। বিকলাঙ্গের বিপরীত শব্দ হিসেবে লেখক পূর্ণাঙ্গ শব্দটি ব্যবহার করেছেন যা তত্ত্বগতভাবে সমর্থনযোগ্য নয়।

৩। প্রতিবন্ধকতা কখনো-কখনো বিবাহবিচ্ছেদ ও কর্মচ্যুতির কারণ হিসেবে গণ্য হতে পারে বিষয়টি প্রগতিশীলতা ও সমাজতত্ত্বের বিরোধী।

৪.১২ নন্তু সরকার (১৯৫০ খ্রীঃ)

নন্তু সরকারের জন্ম ১৯৫০ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি। ছয়ের দশকে তিনি বাংলা সাহিত্যজগতে প্রবেশ করেন। সরকারি চাকরি করতে-করতে তিনি সাতটি উপন্যাস এবং

দেড়শোটি ছোটোগল্প রচনা করেন। সাহিত্য রচনার পাশাপাশি সঙ্গীত রচনাতেও তিনি দক্ষতা দেখিয়েছেন। এই প্রতিভাবান লেখক দীর্ঘ ছাব্বিশ বছর রক্তদান ও চক্ষুদান আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তার মাতা পদ্মবালা সরকার মরণোত্তর চক্ষুদান করে যান। সামাজিক এবং পারিবারিক সূত্রে লেখক নন্তু সরকার একজন সক্রিয় গণ-আন্দোলনের কর্মী।

আলোক অভিসারে (১৯৯৪ খ্রীঃ): আমাদের আলোচ্য *'আলোক অভিসারে'* উপন্যাসের মুখ্য উপজীব্য হলো কমলা নাম্নি এক দৃষ্টিহীন কন্যার জীবনের উত্তরণের কাহিনি। উপন্যাসটির প্রকাশ কাল ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ। রজনীর একশো বছর পর উক্ত উপন্যাসে লেখক যেভাবে এক দৃষ্টিহীন কন্যার জীবনসংগ্রাম ও উত্তরণের কাহিনি রূপায়িত করেছেন তা একাধারে তার যুগোপযোগী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনের হাতিয়ার।

উপন্যাসের শুরুতে রামধনু দেখার প্রসঙ্গ আছে। গ্রামের ছোটো-ছোটো ছেলে-মেয়েরা যখন রামধনু দেখে তাদের আনন্দ প্রকাশ করছিল তখন কমলাও তার মা কণিকা দেবীর কাছে রামধনু দেখার কৌতূহল প্রকাশ করে।"মা, আমি রামধনু দেখব।"[৩৪] কণিকা দেবী তার কৌতূহল নিরসন করতে না পারায় যন্ত্রণায় কান্নায় ভেঙে পড়ে। সারা উপন্যাসেই দুটো চোখ দিয়ে জীবন ও জগৎকে দেখার আকাঙ্ক্ষা কমলার বয়ানে প্রকাশিত হয়েছে। চক্ষুদানের গুরুত্বকে বোঝাতে লেখক শিল্পের কৌশলে বিষয়টির অবতারণা করেছেন।

একদিন প্রতিবেশী বালক প্রদীপের বিদ্যাচর্চা তাকে উৎসাহিত করে। উপন্যাসের নায়ক অরুণের প্রচেষ্টায় কমলার জীবনের নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। একদিন সে কলকাতায় উচ্চশিক্ষা লাভ করে। কমলা দেখতে সুশ্রী। পড়াশোনায়, গৃহস্থলীর কাজকর্মে এবং শিল্পকর্মে সে নিপুণা। এসব সত্ত্বেও অরুণের বাড়ি থেকে তাকে পাত্রী হিসেবে মেনে নিতে তীব্র আপত্তি জানানো হয়, কারণ তার দৃষ্টিহীনতা। অরুণ পরিবার ও পরিজনদের

আপত্তি সত্ত্বেও তাকে বিয়ে করে সুখী দাম্পত্যজীবন অতিবাহিত করে। এ প্রসঙ্গে অরুণের মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য- "পিতামাতার মনে দুঃখ দেওয়া যেমন অন্যায় তেমনই নিজের আদর্শ বিসর্জন দেওয়াও অন্যায়।"[৩৫] লেখকের সমাজসচেতনতা এখানেই যে, তিনি দেখিয়েছেন চেষ্টা করলে দৃষ্টিহীনরাও পারে। দৃষ্টিহীনতা প্রসঙ্গে যে গ্রামীণ সংস্কার এবং লিঙ্গভিত্তিক মানসিকতার বিরোধিতাও এই উপন্যাসের একটি উল্লেখযোগ্য দিক। কমলার পিতা কালীনাথের দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর জন্য পক্ষান্তরে গ্রাম্য সমাজ কমলার দৃষ্টিহীনতাকে দায়ী করে কিম্বা মেয়ে দৃষ্টিহীন হওয়ার জন্য কণিকা দেবী আত্মীয়-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন লেখক সচেতনভাবে সে বিষয়টি দেখিয়েছেন। "একে কন্যা সন্তান, তাতে অন্ধ, শাশুড়ি, ননদ, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-পড়শি একে-একে সকলেই তেতো-মিষ্টি গঞ্জনা উপহার দিতে থাকল।"[৩৬] তবে পরিস্থিতি বদলেছে। কমলার আন্তরিক প্রচেষ্টা, তার শিক্ষাদীক্ষা তাকে উচ্চ সমাজে স্থান করে দিয়েছে। আবার মেয়ে মাত্রই রান্না করবে ঔপন্যাসিক এই লিঙ্গভিত্তিক মানসিকতারও বিরোধিতা করেছেন। পরিস্থিতি বদলাচ্ছে এবং বদল আসা প্রয়োজন লেখক সে ব্যাপারে দৃঢ়প্রত্যয়ী।

চক্ষুদান আন্দোলনের গুরুত্ব সম্পর্কে বলার তাগিদ থেকেই লেখক এমন এক কাহিনির পরিকল্পনা করেছেন। সে দিক থেকে উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে সাংস্কৃতিক গণ আন্দোলনের হাতিয়ার। *'রজনী'* উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দৃষ্টিহীন কন্যার বিয়ে দিতে পারেননি কিন্তু আজকের প্রেক্ষাপটে ঔপন্যাসিক দৃষ্টিহীনা কমলার সাথে চক্ষুষ্মান অরুণের বিয়ে দিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে এমন একটি ঘটনা ঘটানোর জন্য আমাদের একশো বছর অপেক্ষা করতে হলো। বিয়ের অনেক দিন পর ঘটনাচক্রে কর্ণিয়া প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে কমলার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে যা সম্পূর্ণ বিজ্ঞানভিত্তিক। *রজনীর* একশো বছর পর এই উপন্যাস আমাদের প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গির মূলে কুঠারাঘাত করেছে।

শতাধিক বছর ধরে সৃষ্ট দৃষ্টি প্রতিস্পর্ধীকেন্দ্রিক উপন্যাসে মধ্যে আমাদের আলোচ্য উপন্যাসটি সব চেয়ে বেশি সমাজসচেতনতামূলক। তিনি সাংস্কৃতিক গণ-আন্দোলনের কর্মী বলেই হয়তো এমনটি সম্ভব হয়েছে। সহানুভূতি ও নেতিবাচক ধারণার পরিবর্তে সদর্থক দৃষ্টিকোণে এক দৃষ্টিহীন কন্যার উত্তরণের কাহিনি বলাই লেখকের উদ্দেশ্য। তবে এর মূলে সক্রিয় রয়েছে চক্ষুদান আন্দোলনের প্রভাব। উক্ত উপন্যাসে দৃষ্টিহীনতা সম্পর্কে পরিবেশিত তথ্য ও ধারণাগুলিও সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক। সে দিক থেকে বলা যায় এটি একটি গবেষণাধর্মী উপন্যাস এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রশ্নে লেখক কোনো আপোষ করেননি। অক্ষমতাবিদ্যাচর্চার নিরিখে এই উপন্যাসের মূল কথাগুলি আমারা এইভাবে সূত্রবদ্ধ করতে পারি-

১। দৃষ্টিহীনতা দূরীকরণে কুসংস্কারমুক্ত মানসিকতা গড়ে তোলা প্রয়োজন।

২। সমাজমনস্কতার প্রশ্নে এটি একটি সার্থক সৃষ্টি কারণ উক্ত উপন্যাসে সদর্থক দৃষ্টিকোণে দেখানো হয়েছে যে, চেষ্টা করলে দৃষ্টিহীনরাও পারে।

৩। দৃষ্টিহীনতা লিঙ্গভিত্তিক মানসিকতার মতোই একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যা।

৪.১৩ নীহাররঞ্জন গুপ্ত (১৯১১-১৯৮৬ খ্রীঃ)

১৯১১-১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ নীহাররঞ্জন গুপ্তের সময়কাল। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন তিনি তাঁর শিক্ষা জীবন অতিবাহিত করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন তিনি ডাক্তার হিসেবে সেনাবাহিনীতে কাজ করেন। দেশভাগের পর তিনি স্থায়ীভাবে কলকাতায় চলে আসেন। ছেলেবেলা থেকে তাঁর সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ ছিল। ১৮ বছর বয়সে তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘রাজকুমার’ প্রকাশিত হয়। ইংল্যাণ্ডে থাকা কালীন তিনি রহস্যগল্প সম্বন্ধে অনুরাগী হয়ে পড়েন এবং সেখান থেকে ফিরে তাঁর প্রথম রহস্য উপন্যাস *কালো ভ্রমর* রচনা করেন। বিচিত্র কর্মযোগী এই মানুষটির দীর্ঘ সাহিত্য জীবনের উল্লেখযোগ্য রচনাগুলি হলো,

উল্কা, উত্তর ফাল্গুনী, মায়ামৃগ, কোমলগান্ধার, নিশিপদ্ম ইত্যাদি। বাংলা এবং হিন্দি চলচ্চিত্র জগতেও তিনি সুপরিচিত। তাঁর ৪৫টি উপন্যাসের চিত্ররূপ দেওয়া হয়েছে। *'সবুজ সাহিত্য* নামে একটি ছোটোদের পত্রিকা তিনি সম্পাদনা করেন। তাঁর লেখা দুটি উপন্যাস *লালুভুলু ও বাদশা* একত্রে গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ২০১২ সালে। আমাদের আলোচ্য *লালুভুলু* উপন্যাসটি এক দৈনিক পত্রের পাতায় সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ছোটোদের বিভাগে। উক্ত উপন্যাসের প্রধান দুই কিশোর চরিত্র লালু অস্থিপ্রতিবন্ধকতার শিকার আর ভুলু দৃষ্টিহীন। ছোটোদের বিভাগে প্রকাশিত হলেও দুটি কিশোর চরিত্রের উপস্থাপন এবং লেখকের সমাজমনস্কতা আমাদের মতো পূর্ণবয়স্ক পাঠকদেরও আলোড়িত করে।

লালুভুলু (২০১২ খ্রীঃ): দেশ বিভাগের বিপর্যায়ে দৃষ্টিহীন ভুলু সমাজ ও পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এসে পড়েছে কলকাতা শহরে। লালুও ঘটনাচক্রে পরিবার হারিয়ে কলকাতায় আশ্রয় নিয়েছে। এই দুটি কিশোরের বন্ধুত্ব এবং তাদের আত্মমর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার লড়াই লেখক বিশ্বস্ততার সাথে চিত্রিত করেছেন। সহায়সম্বলহীন দুই কিশোর মাউথঅর্গান বাজিয়ে ও শিস দিয়ে অর্থোপার্জন করে কিন্তু তারা একে ভিক্ষাবৃত্তি বলে না, বলে উপার্জন। "খোঁড়া লালু বাজায় মাউথঅর্গান আর তার সঙ্গে সঙ্গে চমৎকার সুর মিলিয়ে শিস দেয় অন্ধ ভুলু বাঁশি ও শিসের অপূর্ব ঐকতান। এমনি করেই ওরা এ অঞ্চলের চারিদিকে এদিকে শিয়ালদা স্টেশন অন্যদিকে বৌবাজার ও কলেজস্ট্রিট পর্যন্ত মাউথঅর্গান ও শিসের ঐকতান শুনিয়ে রোজগার করে বেড়ায়। অন্য আর দশ জন গৃহহীন পথচারীর মত ব্যাপারটাকে ওরা ভিক্ষা করা বলে না, বলে উপার্জন।"[৩৭] উপন্যাসে সহানুভূতির পরিবর্তে বড়ো হয়ে উঠেছে এদের উত্তরণের কাহিনী।

ফুটপাতের আশ্রয় ছেড়ে ক্রমশ তারা বস্তিজীবনের আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু সেই বস্তিজীবনের সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্তি রাস্তা খুঁজতে থাকে। অধ্যায়নশীল লালু স্কুলে ভর্তি হয়

এবং প্রমাণ করে দেয় মানুষের মেধা কোনো সামাজিক বা পারিবারিক অবস্থা কিম্বা অঙ্গবৈকল্যের ওপর নির্ভর করে না। লালুর এই উত্তরণের পথে সব চেয়ে বড়ো প্রেরণা তার বন্ধু ভুলু। সে গান গেয়ে অর্থোপার্জন করে লালুর পড়াশোনার খরচ যোগায় এবং তার বড়ো হওয়ার মধ্যে দিয়ে নিজের স্বপ্ন ও আদর্শের সার্থকতা খুঁজে পায়। মানুষের মানবিক বোধ যে কোনো অঙ্গবৈকল্যের ওপর নির্ভর করে না ভুলুর চরিত্রের মধ্যে দিয়ে লেখক সেই সত্যকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারা যাকে বন্ধু বলে মনে করে সেই রাজপুত্রের উদ্দেশ্যে বলে, "তোমাকে মাঝেমধ্যে এসে আমরা বাজনা শুনিয়ে যাব, কিছু চাই না।[৩৮]" সমাজ যাদের প্রতিবন্ধী বলে আলাদা করে রাখে তারাও যে সমাজের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে সক্ষম ভুলু তারই প্রমাণ। বস্তিজীবনের প্রতি ঘৃণা এবং বড়ো হওয়ার নেশায় একদিন লালু ভুলুকে ত্যাগ করে কিন্তু ভুলু তার আদর্শ থেকে এক পাও নড়ে না। সে আড়াল থেকে লালুকে সাহায্য করে যায়। তার পরীক্ষার বেতন জমা দিয়ে আসে। তার গানের দক্ষতা তাকে একদিন রাস্তার গায়ক থেকে রেকর্ড কোম্পানির শিল্পী করে তোলে।

উপন্যাসের শেষে রোগশয্যায় শায়িত মৃতপ্রায় ভুলুর পাশে লালু দাঁড়ায়। ভুলুর হারিয়ে যাওয়া দিদি তার কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। কিন্তু সব কিছুর মধ্যে জারি থাকে তাদের দুই বন্ধুর মানুষ হয়ে ওঠার ঘোষণা। সমরেশ বসুর 'মহাযুদ্ধের পরে' গল্পে তিনটি দৃষ্টিহীন চরিত্র সমাজ ও পরিবারহীন না মানুষ হিসেবে চিত্রিত। তাদের মানুষ হয়ে ওঠার কোনো সম্ভাবনা লেখক খুঁজে পান নি। কিন্তু উক্ত উপন্যাসে লেখক দুই কিশোরের মানুষ হয়ে ওঠার গল্প বলেছেন। আত্মমর্যাদা বোধ এবং লড়াকু মানসিকতা শেষ পর্যন্ত তাদের মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। লেখক প্রতিস্পর্ধী দুই কিশোরের সামাজিক ও পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা থেকে বৃহত্তর সমাজের দিকে যাত্রার ইঙ্গিত দিয়েছেন।

প্রতিস্পর্ধীকেন্দ্রিক উপন্যাসের স্রষ্টা হিসেবে লেখকের সার্থকতা এখানেই। এই উপন্যাস থেকে প্রাপ্ত মূল ধারণাগুলি হল-

১। সামাজিক ও পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা থেকে বৃহত্তর সমাজের দিকে যাত্রার ইঙ্গিত আছে।

২। মানুষের মানবিকতা কোনো অবস্থা বা অঙ্গবৈকল্যের ওপর নির্ভর করে না উপন্যাসে এই ধারণাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৩। দয়া বা সহানুভূতি নয় সম্মান ও মর্যাদা বোধই মানুষকে উত্তরণের দিকে নিয়ে যায় এই ধারণাটিও উপন্যাসে সুপ্রতিষ্ঠিত।

৪। সঙ্গীত দক্ষতা ও প্রতিবন্ধকতার প্রসঙ্গ আছে।

৫। উক্ত উপন্যাসে লেখকের দায়বদ্ধতা বা সমাজমনস্কতা হয়ে উঠেছে সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই এর সাংস্কৃতিক হাতিয়ার।

৪.১৪ সমীর রক্ষিত

এ কালের একজন অন্যতম কথাকার সমির রক্ষিত। তার প্রথম ছোটোগল্প 'খর্গ' প্রকাশের পর নিজ প্রতিভা গুণে তিনি পাঠক সমাজে স্থান করে নিয়েছেন। অন্যান্য ছোটোগল্পের মধ্যে *বন্যার পরে বাড়ি ফেরা, স্টেশনে দাঁড়িয়ে,* উল্লেখযোগ্য রচনা। *স্বপ্নের স্বাধীনতা, সোনার গম্বুজ, মানবী,* তার উপন্যাসগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য। সমাজবাস্তবতা এবং সমকালীনতা তার সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তার রচিত *রোম প্রবাসে, শীতবসন্ত, ফিনল্যাণ্ড ভ্রমণ* গ্রন্থগুলি বাংলা ভ্রমণসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সম্পদ। আমাদের আলোচ্য উপন্যাসটি ২০১৬ সালের কলকাতা বইমেলাই প্রথম প্রকাশিত হয়।

অন্ধ-জন্মান্ধদের কথা অথবা একটি প্রেমের উপাখ্যান (২০১৬ খ্রীঃ): উপন্যাসে লেখক চটকলের শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে সংঘাতের আবহে মানুষের জীবনচিত্র চিত্রিত করেছেন। আমাদের আলোচ্য দৃষ্টিপ্রতিস্পর্ধী চরিত্র হলো পবন আর তার সঙ্গিনী ফুলিয়া

অস্থিপ্রতিবন্ধকতার শিকার। ফুলিয়ার এক পায়ের পাতা জন্ম থেকে মোড়া। আর পবন পুলিশের অত্যাচারের শিকার হয়ে দুচোখের দৃষ্টি হারিয়েছে। ঔপন্যাসিক অন্ধ কথাটি এখানে প্রতীকী অর্থে ব্যবহার করেছেন। আমাদের সমাজে কেউ কামে, কেউ প্রেমে আবার কেউ ক্ষমতায় অন্ধ হয়ে আছে। তবে সব যুগে শাসকদের চরিত্র একই রকম। শোষণের ধরন বদলেছে মাত্র। কিন্তু শাসকের চরিত্র বদলায়নি। তারা সকলেই জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মতো ক্ষমতায়, স্নেহে আর স্বার্থসিদ্ধিতে চির- অন্ধ।

অত্যাচারে তার শিশুপুত্র পবন দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছে। শেষ পর্যন্ত পরাণ ভট্টাচার্যকে ও পুলিসের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছে। পবনের মা মালতী প্রেমে আর কামনায় অন্ধ। একদিন সে পুরোনো প্রেমিকের মোহে পরিবার ছেড়ে পালিয়েছিল। "সোনা খোরকের সেই তরুণ কমল গরাইয়ের জন্য মালতী এতটাই অন্ধ হয়েছিল? হয়েছিল। সে খুব গোপন কথা। মালতীর শরীর জানে।"[৩৯] কিন্তু মোহভঙ্গ হলে আবার ফিরে আসে। ততদিনে পবনের দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছে আর তার স্বামীর মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু শাসককুলের ক্ষমতা আর লোভের মোহ ফুরোয় না। মানুষকে তারা প্রতিদিন শোষণ করে চলেছে। "এই কলকারখানা, জমিজমা, নদীজল স্টিমার নৌকা, সব কিছুর রাজা আছে রে ছেলে। অনেক রাজা, পরাণের কথায় অনেক রাজা তবে সবার একটাই ধাত, সে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের।"[৪০]

খ্যাপা বৈরাগীও একদিন শ্রমিক আন্দোলন করতে গিয়ে নিজের দৃষ্টি হারিয়েছিল। তার কাজ গেছে। কিন্তু সে হারমোনিয়ামে সুর তুলে দরাজ গলায় বিদ্রোহের গান গায়। লেখক দেখিয়েছেন দৃষ্টিহীন পবন তার উত্তরাধিকার বহন করে চলেছে। "এরপর শুধু পবন ক্ষ্যাপার ঝোপরিতে প্রবেশ করে না, তা তার নিজের এখন। নিজের হারমোনিয়ামটা টেনে বের করে নেয়, তখনও ফুলিয়া তাকে স্পর্শ করেই থাকে। তারপর পবন তার গান ধর।"[৪১]

বিদ্রোহিনী ফুলিয়া নিজের প্রেম ও কর্তব্যে অনড়। সে কোনো অবস্থাতেই নিজের বাল্যসাথী পবনকে ত্যাগ করবে না।

শ্রমিক আন্দোলনের প্রেক্ষিতে লেখক যেভাবে মানুষের বেঁচে থাকার লড়াই ও জীবনপিপাসাকে চিত্রিত করেছেন তা প্রশংসার দাবি রাখে। তবে দৃষ্টিহীন ব্যক্তিরাই শুধু মাত্র অন্ধ নয়, লোভে, কামে ও ক্ষমতায় সমাজের নানাস্তরের মানুষ যে কীভাবে অন্ধ হয়ে আছে লেখকের এই ধারণাটি প্রতিষ্ঠা করে যে, দৃষ্টিহীনতা শুধুমাত্র শারীরিক সমস্যা না থেকে হয়ে উঠেছে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যা তাই বলা যায় যে তিনি দৃষ্টিহীনতা সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করেছেন। সেদিক থেকে তার এই উপন্যাসটি সমাজমনস্কতার পরিচায়ক। এই উপন্যাস থেকে প্রাপ্ত ধারণাগুলি হলো-

১। দৃষ্টিহীনতা শুধুমাত্র একটি শারীরিক সমস্যা নয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যা।

২। দৃষ্টিহীনতা ও সঙ্গীতবিদ্যায় অধিকারের মিথ ব্যবহার করা হয়েছে।

৩। শ্রমিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপট ও অন্ধ শব্দের ব্যখ্যানে তীব্র সমাজমনস্কতার পরিচয় আছে।

৪.১৫ বাংলা উপন্যাসে প্রতিস্পর্ধীদের উত্তরাধিকার

ঔপন্যাসিক নির্দিষ্ট দেশ কাল ও সমাজের পটভূমিতে নিজস্ব দৃষ্টিকোণে নানান চরিত্রকে আমাদের সামনে হাজির করেন। তাই, সমাজ ও দেশ কালের পটভূমি ও সাহিত্যকারের দৃষ্টিভঙ্গি উপন্যাস সাহিত্যের দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আমরা বাংলা সাহিত্যে দৃষ্টিহীন চরিত্র সন্ধান করতে গিয়ে বেশ কিছু চরিত্রের সন্ধান পেয়েছি। যদিও বিষয়টি খড়ের গাদায় সূঁচ খোঁজার মতো একটি দুঃসাধ্য ব্যাপার। তবু আমরা সাধ্য মতো চেষ্টা করেছি এবং কিয়দংশে সফল হয়েছি। প্রখ্যাত লেখকদের অনেকেই নানান ধরনের প্রতিস্পর্ধীকেন্দ্রিক গল্প-উপন্যাস রচনা করেছেন। তবে দৃষ্টিহীন চরিত্র তুলনায় নগণ্য। আমরা এগারোটি এ জাতীয় উপন্যাস

বিশ্লেষণ করে তাদের সামাজিক ও সাহিত্যিক অবস্থান নির্ধারণের চেষ্টা করেছি। প্রসঙ্গত অক্ষমতাবিদ্যাচর্চার নিরিখে লেখকদের সমাজমনস্কতার বিষয়টি বিচার-বিশ্লেষণ করেছি।

উপন্যাস সাহিত্যের প্রথম যুগে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *রজনী* প্রথম প্রতিস্পর্ধীকেন্দ্রিক সাহিত্য ভাবনার নিদর্শন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দৃষ্টিহীনা রজনীর তীব্র ইন্দ্রিয় সচেতন অনুভূতির জগৎ, সামাজিক ও পারিবারিক বিচ্ছিন্নতার বিষয়টি সহৃদয়ভাবে চিত্রিত করেছেন। লিঙ্গগত কারণে নারী এবং শারীরিক প্রতিবন্ধকতা থাকার জন্য সে নানাভাবে শোষণ ও বঞ্চনার শিকার হয়েছে। শেষ পর্যন্ত তার আর্থিক অবস্থানের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক অবস্থানের পরিবর্তন ঘটেছে। যদিও সে সময়ের পক্ষে এ জাতীয় নির্মাণ যথেষ্ট প্রগতিশীলতার পরিচয় বহন করে। কিন্তু রজনীর শুভদৃষ্টি প্রসঙ্গে অলৌকিক সন্ন্যাসীর সাহায্যে রজনীর দৃষ্টি পুনরুদ্ধারের বিষয়টি রক্ষণশীলতাকেই মনে করিয়ে দেয়।

পরবর্তীকালে কেউ-কেউ বিপরীত পথে যাত্রা করেছেন। অনুরূপা দেবীর *মহানিশা* উপন্যাসের ধীরা চরিত্রটি তার নিদর্শন। ধীরা বিত্তশালী পরিবারের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও সামাজিক ও পারিবারিকভাবে বিচ্ছিন্ন। শেষ পর্যন্ত সে জীবন যুদ্ধে পরাজিতা। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *কান্না* ও *ভুবনপুরের হাট* উপন্যাসের জন ও নবঠাকুর আকস্মিকভাবে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। লেখক এখানে দৃষ্টিহীনতা ও সঙ্গীতবিদ্যার প্রচলিত মিথকে ব্যবহার করেছেন। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের *তৃতীয় নয়ন* উপন্যাসে মিহির চরিত্রটি হয়ে উঠেছে শেষ পর্যন্ত প্রতীকী। মানুষের পরনির্ভরতার নামই তৃতীয় নয়ন লেখক মন একটি দার্শনিক চিন্তার দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। এখানেও সামাজিক ও পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা এবং দৃষ্টিহীনতা ও স্বাভাবিকতার প্রসঙ্গ আছে।

বিমল কর তার *পূর্ণ অপূর্ণ* উপন্যাসে দৃষ্টিহীনতা বনাম স্বাভাবিকতার প্রশ্নটি উত্থাপন করেছেন। নন্তু সরকারের *আলোক অভিসারে* উপন্যাসটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী রচনা। লেখক তীব্র সমাজমনস্কতা দেখিয়েছেন দৃষ্টিহীনা কমলা চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে। কমলা শেষ পর্যন্ত বিচ্ছিন্নতা থেকে বৃহত্তর সমাজের অংশীদার হয়ে উঠেছে। দয়া বা সহানুভূতি নয়, মানবতা এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির চর্চা শেষ পর্যন্ত মানুষকে উত্তরণের পথে নিয়ে যায় লেখক সচেতনভাবে সে কথা প্রতিষ্ঠা করেছেন। সমির রক্ষিতের *অন্ধজন্মান্ধদের কথা অথবা একটি প্রেমের উপাখ্যান* নামক উপন্যাসটি একটি প্রতীকধর্মী সাহিত্য। শ্রমিক আন্দোলনের প্রেক্ষিতে তিনি শাসককুলের বর্বরতাকে জন্মান্ধতার সঙ্গে তুলনা করেছেন। দৃষ্টিহীন পবন চরিত্রে তিনি উত্তরণের পরিবর্তে সঙ্গীতবিদ্যা ও ভিক্ষাবৃত্তির উত্তরাধিকারকে দেখিয়েছেন।

৫.১৬ উপসংহার

আমরা বাংলা উপন্যাসে দৃষ্টিহীন চরিত্রগুলি পর্যালোচনা করে নির্দিষ্ট কতগুলি লক্ষণ চিহ্নিত করেছি। উক্ত লক্ষণগুলি চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে অক্ষমতাবিদ্যাচর্চার সমাজতাত্ত্বিক ও বৈজ্ঞানিক সূত্রগুলির সাহায্য নিয়েছি। আমাদের পঠন পাঠন ও বিশ্লেষণ থেকে প্রাপ্ত সিদ্ধান্তগুলি হল -

১। অধিকাংশ উপন্যাসে দৃষ্টিহীনদের আর্থসামাজিক বিবর্তনের বিষয়টি ধরা পড়েনি। দুএকটি জায়গায় ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা গেছে।

২। অধিকাংশ উপন্যাসে সামাজিক ও পারিবারিক বিচ্ছিন্নতার ছবি আছে। কিন্তু উত্তরণে ছবি নগণ্য।

৩। দৃষ্টিহীনতা ও স্বাভাবিকতার প্রশ্নটি অনেকেই তুলেছেন, বিষয়টি লেখকদের সমাজমনস্কতাকে নির্দেশ করে।

৪। অনেক উপন্যাসে দৃষ্টিহীন ব্যক্তির তীব্র ইন্দ্রিয় সচেতনতার প্রসঙ্গ আছে যা কিয়দাংশে অতিরঞ্জন হলেও বহুলাংশে বিজ্ঞানসম্মত।

৫। লেখকরা অনেক ক্ষেত্রেই দৃষ্টিহীনতা ও সঙ্গীতবিদ্যার মিথকে ব্যবহার করেছেন যা বিজ্ঞান দ্বারা সমর্থিত নয়।

৬। দৃষ্টিহীনতা বহুক্ষেত্রে হয়ে উঠেছে তথাকথিত সক্ষম ব্যক্তিদের দ্বারা অক্ষম ব্যক্তিদের শোষণ ও বঞ্চনার মাধ্যম। এখানেও লেখকদের সমাজমনস্কতা লক্ষ্য করা গেছে।

৭। কোনো কোনো উপন্যাসে জীবনসংগ্রাম বা উত্তরণে পথ সন্ধান অপেক্ষা দয়া ও সহানুভূতি গুরুত্ব পেয়েছে।

৮। কোনো কোনো ঔপন্যাসিক সামাজিক দায়বদ্ধতার পরিবর্তে দৃষ্টিহীনতাকে ব্যবহার করেছেন নানা বিষয়ের প্রতীকী ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে।

তথ্যসূত্র

১। চৌধুরী, নাজমা জেসমীন। বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি। চিরায়ত প্রকাশনী: কলকাতা, ১৯৮৩। পৃ. ১৭।

২। চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল। *সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ।* রত্নাবলী: কলকাতা, ১৯৯৫। পৃ. ১৪১।

৩। বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার। *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত।* মডার্ন বুক এজেন্সি প্রা. লি.: কলকাতা, ১৯৬৬। পৃ. ৩৭৭।

৪। বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার। *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা,* মডার্ণ বুক এজেন্সী: কলকাতা, ২০১৯-২০২০। পৃ. ৩৮।

৫। পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮।

৬। মজুমদার, মোহিতলাল। *বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ও বঙ্কিম বরণ,* করুণা প্রকাশনী: কলকাতা, ২০০৫। পৃ. ১৪।

৭। ভট্টাচার্য, ফাল্গুনী। *'সাহিত্য ও সিনেমায় প্রতিবন্ধী*, পরম্পরা: কলকাতা, ২০১১। পৃ. ৩৫।

৮। চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম। *বঙ্কিম রচনাবলী* (১ম খণ্ড, সমগ্র উপন্যাস)। কামিনী প্রকাশালয়: কলকাতা, ১৯৯১। পৃ. ১।

৯। পূর্বোক্ত, পৃ. ১।

১০। *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা,* পূর্বোক্ত পৃ. ৬৪।

১১। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৩।

১২। গুপ্ত, ক্ষেত্র। *বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস* (৩য় খণ্ড), গ্রন্থনিলয়: কলকাতা। পৃ. ২৫৩।

১৩। *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা ,* পূর্বোক্ত পৃ. ১৭১।

১৪। *বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস* (৩য় খণ্ড), পূর্বোক্ত পৃ. ২৫৩।

১৫। *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা ,* পূর্বোক্ত পৃ. ১৭২।

১৬। পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৪০।

১৭। পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৫।

১৮। সেনগুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার। রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, *তৃতীয় নয়ন,* গ্রন্থালয় প্রা. লি.: কলকাতা, ১৯৭৭। পৃ. ২৬৩।

১৯। *'সাহিত্য ও সিনেমায় প্রতিবন্ধী*, পূর্বোক্ত পৃ. ৪৬।

২০। পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬।

২১। বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, পূর্বোক্ত পৃ. ৪৯৮।

২২। পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯৮।

২৩। বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর। রচনাবলী, অষ্টম খণ্ড, কান্না। কলকাতা: মিত্র ঘোষ। পৃ. ৩০১।

২৪। *সাহিত্য ও সিনেমায় প্রতিবন্ধী*, পূর্বোক্ত পৃ. ৪২।

২৫। *তারাশঙ্কর রচনাবলী,* অষ্টম খণ্ড, কান্না, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০১।

২৬। পূর্বোক্ত, গ্রন্থপরিচয় পৃ. ৩০০।

২৭। তারাশঙ্কর রচনাবলী, অষ্টম খণ্ড, কান্না, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৩।

২৮। *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত,* পূর্বোক্ত পৃ. ৫৪৬।

২৯। *সাহিত্য ও সিনেমায় প্রতিবন্ধী,* পূর্বোক্ত পৃ. ৫৪।

৩০। কর, বিমল। *পূর্ণ অপূর্ণ,* আনন্দ পাবলিশার্স : কলকাতা । ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১২০।

৩১। মিত্র বিমল। *রচনাবলী, শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন।* মিত্র ঘোষ পাবলিশার্স: কলকাতা। ১৪১৯ বঙ্গাব্দ। পৃ. ১।

৩২। পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৮।

৩৩। সান্যাল, নারায়ণ। *নিলীমায় নীল,* দেজ পাবলিশিং: কলকাতা। ২০১৮ পৃ. ৫৯।

৩৪। সরকার, নন্তু। আলোক অভিসারে,তরুণ প্রেস: কলকাতা, ১৯৯৪। পৃ. ১।

৩৫। পূর্বোক্ত,পৃ. ৭৮।

৩৬। পূর্বোক্ত, পৃ. ১।

৩৭। গুপ্ত, নীহাররঞ্জন। *লালুভুলুও বাদশা,* মিত্র ঘোষ পাবলিশার্স: কলকাতা। ১৪১৮ বঙ্গাব্দ। পৃ. ১

৩৮। পূর্বোক্ত, পৃ. ১।

৩৯। রক্ষিত, সমীর। *অন্ধ জন্মান্ধদের কথা অথবা একটি প্রেমের উপাখ্যান,* কলকাতা: একুশ শতক। ২০১৬। পৃ. ৫৭।

৪০। পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯।

৪১। পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩।

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলা ছোটগল্পে দৃষ্টিহীনদের চর্চা ও অবস্থান

৫.১ সূচনা

কথাসাহিত্যের আলোচনায় উপন্যাসের পরেই আসে ছোটগল্পের কথা। সংরূপগত দিক থেকে কনিষ্ঠতম হওয়া সত্ত্বেও বাংলা ছোটগল্প স্বল্পকালের মধ্যে প্রশ্নাতীত সাফল্য ও পাঠককুলের সমাদর লাভ করেছে। বিচিত্র জীবনরস, দর্শনচিন্তা, সমাজভাবনা সব কিছুকেই সে আপন করে নিয়েছে। শতাধিক বছরের ইতিহাসে নানা রসের ছোটগল্প লেখা হলেও বারবার বাস্তবতা ও আধুনিক জীবনসমস্যা সেখানে প্রকট হয়ে উঠেছে। আমরা শতাধিক বছরের বাংলা ছোটগল্পের ভাণ্ডারটি অনুসন্ধান করে দৃষ্টিহীন চরিত্র আছে এ জাতীয় সৃষ্টিগুলিকে চিহ্নিত ও তালিকাবদ্ধ করেছি এবং পারিবারিক সমস্যা ও তাদের ইন্দ্রিয় সচেতন অনুভূতির জগৎ অধিকাংশ গল্পে গুরুত্ব পেয়েছে। কিন্তু শিক্ষা ও কর্মজগতে দৃষ্টি প্রতিস্পর্ধীদের সামাজিক মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের বিষয়টি উপেক্ষিত। অথচ বিগত দু'শো বছরে এদের শিক্ষা ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে বেশ কিছু সদর্থক পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। এর ফলে আজ শিক্ষা ও কর্মজগতে দৃষ্টিহীনেরা দৃষ্টিমানদের সঙ্গে এক আসনে বসার সুযোগ লাভ করেছে। এর মূলে আছে কিছু দরদী মানুষ এবং দৃষ্টিহীনদের সংগ্রামের ইতিহাস। ইতিহাসের এই প্রেক্ষাপটটি সমাজ ও সাহিত্যে গৌরবের আসন লাভ করতে পারে।

আমরা অক্ষমতাবিদ্যাচর্চার নিরিখে বাংলা ছোটগল্পে দৃষ্টিহীনদের সামাজিক এবং সাহিত্যিক অবস্থানটি নির্ধারণের চেষ্টা করব। প্রসঙ্গত এ জাতীয় চরিত্র চিত্রণের ক্ষেত্রে

লেখকের সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রশ্নটি বিচার-বিশ্লেষণ করা হবে। বাংলা ছোটগল্প পর্যালোচনার ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে তার শিল্প রূপের দিকটিও আমাদের কাছে বিচার্য।

৫.২ ছোটগল্পের উদ্ভব ও বিকাশ

মানুষের গল্প বলা ও শোনার রেওয়াজ প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। তবে স্বতন্ত্র্য সাহিত্য সংরূপ হিসেবে ছোটগল্পের স্থায়ী স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা আধুনিক যুগের ঘটনা।[১] কিন্তু প্রাচীন ও মধ্যযুগের গদ্য পদ্য নানা আখ্যানের মধ্যে ছোটগল্পের বীজ নিহিত ছিল। রূপকথা, উপকথা ও নীতিকথাগুলি সব দেশের সব ভাষায় অন্যতম সাহিত্য সম্পদ। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ধর্মগুরুরা লোকশিক্ষা দেওয়ার জন্য নানান গল্পকথার সাহায্য নিতেন, বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেণ্ট এবং নিউ টেস্টামেণ্ট নীতিকথাগুলি তার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। প্রসঙ্গত বুদ্ধের জাতকের গল্পের সংকলনটি সবিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। ঈশপের *Fable* এবং সোরের *ক্যাণ্টাবেরি টেলস* গল্প সংকলনগুলি পাশ্চাত্যের জনপ্রিয়তা লাভ করে। ঈশপের গল্প অনুসরণে বিদ্যাসাগর *কথামালা* রচনা করেন, গদ্যসাহিত্যের প্রথম যুগের এটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

পাশ্চাত্য দেশের মতো প্রাচ্যের দেশগুলিতে নানান ধরণের গল্পকথা জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলো। ষষ্ঠ শতক নাগাদ ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্যে *পঞ্চতন্ত্র* নামক এক গল্পমালা সংকলিত হয়, যা পরবর্তীকালে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে *হিতোপদেশ, দশকুমারচরিত* ও *কাদম্বরীর* মতো গদ্য আখ্যায়িকার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। দশম থেকে দ্বাদশ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে *আরব্য রজনী* নামে গল্প সংকলনটি মিশর ও পারস্যের প্রভূত জনপ্রিয়তা লাভ করে। চতুর্দশ শতকে ইতালীয় কবি ও লেখক বোকাচ্চিও 'ডেকামেরন' গল্প সংকলনটি রচনা করেন।[২] এই সংকলনে মোট ২০০টি গল্প সংকলিত হয়। বোকাচ্চিও এই সংকলনটি আধুনিক ছোটগল্প আন্দোলনে দিক চিহ্ন রূপে গণ্য

হয়েছিল। বোকাচ্চিওর প্রভাবে ফ্রান্স ও ইতালীতে 'novelle' বা 'novella' জন্ম হয়।[৩] এ প্রসঙ্গে ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত নোভেলাস '*এজেম প্লেয়ার্স*' গল্প সংকলনটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হিসাবে গণ্য হতে পারে। এরপর প্রায় ২০০ বছর ইউরোপীয় সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য কোনো গল্প সংকলন রচিত হয়নি। উনিশ শতকে রোম্যান্টিক আন্দোলনের যুগে ছোটগল্পের নবজন্ম হয় ফ্রান্স, রাশিয়া ও আমেরিকাতে। ছোটগল্পকে স্থায়ী সাহিত্য সংরূপ রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

ছোটগল্পের শিল্পরূপটি পাকাপাকিভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে সদ্য অতিক্রান্ত বিশ শতকে, ১৯৩৩ সালে Oxford কোষগ্রন্থ "Short Story" সংকলিত হয় ১৮৩০-১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ আমেরিকায় এডগার্ড এলানপো, রাশিয়ায় নিকোলায় গোগল, তুর্গেনেব প্রমুখ লেখকদের কলমে ছোটগল্প নবজন্ম লাভ করে।[৪] নিকোলায় গোগল প্রথম সাধারণ মানুষদের নিয়ে গল্প লিখেছিলেন। কিন্তু তার গল্পগুলি আবেগের গভীরতায় রূপ নির্মীতিতে ছিল অসাধারণ। তার বিখ্যাত গল্প 'দ্যা ওভার কোর্ট' সম্পর্কে তুর্গেনেব মন্তব্য করেছিলেন, "আমরা সকলে বেড়িয়েছিলাম গোগলের ওভার কোর্টের নীচ থেকে।[৫] তার "A sports man catches" সংকলনটি প্রকাশিত হয় ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে। গোগল ও তুর্গেনেব যোগ্য উত্তরাধিকারী অ্যান্টন চেকব এবং টলস্টয়, বালজ্যাক, গোতিয়ে প্রমুখ লেখকদের হাত ধরে ছোটগল্প শিল্প সিদ্ধির চরম সীমায় পৌঁছেছে। মোপাসা প্যারিসের এক উন্মাদ আশ্রমে অকাল মৃত্যুর পূর্বে ছোটগল্পকার রূপে নিজেকে সন্দেহাতীত ভাবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এইভাবে নানান গল্পকারের হাত ধরে আধুনিক ছোটগল্প আন্দোলন পরিণত শিল্পরূপ লাভ করেছে, বিগত ১৫০ বছরে নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এবং জনপ্রিয়তায় গদ্য সাহিত্যের এই কনিষ্ঠ শিল্পরূপটি সিদ্ধি ও বিকাশের চরম সীমা স্পর্শ করেছে।

৫.৩ বাংলা ছোটগল্পের ক্রমবিকাশ

বাংলা ছোটগল্পের প্রথম সার্থক স্রষ্টা ও সিদ্ধিদাতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৮৯১ সাল নাগাদ তিনি বাংলাদেশের শিলাইদহে জমিদারীর কাজ দেখাশোনার জন্য কিছুদিন বাস করেছিলেন। এই সময় পদ্মা তীরবর্তী মানুষের জীবন ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তিনি গদ্য কাহিনির মধ্যে ফুটিয়ে তোলেন। ইউরোপীয় সাহিত্য ও সংস্কৃত সাহিত্যে অসামান্য ব্যুৎপত্তি এবং তার কবিধর্ম অচিরেই বাংলা ছোটগল্প রচনায় তাকে সিদ্ধি এনে দেয়। সাধারণভাবে মনে করা হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতিকবি ছিলেন বলে ছোটগল্প রচনায় এমন সিদ্ধি ও সাফল্য লাভ করেছিলেন।[৬] সংরূপগত দিক থেকে ছোটগল্পের সাথে গীতিকবিতার গভীর সম্পর্কটি সাহিত্য সমালোচকদের অনেকেই স্বীকার করেছেন। *সাধনা* (১২৯৮), *ভারতী* (১২৮৪), *হিতবাদী* (১২৯৮) ইত্যাদি পত্রপত্রিকায় তার ছোটগল্পগুলি প্রথম প্রকাশিত হয়। নানান পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত গল্পগুলি পরবর্তীকালে *গল্পগুচ্ছ* নামে তিন খণ্ডে সংকলিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কালে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৮-১৯৩৮ খ্রীঃ), প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২ খ্রীঃ) প্রমুখ লেখকরা ছোটগল্প রচনার ক্ষেত্রে মৌলিক প্রতিভা ও দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। ১৯১৪ সালে প্রকাশিত *সবুজপত্র* পত্রিকাকে কেন্দ্র করে প্রমথ চৌধুরী এবং তার শিষ্যবর্গ বাংলার ছোটগল্প আন্দোলনকে নতুন মাত্রা দান করেন। ১৯২৩ সালে প্রকাশিত *কল্লোল* পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যে কল্লোল গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল তাদের অনেকে বাংলা ছোটগল্প রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এদের মধ্যে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৮৬ খ্রীঃ), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮ খ্রীঃ), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১ খ্রীঃ) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। ১৯৩০-৪০ সাল নাগাদ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা ছোটগল্প আন্দোলনের অন্যতম হোতা রূপে নিজেদের প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। রবীন্দ্র পরবর্তীকালে

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়-এর (১৯০১-১৯৭৬ খ্রীঃ) *কয়লা কুঠি,* মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর (১৯১০-১৯৫৬ খ্রীঃ) *প্রাগৈতিহাসিক* (১৯৩৭ খ্রীঃ) ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর (১৮৯৪-১৯৫০ খ্রীঃ) *মৌরীফুল (১৩৩৯)* গল্প সংকলনগুলি বাংলা ছোটগল্প আন্দোলনকে নতুন পথে পরিচালিত করে। পঞ্চাশের দশক ও তার পরবর্তীকালে বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭৯ খ্রীঃ), বিমল কর (১৯২১-২০০৩ খ্রীঃ), জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী (১৯১২-১৯৮৩ খ্রীঃ) বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা ছোটগল্প আন্দোলনের ইতিহাসে অন্যতম নাম। এভাবে ১৮৯১ সাল থেকে শুরু করে পরবর্তী একশো বছরে বাংলা ছোটগল্প সাহিত্যের প্রাঙ্গণে গৌরবময় মর্যাদার আসন লাভ করেছে। একশো বছরের নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা বাংলা ছোটগল্পকে আন্তর্জাতিক সিদ্ধি ও সাফল্য এনে দিয়েছে।

৫.৪ ছোটগল্পের সংজ্ঞা ও স্বরূপ

সাহিত্যের (রূপ-রীতির) আলোচনায় যে কোনো সাহিত্য সংরূপের সংজ্ঞা নির্ধারণ অত্যন্ত দুরূহ কাজ। বাংলা ছোটগল্পের সংজ্ঞা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এই কাজ দুরূহতর। আধুনিক ছোটগল্পের জনক এডগার অ্যালানপোর মতে, ছোটগল্প হলো এমন এক আখ্যায়িকা যা একটি অধিবেশনে পড়ে শেষ করা যায়।[৭] তিনি ছোটগল্প রচনার ক্ষেত্রে সবরকম আতিশয্য বর্জন করার কথা বলেছেন। নিয়ন্ত্রণ, সংযম এবং ঘনপিনদ্ধতা আলাদা করে এর জাত চিনিয়ে দেয়। হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো জীবনের খণ্ড চিত্রের চকিত উদ্ভাসনে গল্পকার কোনো চরিত্রের বিশেষ প্রবণতা বা জীবন সম্যস্যার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকেন।

এক্ষেত্রে তিনি প্রতীকী ও ব্যঞ্জনধর্মী ভাষার ছাঁদ ব্যবহার করবেন। কিন্তু গল্প কত ছোট হলে তাকে ছোটগল্প বলা হবে কিম্বা গল্পের ছোট হওয়ার চাইতে গল্প হয়ে ওঠা জরুরী কিনা এইসব প্রশ্নের মীমাংসা আজও হয়নি। বনফুলের ‘পাশাপাশি,’ ‘নিমগাছ’ এর মতো

অণুগল্প যেমন ছোটগল্পের পদবাচ্য তেমন শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' বা রবীন্দ্রনাথের 'নষ্ট নীড়' ছোটগল্পনামক সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত। তাই ছোটগল্প যে একাসনে সুসমাপ্য হবে এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। আবার সব পাঠকের আগ্রহ, একাগ্রতা, এবং অবসর এক হতে পারে না। সোনার তরী কাব্য-এর (১৮৯৪ খ্রীঃ) 'বর্ষাযাপন' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন-

"ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথা,
ছোট ছোট দুঃখ কথা,
নিতান্তই সহজসরল
সহস্র বিস্মৃতিরাশি
প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারই দুচারটি অশ্রুজল
নাহি বর্ণনার ছটা
ঘটনার ঘনঘটা
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ
অন্তরে অতৃপ্তি রবে
সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইলো না শেষ।"[৮]

তিনি গল্পের যে চমকপ্রদ উপসংহার বা অতৃপ্তির কথা বলেছেন অনেক গল্পকার ও সাহিত্য সমালোচক তার সঙ্গে এক মত হতে পারেননি। আন্তন চেকভ এই মতের পক্ষপাতী ছিলেন না। বাংলায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পগুলিতে এই চমকপ্রদ উপসংহার মেনে চলা হয়নি। উপরের আলোচনা থেকে আমরা ছোটগল্পের কতগুলি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারি –

১। ছোটগল্পে গল্পকার বিদ্যুৎ চমকের মতো জীবনের খণ্ডচিত্র চকিত উদ্ভাসনে ফুটিয়ে তোলেন।

২। এখানে কাহিনির জটিলতা ও বর্ণনার আতিশয্য বর্জন করা হয়।

৩। ছোটগল্পে অতিকথনের সুযোগ নেই, তাই ভাষা হবে সংযত, প্রতীক ও ব্যঞ্জনাধর্মী।

৪। ছোটগল্পের একটি মাত্র মহামুহূর্ত থাকবে।

৫। জীবনের মাঝখান থেকে যে কোনো বাক্য বা বিবৃতির সাহায্যে ছোটগল্প শুরু হতে পারে।

৬। অনেকে ছোটগল্পের চমকপ্রদ উপসংহারের কথা বলেছেন।

৭। এখানে বহু চরিত্রের ভিড় নেই, দুয়েকটি চরিত্রের বিশেষ প্রবণতা বা বিশেষ সমস্যা গল্পকার শিল্পের এক আঁচড়ে পাঠকের সামনে তুলে ধরেন।

৮। আকৃতি বা আয়তন দিয়ে ছোটগল্পের সীমানা নির্দিষ্ট হতে পারে না। এর একটি নিজস্ব সত্তা বা স্বরূপ আছে।

ছোটগল্পের শ্রেণীবিভাগ

পৃথিবীর বিপুল গল্পভাণ্ডারে সামান্যতম খোঁজ নিলে দেখা যাবে সব কিছুই ছোটগল্পের বিষয় হতে পারে। সামান্য কোনো ব্যক্তি বা তুচ্ছ কোনো বস্তুকে নিয়ে অসংখ্য ছোটগল্প রচিত হয়েছে। আবার একই গল্পের মধ্যে বহু বিষয়ের কম-বেশী সমাবেশ লক্ষ করা যায়। প্রেমের গল্পে থাকতে পারে প্রকৃতি বা অতিপ্রাকৃত জগৎ। আবার সামাজিক পারিবারিক গল্পে নরনারীর প্রেম এবং মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ অনিবার্যভাবে জায়গা পেতে পারে। ছোটগল্পের শ্রেণীবিভাগ তাই গল্পকারদের তুলনায় সমালোচকদের অধিক আগ্রহের বিষয়। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০ খ্রীঃ)এর মতে বারোটি এবং শ্রীশচন্দ্রের দাশের মতে পনেরোটি শ্রেণীতে ভাগ করে ছোটগল্পকে পাঠ করা সম্ভব।[৯] ছোটগল্পের শ্রেণীবিভাগগুলি যথাক্রমে -

১। প্রেমমূলক, ২। সামাজিক, ৩। প্রকৃতি ও মানুষ, ৪। অতিপ্রাকৃত, ৫। হাস্যরসাত্মক, ৬। উদ্ভট, ৭। মনস্তাত্ত্বিক, ৮। মনুষ্যেতর, ৯। ঐতিহাসিক, ১০। গার্হস্থ্য ও পরিবারমূলক, ১১।

বিজ্ঞাননির্ভর, ১২। বাস্তবনিষ্ঠ, ১৩। গোয়েন্দাধর্মী, ১৪। বিদেশী পটভূমিকাযুক্ত, ১৫। সংকেত ও প্রতীকধর্মী।

৫.৫ বাংলা ছোটগল্পে দৃষ্টিপ্রতিস্পর্ধী কথা

প্রথম সাধারণ মানুষের জীবনকথা সাহিত্যে স্থান পেয়েছে গদ্যসাহিত্যের যুগে। মহাকাব্য ও পুরাণের যুগে সাহিত্যের বিষয় ছিল দেবদেবীর কাহিনি ও রাজরাজাদের কথা। সেখানে বাস্তব সমাজের পরিবেশের কথা থাকলেও তা পরিবেশিত হয়েছে ধর্মের মোড়কে। বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস সৃষ্টির প্রথম যুগে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ লেখকরা উপন্যাসের কাহিনি নির্মাণের ক্ষেত্রে ইতিহাস ও রোমান্সকে গুরুত্ব দিয়েছেন। ছোটগল্প রচনার সূচনালগ্নে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার 'বর্ষাযাপন' কবিতায় সাধারণ মানুষের অতিসাধারণ জীবন কথা সাহিত্যে ফুটিয়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে কল্লোল আন্দোলনের প্রভাবে সাহিত্যে সাধারণ মানুষের জীবন-যন্ত্রণার ছবি অন্য মাত্রা পেয়েছে। তাদের কেউ সামাজিক লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার শিকার। কেউ নির্যাতনের পেষণযন্ত্রে পিষ্ট হতে-হতে হতাশার অন্ধকারে পথ খুঁজে দিশেহারা। কেউ আবার ক্ষুধায়-কামনায় জর্জরিত। ব্যক্তি ও সমাজের আপোসের প্রশ্নে কেউ দ্বিধাগ্রস্ত। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর (১৮৭৮-১৯৩৮ খ্রীঃ) *স্বামী, হরিলক্ষী, একাদশী বৈরাগী,* শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়-এর (১৯০১-১৯৭৬ খ্রীঃ) *কয়লাকুঠি,* মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর (১৯১০-১৯৫৬ খ্রীঃ) *প্রাগৈতিহাসিক (১৯৩৭ খ্রীঃ)* গল্প সংকলনগুলিতে এই জাতীয় আলেখ্য রচিত হয়েছে। এইসব বঞ্চিত-নিপীড়িত মানুষের পাশাপাশি বাংলা ছোটগল্পে উঠে এসেছে প্রতিস্পর্ধী মানুষের কথা। তাদের কেউ আকস্মিক দুর্ঘটনায় দৃষ্টি হারিয়েছে, কেউ জন্মগতভাবে দৃষ্টিপ্রতিস্পর্ধী, কেউ মূক ও বধির, অস্থি প্রতিস্পর্ধী, কেউ আবার মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন। আমরা এই প্রতিস্পর্ধী চরিত্রের মধ্যে দৃষ্টি প্রতিস্পর্ধীদের নিয়ে আলোচনা

করব। যেসব ছোটগল্পে এই জাতীয় চরিত্রের কথা এসেছে তার একটি সারণি নীচে দেওয়া হল।

ক্রম	গল্প	গল্পকার	প্রকাশকাল	চরিত্র
১	দৃষ্টিদান	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৩০৫	কুমু
২	সুরের বন্ধু	মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়		
৩	আলোর আড়াল	সীতা দেবী		
৪	তমসা	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩৫২	পঙ্কে
৫	অন্ধ	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়		সনাতন
৬	অন্ধের বউ	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়		ধীরাজ
৭	আততায়ী	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৪৩	কৃত্তিবাস
৮	অন্ধ ও ধাঁধা	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়		অধর
৯	চোখ গেল	সুবোধ ঘোষ	১৩৬২	হিরন্ময়
১০	অজান্তে	বনফুল	১৩২৮	
১১	অন্ধ শ্রীবিলাসের অনেক দিনের একদিন	সোমেন চন্দ		শ্রীবিলাস
১২	কাম ও কামিনী	বিমল কর		কুঞ্জবাবু
১৩	কবিপত্নী	মহাশ্বেতা দেবী		বৃদ্ধকব
১৪	বুড়া পীরের দরগাতলায়	সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ		বৃন্দাবন
১৫	দৃষ্টি	ভগীরথ মিশ্র	১৯৯৩	লইতন ঝড়েস্বর ও কৈলাস
১৬	মাটির বেহালা	অনিতা অগ্নিহোত্রী	১৯৯৮	অন্ধ রমণী
১৭	গোলকধাম রহস্য	সত্যজিৎ রায়		নীহাররঞ্জন দত্ত
১৮	জননী	বিমল কর		দিনেন্দ্র
১৯	নদী ও নারী	জ্যোতিরীন্দ্র নন্দী		স্বামী
২০	চোখ গেলো	বনফুল		
২১	মহাযুদ্ধের পরে	সমরেশ বসু বটা	১৯৫৮	বটা সুলাও কুর্চি
২২	আমোদ বোষ্টুমি	মনিলাল গঙ্গোপাধ্যায়		গোরাচাঁদ

২৩	ভুল ছন্দ	নন্তু সরকার		রুমি

৫.৬ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১ খ্রীঃ)

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এমন এক ব্যক্তিত্ব, সাহিত্যের প্রায় সব শাখাতেই যাঁর অবাধ যাতায়াত স্বীকৃত। মূলত কবি হলেও বাংলা ছোটগল্পের প্রথম সার্থক স্রষ্টার গৌরব তাঁর প্রাপ্য। ঊনবিংশ শতকের নয়ের দশকে ছোটগল্প রচনা আরম্ভ করলেও আজীবন তিনি বাংলা ছোটগল্পের নব নব পরীক্ষা-নিরীক্ষায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁর রচিত গল্পগুলি প্রধানত তিন খণ্ডে *গল্পগুচ্ছে* সংকলিত। *গল্পগুচ্ছের* আলোচনা প্রসঙ্গে কবি ও সমালোচক বুদ্ধদেব বসুর মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য- "রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অংশ বেছে নিতে হলে আমাদের খুঁজতে হবে কোথায় তাঁর দুই সত্তার সামঞ্জস্য ঘটেছে, একটা অন্যটাকে ছাপিয়ে ওঠেনি, কোথায় কবিত্বের দিকটা গল্পের সঙ্গে এমনভাবে মিলেমিশে আছে যে কোনোটাকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া যায় না। সেরকম বই 'গোরা', 'চতুরঙ্গ', 'যোগাযোগ', কিন্তু এই সংগতিসাধনের দৃষ্টান্তরূপে সর্বাগ্রে যার নাম করতে হয়, সে বই 'গল্পগুচ্ছ'। 'গল্পগুচ্ছ' আশ্চর্য বই। ইতিহাসের দিক থেকে আশ্চর্য, আন্তরিক মূল্যেও তা-ই।"[১০] মানুষ ও প্রকৃতি, অতিপ্রাকৃত জগৎ, গীতিধর্মীতা, সংবেদনশীলতা, আত্মমগ্নতা তাঁর গল্পগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তিনি প্রথম বাংলা সাহিত্যে সাধারণ মানুষের অতি সাধারণ জীবনকথা ফুটিয়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর গল্পের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে 'ঘাটের কথা', 'রাজপথের কথা', 'বলাই', 'শাস্তি', এবং 'ক্ষুধিত পাষাণ' (১৩০২) ইত্যাদির নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। তাঁর শতাধিক গল্পসম্ভারের মধ্যে বিচিত্র চরিত্রের পাশাপাশি উঠে এসেছে কিছু প্রতিস্পর্ধী মানুষের কথা। ১২৯৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'সুভা' গল্পের প্রধান চরিত্র সুভাষিণী এবং ১৩০৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'শুভদৃষ্টি' গল্পের সুভা মূক ও

বধির বালিকা। আমাদের আলোচ্য 'দৃষ্টিদান' গল্পটি ১৩০৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, প্রথম প্রতিস্পর্ধীকেন্দ্রীক কথাসাহিত্যের নিদর্শন হলো বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত *রজনী*। উক্ত উপন্যাসের প্রধান চরিত্র রজনী দৃষ্টিগত প্রতিবন্ধকতার শিকার। বঙ্কিম পরবর্তী যুগের দৃষ্টিপ্রতিস্পর্ধীকেন্দ্রীক গল্পভাবনার নিদর্শন হিসেবে 'দৃষ্টিদান' গল্পের আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রসঙ্গক্রমে 'রজনী'র সঙ্গে 'দৃষ্টিদান' গল্পের দৃষ্টিভঙ্গিগত আলোচনাটিও গুরুত্বপূর্ণ।

দৃষ্টিদান (১৩০৫ বঙ্গাব্দ): বাংলা সাহিত্যে 'দৃষ্টিদান' গল্পের অবস্থান প্রসঙ্গে শ্রীকুমারবাবু বলেন, " 'দৃষ্টিদান' রবীন্দ্র প্রতিভার একটি শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি—ইহা রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প-রচনার স্বর্ণযুগের মুদ্রাঙ্কিত।"[১১] আমরা মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার করে দেখব।

গল্পকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছোটগল্প রচনার ক্ষেত্রে বহু স্থানে প্রত্যক্ষ কথকের পরিবর্তে আত্মকথনের ভঙ্গিটি ব্যবহার করেছেন। এই আত্মকথনের ধরণ পাঠকের মনে বিশ্বাসযোগ্যতার ও সহমর্মীতার দৃষ্টিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 'দৃষ্টিদান' গল্পের সূচনা অংশ থেকে একটু বিবৃতি উল্লেখ করলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। "শুনিয়াছি অনেক মেয়েকে আজকাল নিজের চেষ্টায় স্বামী সংগ্রহ করিতে হয়। আমিও তাই করিয়াছি দেবতার সহায়তায়। আমি ছেলেবেলা হইতে অনেক ব্রত এবং অনেক শিব পূজা করিয়াছিলাম। আমার বয়স ৮ বছর উত্তীর্ণ না হইতেই কৃতকর্মের ফলে আমি এমন স্বামী পাইয়াও সম্পূর্ণ পাইলাম না, ত্রিনয়নী আমার দুই চক্ষু লইলেন।"[১২]

এই গল্পের প্রধান চরিত্রের মধ্যে কুমু, তার স্বামী অবিনাশ, কুমুর দাদা, পিসিমা এবং হেমাঙ্গিনীর নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু গল্পে মূলত স্বামী অবিনাশের ভুল চিকিৎসায় দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে দাম্পত্য জীবনে এবং সামাজিক জীবনে কুমুকে যে সমস্যায় পড়তে হয়েছিল এ বিষয়টি লেখক সহৃদয়ভাবে প্রকাশ করেছেন। কুমুর দৃষ্টিহীনতা প্রসঙ্গে

শ্রীকুমারবাবু বলেন, "নায়িকা কুমুর চোখে অসুখ হইয়া উহার স্বামী হবু ডাক্তারের মূঢ় আত্মবিশ্বাসে দুরারোগ্য হইয়া উঠিয়াছে ও শেষ পর্যন্ত অন্ধত্বে চরম রূপ লইয়াছে। কিন্তু এই চোখ হারানোর চেয়ে যাহা কুমুর মনে দারুণতর উৎকণ্ঠা জাগাইয়াছে তাহা চিকিৎসা লইয়া তাহার স্বামী ও দাদার মধ্যে মতভেদ ও তীব্র মনোমালিন্য।"[১৩]

এই গল্পে কুমুর মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব এবং দৃষ্টিশক্তি হারানোর পর সামাজিকভাবে তার মর্যাদা হারানোর বিষয়টি গুরুত্বের সাথে গল্পকার তুলে ধরেছেন। দৃষ্টিশক্তি হারানোর পর কুমুর সঙ্গে তার স্বামীর দূরত্ব তৈরি হয়। লেখক বলেন যে, তাদের দুজনের যোগাযোগের সেতু নষ্ট হয়ে গেছে। "আজ আমার দৃষ্টিহীন সমস্ত শরীর তাহাকে অন্বেষণ করিতে চেষ্টা করে। তাহার পৃথিবীর সহিত আমার পৃথিবীর যে প্রধান সাঁকো ছিল সেটা আজ ভাঙিয়া গেছে।"[১৪] অবিনাশের জীবনে দ্বিতীয় নারী হেমাঙ্গিনীর আগমন এবং সেই আগমনকে ঘিরে অবিনাশ যে ছলনার আশ্রয় নিয়েছেন সেই ছলনা তাদের মধ্যে আরও দূরত্বের সৃষ্টি করে। কুমুর জীবনে একাকিত্বের সৃষ্টি হয়, যদিও সে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তার দৈনন্দিন কাজকর্ম করতে সক্ষম। তবুও অবিনাশকে সে দ্বিতীয় বার বিয়ে করার জন্য পীড়াপীড়ি করে। অথচ হেমাঙ্গিনীর আগমন তার মনে বেদনার সৃষ্টি করে। কিন্তু বাইরের আচরণে তা প্রকাশ পায় না। বরং, কুমু তার সঙ্গে মধুর ব্যবহার করে। তার এই আচরণ নিজের সঙ্গে নিজের দ্বন্দ্বকে প্রকাশ করে। এই সময় তার কলকাতা ভালো লাগে না। বরং, গ্রামের মেঠো পথে গরুর গাড়ি চলার শব্দ, শিশির মাখা বাতাসের স্পর্শ, ফসলের গন্ধ তাকে বেশী আকৃষ্ট করে। "নতুন দেশ , চারিদিক দেখিতে কিরকম তাহা বুঝিলাম না, কিন্তু বাল্যকালের সেই গন্ধে এবং অনুভবে আমাকে সর্বাঙ্গে বেষ্টন করিয়া ধরিল। সেই শিশিরে ভেজা নূতন চষা খেত হইতে প্রভাতের হাওয়া, সেই সোনা ঢালা অড়র এবং সরিষা খেতের আকাশ-ভরা কোমল সুমিষ্ট গন্ধ, সেই রাখালের গান, এমন-কি ভাঙা রাস্তা দিয়া গরুর গাড়ি চলার শব্দ

পর্যন্ত আমাকে পুলকিত করিয়া তুলিল।"[১৫] তার প্রকৃতি প্রীতি একই সঙ্গে ইন্দ্রিয়সচেতনতার এবং নিঃসঙ্গতার পরিচয়বাহী।

অবিনাশ ডাক্তারি পাশ করে পসার জমালে পাড়া –প্রতিবেশীরা বলতে থাকে কুমুকে দেখাশোনার জন্য এবং অবিনাশের সংসার চালানোর জন্য তার জীবনে দ্বিতীয় পত্নীর প্রয়োজন। অথচ কুমু তার দৃষ্টিহীনতা সত্ত্বেও প্রাত্যহিক কাজকর্ম করতে সক্ষম বোঝা যায়। কুমুর এই দৃষ্টিহীনতা একটা অজুহাত মাত্র। অর্থ কৌলিন্যের জোরে অবিনাশের ভ্রষ্টাচার এবং দ্বিতীয় নারীতে আসক্তি তাকে নতুন বিবাহের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। কুমুকে তার দেবীর মতো ভয় করে, কিন্তু সে নিজেকে সামান্য নারীরূপে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। অবিনাশের পূর্বকৃত শপথ সে দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহ করলে ব্রহ্ম হত্যার পাতকী হবে। কুমু প্রাণপণ চেষ্টা করে তার স্বামীকে এই পাপকর্ম থেকে নিবৃত করতে, শেষ পর্যন্ত তার দাদার চেষ্টায় দ্বিতীয় বার বিয়ের উদ্যোগ পণ্ড হয় এবং অবিনাশ কুমুর কাছে ফিরে আসে। কুমুর জীবনের জটিল ঘটনাবর্তকে ফাল্গুনীবাবু অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। " 'দৃষ্টিদান' গল্পে যাবতীয় জটিলতা কুমুর নিজেরই মনের সৃষ্টি। তার প্রতিবন্ধকতার কারণে তার নিজের মধ্যে জন্ম নিয়েছে একটি হীনমন্যতা বা অস্তিত্ব সংকট। হেমাঙ্গিনী প্রসঙ্গেও তার সন্দেহ-স্বামীর বিবাহযাত্রায় কেঁদে ওঠার প্রতিবাদের পরিবর্তে তাই অনুরোধ ঝরে পড়েছে।"[১৬]

কুমুর হীনমন্যতা ও অস্তিত্ব সংকট সত্য, তবে তার জন্য শুধুমাত্র তার দৃষ্টিহীনতাকে দায়ী করা যায় না। সেই হীনমন্যতা ও অস্তিত্ব সংকটের প্রশ্নে তার প্রতি কৃত সমাজ ও পরিবারের আচরণকে দায়ী না বলে পারা যায় না। কুমুকে সামাজিকভাবে অবজ্ঞা ও অসম্মানের মুখোমুখি হতে হয়েছিল তার কারণ মূলত দৃষ্টিহীনতা। তৎকালীন সমাজে এই সম্বন্ধীয় কোনো সচেতনতা ছিল বলে মনে হয় না। তাছাড়া সে ছিল নিঃসন্তান। তৎকালীন সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে নারী হিসেবে এবিষয়টিও তার মর্যাদা হানি করে। এই গল্পের প্রথম

সংস্করণে কুমুর দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তৎকালীন সময়ের একজন দৃষ্টিহীন স্কলার সুবোধচন্দ্র রায়ের কথায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কুমুকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে না দিয়ে দ্বিতীয় সংস্করণে তার স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবন এবং সামান্য মানবী হিসেবে তাকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দ্বিতীয় সংস্করণের এই পরিবর্তন নিঃসন্দেহে তাঁর উদারতার পরিচয় বহন করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এমন এক শিল্প প্রতিভা যিনি সময়ের পরিবর্তনে জীবনের বাঁকে-বাঁকে নিজেকে বারবার ভেঙে সময়-উপযোগী করে নিজেকে গড়ে নিতে পেরেছিলেন। একইসঙ্গে তিনি ঐতিহ্য ও সমকালকে তাঁর বিপুল সাহিত্যকর্মের মধ্যে রূপায়িত করেছেন।

সম্ভবত তৎকালীন পাঠকের কথা মাথায় রেখে 'দৃষ্টিদান' গল্পের প্রথম সংস্করণে তিনি কুমুর দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে, লেখকের প্রধান লক্ষ পাঠকসমাজ। কিন্তু উদারতার গুণে সুবোধচন্দ্র রায়ের কথায় দ্বিতীয় সংস্করণের পরিবর্তন আনতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। শিল্পের সততায় কুমুর মনস্তত্ব, সমাজে এবং পরিবেশে তার অবস্থান যেভাবে চিত্রিত করেছেন তা সহৃদয় পাঠকের মর্মকে স্পর্শ করে। এই গল্পের নামকরণের ক্ষেত্রেও প্রতিস্পর্ধীদের নিয়ে লেখা বাংলা সাহিত্যে আর পাঁচটা গল্পের তুলনায় তিনি মৌলিকতা দেখিয়েছেন। এই গল্পে অবিনাশের চিকিৎসায় কুমু দৃষ্টিশক্তি হারাচ্ছে। কিন্তু সে নিজে স্বামী অবিনাশের জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত করছে। সে দিক থেকে গল্পের নাম 'দৃষ্টিদান' রবীন্দ্রনাথের স্বতন্ত্র্য শিল্পীসত্ত্বা ও নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক। কুমু নিজের দৃষ্টিহীনতার জন্য তার পূর্বজন্মের কৃতকর্মকে দায়ী করে এবং সে নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দেয় যে, রামচন্দ্র যেমন তার পদ্মচক্ষু আরাধ্য দেবীকে দান করতে যাচ্ছিলেন তেমন সে তার নিজের দুচোখ স্বামীর উদ্দেশ্যে দান করেছে। গল্পে এই ধারণা একইসঙ্গে ঐতিহ্য এবং সমকালকে উপস্থাপন করেছে। এ প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য, "বিংশ শতকের প্রথম পাদ পর্যন্ত হিন্দু নারীর ভাবজীবন যে পৌরাণিক

পাতিব্রত্য ও আত্মবিসর্জনের আদর্শের দ্বারা কত গভীর ভাবে প্রভাবিত ছিল, তাহার স্বর্গ যে তাহার গৃহাঙ্গনের কত স্পর্শযোগ্য নৈকট্যে ছিল, তাহা কুমুর চরিত্রে অতি আশ্চর্য ও স্বতঃস্ফুর্তভাবে উদাহৃত হইয়াছে।"[১৭] সব মিলিয়ে এই গল্পটি তৎকালীন সময়ের এক অনবদ্য সৃষ্টি এবং পূর্ববর্তী দৃষ্টিপ্রতিস্পর্ধীদের নিয়ে লেখা *রজনী* উপন্যাসের তুলনায় প্রগতিশীলতার পরিচয় বহন করে। *রজনী* উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দৃষ্টিহীন কন্যার বিবাহ দিতে পারেননি। তাই তিনি অলৌকিক উপায়ে রজনীর দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এই গল্পে অলৌকিকতার প্রসঙ্গ নেই। গল্পকার দৃষ্টিহীন কন্যার যন্ত্রণা এবং শেষপর্যন্ত তার সুস্থ দাম্পত্য জীবনকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। দৃষ্টিপ্রতিস্পর্ধীদের নিয়ে লেখা প্রথম গল্প হিসেবে এটি বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ এবং *গল্পগুচ্ছের* নবতম সংযোজন।গল্পটি পঠনপাঠন ও বিশ্লেষণের দ্বারা আমরা কতগুলি লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করতে পারি যা আমাদের উপসংহার রচনায় সাহায্য করতে পারে। এই গল্প থেকে প্রাপ্ত লক্ষণগুলি হল-

প্রথমত, উক্ত গল্পে দৃষ্টিহীন এবং দৃষ্টিমানদের যোগাযোগের সমস্যা চিত্রিত। দৃষ্টিহীনতার কারণে কুমু সামাজিক এবং পারিবারিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। তার জীবনে নিঃসঙ্গতা নেমে আসছে।

দ্বিতীয়ত, দৃষ্টিহীনতা মানুষের পূর্বজন্মের কৃতকর্মের ফল কুমুর মনে এই ধারণাটি সক্রিয়।

তৃতীয়ত, সমাজ তাকে স্বাধীন জীবন যাপনের অনুমতি দিচ্ছে না। তাই, দ্বিতীয় বিয়ের প্রসঙ্গ এসেছে।

৫.৭ মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮৮-১৯২৯)

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় সাহিত্য সৃষ্টি ছাড়াও *ভারতী* পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন। তাঁর জীবনের সময়কাল মাত্র ৪১ বছর। স্বল্প কালের মধ্যে তিনি বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচয়

দিয়েছেন। তাঁর গ্রন্থগুলির মধ্যে 'কাদম্বরী', 'জলছবি', 'কায়াহীনের কাহিনী' প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

সুরের বন্ধু: 'সুরের বন্ধু' গল্পে আমরা এক দৃষ্টিপ্রতিস্পর্ধী চরিত্র পাই যে রোম্যান্টিক স্বপ্নকল্পনায় আর সঙ্গীত সাধনায় নিজের জীবন অতিবাহিত করে। তার মনে হয় সুরের সাধনায় কাঙ্খিত অনামিকা এসে ধরা দেবে। এই গল্পের সাথে বাস্তব সমাজচিত্রের ততটা সম্পর্ক নেই। বরং, দৃষ্টিহীনতার সঙ্গে সঙ্গীত প্রতিভাকে এক করে দেখার যে সামাজিক মনোভাব এখানে সেই প্রচলিত ভাবনার অনুরণন ঘটেছে। উক্ত গল্পটি সম্পর্কে ভূদেব চৌধুরির মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য- "তাঁর 'সুরের বন্ধু' গল্পটি রোমান্স নিবিড় , বস্তুহীন রহস্যস্বপ্নে মদির।"[১৮]

পরবর্তীকালে অনিতা অগ্নিহোত্রী রচিত 'মাটির বেহালা' গল্পেও আমরা খুঁজে পাই সুর সাধনায় নিমগ্না এক নারীর কথা। বেহালার করুণ সুরের সঙ্গে যার ব্যক্তি জীবনের অনুভূতির জগৎ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। এ জাতীয় গল্পগুলিতে সহানুভূতির প্রসঙ্গ থাকলেও সমাজমনস্কতার প্রশ্নে এগুলির ভূমিকা নগণ্য। দৃষ্টিহীনতা এবং সঙ্গীতবিদ্যা সম্পর্কে যে পূরোনো মিথ উক্ত গল্প দুটিতে তাকেই সমর্থন করা হয়েছে।

৫.৮ সীতা দেবী (১৮৯৫-১৯৭৭ খ্রীঃ)

সীতা দেবী ছিলেন ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধের একজন বাঙালি সুলেখিকা। ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি সাহিত্য রচনা আরম্ভ করেন। *প্রবাসী (১৩০৮)* পত্রিকায় তাঁর অনেকগুলি গল্প প্রকাশিত হয়েছিল। কলেজে পড়াকালীন তাঁরা দুই বোন (সীতা দেবী ও শান্তা দেবী) মিলে শ্রীশচন্দ্র বসুর *Folk Tales of Hindustan* গ্রন্থটি হিন্দুস্থানী উপকথা নামে অনুবাদ করে খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯১৭ সাল থেকে দু'বছর শান্তিনিকেতনে থাকাকালীন রবীন্দ্রনাথের সাহচর্যে আসেন। দুই বোন মিলে সংযুক্তাদেবী ছদ্মনামে প্রথম উপন্যাস *উদ্যানলতা* রচনা

করেন। উপন্যাসটি বাংলা নারী জাগরণের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো, *রজনীগন্ধা* (১৩২৮), *পরভৃতিকা* (১৩৩৭), *পথিক বন্ধু* (১৩২৭), *বন্যা* ইত্যাদি। তার রচিত আলোর আড়াল গল্পটি একটি দার্শনিক তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। মানুষের চোখ যেখানে জাগ্রত থাকে মনের আলো সেখানে বন্ধ। যখন চোখের আলো ফুরিয়ে আসে তখনই মনের আলোর ঝর্নার উৎস খুলে যায়। লেখিকা নিশ্চিতভাবে সাহিত্যজগতে প্রচলিত এই দার্শনিক তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।

আলোর আড়াল: এই গল্পের প্রধান চরিত্র ধরণীমোহন জমিদার এবং সুপুরুষ কিন্তু দৃষ্টিহীন। তাই সমাজে তার জন্য পাত্রী পাওয়া কঠিন। কুরূপা মলিনার সঙ্গে তার বিয়ে দেওয়া হয়। তবু প্রথম পর্যায়ে এই ঘটনা মলিনার মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ক্রমশ সে স্বামীকে সুখী করার চেষ্টা করে। প্রেমের দৃষ্টিতে ধরণীমোহনেরও তাকে সুন্দরী বলে ধারণা হতে থাকে। কিন্তু অস্ত্রোপচারের পর নিজের চোখ ফিরে পেয়ে ধরণীমোহন তাকে স্ত্রী হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করে। প্রত্যাখ্যাতা মলিনা এক দৃষ্টিহীন আশ্রমে এসে মানবসেবার আদর্শ গ্রহণ করে। ঘটনাচক্রে ভুল ওষুধ প্রয়োগে তার চোখ পুনরায় নষ্ট হয়ে যায় এবং সে আশ্রমবাসিনী মলিনার কাছে ফিরে আসে। তাদের পুনর্মিলন হয়।

গল্পটি একইসঙ্গে যেমন দার্শনিক তেমনই সমাজে দৃষ্টিহীনদের অবস্থান এবং পুরুষতান্ত্রিক সমাজে লিঙ্গভিত্তিক শোষণের দিকটিও আমাদের মনে করিয়ে দেয়। ধরণীমোহন সুপুরুষ জমিদার হলেও দৃষ্টিহীন। তাই তার জন্য পাত্রী পাওয়া যায় না। আবার, মলিনা নারী হয়েও কুরূপা তাই তার জন্য পাত্র পাওয়া ভার। এখানে প্রতিবন্ধকতার ধারণা এবং লিঙ্গভিত্তিক মানসিকতা সমর্থক। ধরণীমহনের মলিনাকে প্রত্যাখ্যানের মধ্যেও একই মানসিকতা লক্ষ করা যাচ্ছে। আবার, মানুষের প্রচলিত দেহসৌন্দর্যের ধারণাটিও এখানে ভেঙে যাচ্ছে। "অন্ধ স্বামীর সঙ্গে কুদর্শনা স্ত্রীর বিবাহিত জীবনে জটিলতার

পাশাপাশি স্ত্রীর মনের অন্যতর একটি আলোকিত দিককে প্রকাশিত হতে দেখি গল্পে।"[১৯] 'আলোর আড়াল' গল্পের এই ধরনের নামকরণের মধ্যে উক্ত গল্পে রূপ ও অরূপের মধ্যে দ্বন্দ্ব, প্রেম ও মহের মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং আলো ও অন্ধকারের মধ্যে দ্বন্দ্বের বিষয়টি আভাসিত হয়েছে। একাধারে গল্পটি সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং দার্শনিক ভাবনায় সমুজ্জ্বল। তাই, দার্শনিকতা এবং সমাজমনস্কতার প্রশ্নে এটি একটি সার্থক রচনা। সমালোচকের মতে "এই একটি গল্পই তাঁকে দিতে পারে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা।"[২০]

৫.৯ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১ খ্রীঃ)

বাংলা সাহিত্যে 'ত্রয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়'-এর (তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়) মধ্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যতম কথাকার। তিনি মূলত ঔপন্যাসিক হলেও ছোটগল্পকার রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিশিষ্ট জীবনবোধ ও আঞ্চলিকতার প্রশ্নে তিনি মৌলিক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। *কল্লোল* (১৯২৩ খ্রীঃ))এর সমসাময়িক এবং পরবর্তী যুগে উপন্যাস ও ছোটগল্পের রচনাকার রূপে সাহিত্যে তাঁর স্থানটি স্বতন্ত্র। তার কথা সাহিত্যে এক দিকে নতুন ও পুরাতনের দ্বন্দ্ব অন্যদিকে রাঢ়বঙ্গের মানুষের তীব্র জীবনপিপাসা, তাদের কামনা, বেদনা এবং বেঁচে থাকার লড়াই অন্য এক জগৎ নির্মাণ করেছে। তিনি নিজে ছিলেন বীরভূমের লাভপুর অঞ্চলের অধিবাসী। তাঁর অভিজ্ঞতার জগৎ মহত্ব, নীচতা, ক্ষুদ্রতা নিয়ে কথাসাহিত্যে রূপায়িত। ১৮৯৮ থেকে ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দ তাঁর জীবনের সময়কাল। সাহিত্য রচনার দীর্ঘ কালপর্বে তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্প ক্রমপরিণতির চরম সীমায় পৌঁছেছে। ব্যাপক সাহিত্যকর্মে বিচিত্র চরিত্রের পাশাপাশি উঠে এসেছে প্রতিস্পর্ধী মানুষের কথা। 'বোবা কান্না', 'নারী ও নাগিনী', 'তমসা' প্রতিস্পর্ধীকেন্দ্রীক গল্পভাবনার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। আমাদের আলোচ্য দৃষ্টিপ্রতিস্পর্ধীদের

নিয়ে লেখা 'তমসা' গল্পটি তারাশঙ্করের *গল্পগুচ্ছের* অন্তর্গত। এই গল্পের পঙ্ক্ষে চরিত্রটি তৎকালীন সমাজবাস্তবতার পরিচয় বহন করে।

তমসা (১৩৫২ বঙ্গাব্দ): বীরভূমের অখ্যাতনামা ছোট একটি স্টেশন জেনানা। এই রেল স্টেশনে পঙ্ক্ষে গান গেয়ে, হরবোলা ডেকে অর্থ উপার্জন করে। দৃষ্টিহীনতার কারণে সে সমাজ ও পরিবার থেকে নির্বাসিত। তার বেঁচে থাকার অবলম্বন ভিক্ষাবৃত্তি। এখানে গানের দলের 'ছুটকি বা মাঠাকরান' এর সঙ্গে তার পরিচয় হয়। তাকে প্রণাম করতে গিয়ে পঙ্ক্ষের চোখেমুখে আলতার রঙ লাগে। লেখক বলেছেন এই রঙ তার একাকী নিঃসঙ্গ জীবনে পরিবর্তন নিয়ে আসে। গানের দল চলে যায়, কিন্তু ভবঘুরে পঙ্ক্ষে এই স্টেশন সেই স্টেশন ঘুরতে ঘুরতে জীবনের শেষ প্রান্তে তীর্থক্ষেত্রে এসে আশ্রয় নেয়।

গল্পকার তার অনুভূতির জগৎ কৃতিত্বের সঙ্গে রূপায়িত করেছেন। পঙ্ক্ষে চুড়ির শব্দ শুনে বলে দিতে পারে কাঁচের না সোনার চুড়ির শব্দ। টিনের চালে কাক বসলে কিম্বা প্রখর রোদ্দুরে টিনের ছাদ ফেটে গেলে এ দুটি শব্দকে সে আলাদা করতে পারে। শাড়ির খসখস শব্দ এবং গায়ের গন্ধে সে অভিজাত ও অনভিজাত মহিলাদের পার্থক্য করতে পারে। মানুষের গলার স্বর শুনে তার বয়স আন্দাজ করার ক্ষমতাটিও সে রপ্ত করেছে। পরিচিত স্থানের পথ-ঘাট সে কারোর সাহায্য ছাড়াই চিনে নিতে সক্ষম। এই তীব্র ইন্দ্রিয়সচেতনতা এবং প্রখর স্মৃতিশক্তির গুণে হয়তো সে গান গাওয়া, চটকদারি কথা বলা এবং হরবোলার ডাকার ক্ষমতা অর্জন করেছে।

গল্পকার সহৃদয়ভাবে পঙ্ক্ষের গুণাবলী এবং ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার জগৎ চিত্রিত করেছেন। নানাবিধ গুণের অধিকারী হওয়ার সত্ত্বেও সমাজে ও পরিবারে তার স্থান হয়নি। মানুষ হিসেবে মর্যাদা পাওয়ার পরিবর্তে বারবার সামাজিক অবজ্ঞা ও অসম্মানের শিকার হয়েছে। সমাজে ও পরিবারে তার পুনর্বাসনের কোনো উদ্যোগ গৃহীত হয়নি। স্বাভাবিকভাবে

সামাজিক ও পারিবারিক দায়িত্ব পালন, আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ - এইসব থেকে পঙ্কের অবস্থান অনেক দূরে। সমাজ নির্বাসিত প্রান্তিক মানুষ হিসেবে পঙ্কের এই মন্তব্যটি সবিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে, "মনুষ্যি তো বটে।"[২১]

আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটে পঙ্কে চরিত্রটি নিঃসন্দেহে বাস্তবানুগ ও বিশ্বাসযোগ্য রূপে লেখক চিত্রিত করেছেন। কিন্তু প্রান্তিক মানুষ হিসেবে সমাজের একজন মানুষ হয়ে ওঠার যে সম্ভাবনা পঙ্কে চরিত্রের মধ্যে ছিল, গল্পকার তাকে গুরুত্ব দেননি। ১৩৫২ সালে যখন এই গল্পটি প্রকাশিত হয় এই কালপর্বের মধ্যে দৃষ্টিপ্রতিস্পর্ধীদের শিক্ষা ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে সামাজিকভাবে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। এদের অনেকেই আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে নিজেদের যোগ্যতা ও কর্মকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। হয়তো লেখক এই বিশেষ কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। অথবা বিশেষ আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটে পঙ্কে চরিত্রের বাস্তবানুগ রূপায়ণ তাঁর কাছে অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। তাঁর সামগ্রিক সাহিত্য কর্মের সাথে দ্বিতীয় মন্তব্যটি সঙ্গতিপূর্ণ। কিন্তু তাঁর মতো কথাকারের কাছে আঞ্চলিকতা ও বাস্তবতা ভিন্ন পাঠকের প্রত্যাশা কিছু বেশী। 'তমসা' গল্পের 'পঙ্কে' চরিত্রের সামাজিক মানুষ হয়ে ওঠা সম্ভাবনার বীজ এই গল্পে যথার্থ রূপ লাভ না করলেও তার অনুভূতির জগৎ লেখক যেভাবে চিত্রিত করেছেন তা নিঃসন্দেহে পাঠকের প্রশংসার দাবী রাখে। উক্ত গল্পটি সম্পর্কে অধ্যাপক ফাল্গুনী ভট্টাচার্যের মন্তব্যটি উল্লেখ্য, "সমাজের মানুষরাও অন্ধ পঙ্কের গায়ক সত্তা কবিয়াল স্বভাব এই সমাজে মর্যাদা পেল না তেমনভাবে, তাকে শেষ জীবনে ভিক্ষান্নেই নির্ভর করতে হলো।"[২২] এই গল্পে দৃষ্টিপ্রতিস্পর্ধীকেন্দ্রীক ভাবনার মূল বিষয়গুলি হল-

প্রথমত, দৃষ্টিহীনতার কারণে পঙ্কে সামাজিক এবং পারিবারিকভাবে বিচ্ছিন্ন।

দ্বিতীয়ত, তীব্র ইন্দ্রিয়সচেতনতা - দৃষ্টিশক্তির অভাবে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ে সক্রিয়তা যা বহুলাংশে বৈজ্ঞানিক। তবে এর মধ্যে অলৌকিকতার কোনো স্থান নেই।

তৃতীয়ত, গান বাঁধা এবং গান গাওয়ার প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও সমাজে দয়া দাক্ষিণ্যের অতিরিক্ত কোনো মূল্যায়ন তার হচ্ছে না। সে জন্যই তার পেশা ভিক্ষাবৃত্তি।

৫.১০ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর (১৯১০-১৯৫৬ খ্রীঃ) চারটি গল্পের আলোচনা

বিশ শতকের তিনের দশকে জীবন ও জীবিকার প্রশ্নে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এক বিশিষ্ট নাম। মানুষের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের পাশাপাশি সংগ্রামী মানুষের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের স্বপ্নকে তিনি কথাসাহিত্যে রূপায়িত করেছেন। ১৯১০-১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দ মাত্র ৪৬ বছর তাঁর জীবনের সময়কাল। এই স্বল্পকালের মধ্যে সমসাময়িক কথাকারদের মধ্যে অন্যতম ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্পকার রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। নিজের সাহিত্যচর্চা প্রসঙ্গে 'কেন লিখি' প্রবন্ধে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "জীবনকে আমি যে ভাবে ও যতভাবে উপলব্ধি করেছি অন্যকে তার ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ ভাগ দেওয়ার তাগিদে আমি লিখি। আমি যা জেনেছি এ জগতে কেউ তা জানে না।"[২৩] নির্মোহ দৃষ্টিতে মানুষের মনের গহনে অবগাহন করে নির্বিকার চিত্তে সত্যের উদ্ঘাটন, কখনো আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটে মানুষের জীবন সংগ্রাম, তাদের স্বপ্নময় ভবিষ্যতের ইঙ্গিত, ভাবালুতা বর্জন করে ভাষার স্বচ্ছ ব্যবহার ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের জন্য বাংলা সাহিত্যে তিনি স্মরণীয়। *দিবারাত্রির কাব্য* (১৯৩৫ খ্রীঃ), *পদ্মানদীর মাঝি* (১৯৩৬ খ্রীঃ) *পুতুল নাচের ইতিকথা* (১৯৩৬ খ্রীঃ) প্রভৃতি উপন্যাস এবং *অতসী মামী* (১৯৩৫ খ্রীঃ), *প্রাগৈতিহাসিক* (১৯৩৭ খ্রীঃ), *সরীসৃপ* (১৯৩৯ খ্রীঃ), *শহরতলি* (১৯৪০ খ্রীঃ) ইত্যাদি গল্পগ্রন্থ তার মৌলিকতার পরিচয় বহন করে। বিশেষত তাঁর মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী তাঁকে সমসাময়িক লেখকদের তুলনায় স্বতন্ত্র মর্যাদার আসন দিয়েছে। তাঁর সাহিত্যকর্মের মধ্যে দিয়ে পাঠকের কাছে এমন এক দর্পণ তুলে ধরেছেন মানুষ যেখানে

নিজেই নিজের স্বরূপ দেখে চমকে ওঠে। নিজের আয়নায় নিজেকে দেখা, জীবনের অসঙ্গতি, ত্রুটি-বিচ্যুতি তুলে ধরাই ছিল তাঁর সাহিত্য রচনার উদ্দেশ্য। "অদ্ভুত নিরাসক্তভাবে তিনি মানুষের জীবনচিত্র এঁকে গেছেন, তাতে জীবনসমস্যার গ্রন্থিমোচনে তৎপর হয়েছেন, কলকাতার অধিবাসীরা সেই সমস্ত আদিম জীবনচিত্র ও মনোবিকারের ছবি দেখে চমকে উঠেছিলেন।"[২৪]

সমসাময়িক গল্পকারদের মধ্যে সম্ভবত তিনি প্রতিস্পর্ধীদের নিয়ে সর্বাধিক গল্প লিখেছেন। তার 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পের ভীকু, 'আত্মহত্যার অধিকার' গল্পের পঙ্গু নিলমণি, 'সরীসৃপ' গল্পের মানসিক ভারসাম্যহীন ভুবন তার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। দৃষ্টিপ্রতিস্পর্ধীদের নিয়ে লেখা গল্পগুলি তার মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর গুণে সমসাময়িক অন্য লেখকদের তুলনায় স্বতন্ত্র্য। 'অন্ধ', 'আততায়ী', 'অন্ধের বউ', 'অন্ধ ও ধাঁধা' গল্পগুলি এই বক্তব্যকে প্রমাণ করে।

অন্ধ: আমাদের আলোচ্য 'অন্ধ' গল্পটি বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি *প্রাগৈতিহাসিক* গল্প গ্রন্থের অন্তর্গত। এই গল্পের প্রধান চরিত্র সনাতন অতিরিক্ত মদ্যপানের কারণে ৫৬ বছর বয়সে সম্পূর্ণ দৃষ্টিশক্তি হারায়। এরপর নিজের সম্পত্তি ও মর্যাদা রক্ষার জন্য সমাজ ও পরিবারের সাথে তাকে যেভাবে লড়াই করতে হয় সেটা এই গল্পের মূখ্য উপজীব্য। সনাতন অল্প বয়স থেকে ছিল অত্যন্ত হিসাবী। তাই স্ত্রীর গহনা বিক্রি করে দোতলা বাড়ি তুলেছিল। এই শোকে তার স্ত্রী আত্মহত্যা করে। এই ঘটনা তার মনে যে পাপবোধ ও অনুশোচনা সৃষ্টি করে সেখান থেকেই প্রতিদিন নিয়ম করে ঘুমের আগে ও পরে অনুতাপ করা এবং মদ্য পানের শুরু। এই মদ্যপান আসলে তার নিজেকে ধ্বংস করা ও সান্ত্বনা দেওয়ার প্রবণতাকে চিহ্নিত করে। লেখকের কথায়, "কে নিজের জন্য ছাড়া সব রকমে নিজেকে ধ্বংস করে।"[২৫] তার মতে সব মানুষই কোনো না কোনো পাপ করে। কিন্তু অনুতাপ করে না। অপরাধ করার চেয়ে অনুতাপ করা বেশী গুরুত্বপূর্ণ। সে মেয়ের মনে ব্যথা দিতে চাইত না

বলে মেয়ে যত দিন বাড়িতে ছিল তত দিন অধিক মাত্রায় মদ্যপান করত না। কিন্তু মেয়ে চলে যাবার পর তার মদ্যপানের মাত্রা এত বেড়ে যায় যে, সে মাঝে মধ্যে অচৈতন্য হয়ে পড়ত। সনাতন হিসাবী ও নিজের স্বার্থ রক্ষায় বিশেষ তৎপর। মেয়ে তার তৈরি বাড়ি উত্তরাধিকারসূত্রে পাবে বলে মেয়ের বিয়েতে সে বেশি টাকা খরচ করেনি। আবার যখন টাকার অভাব দেখা দিয়েছে তখন সে মেয়ে ও জামাইকে বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছে। টাকা না পেলে তাদের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়েছে।

লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তার জীবনের প্রেম-প্রীতি ও মায়ামমতার দিকটিও সযত্নে চিত্রিত করেছেন। মেয়ের সংসারে আশ্রিতা অনিমার প্রতি তার গভীর মমত্ব বোধ ছিল। তাকে সে মেয়ের সব রকম অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করে। তার নাক টানার শব্দে অনিমার কান্না সে অনুমান করে। তাকে আদর করে সান্ত্বনা দেয়। এমনকি মেয়ের চোখের জল দেখলেও সে স্থির থাকতে পারে না।

'তমসা' গল্পের পঙ্ক্ষের মতো তীব্র ছিল তার অনুভূতির জগৎ। সনাতন বলে যে, ভগবান দয়া করে তার চোখ দুটো কানে দিয়েছে। তাই বাড়িতে যেকোনো অজানা অচেনা শব্দ হলে তার বুঝতে দেরী হয় না। এই শব্দ সচেতনতাকে কাজে লাগিয়ে দৃষ্টিহীনতার অজুহাতে সে তার মেয়ের প্রতি অত্যাচারের প্রতিশোধ নেয়। ভুল করে মহামায়ার শাশুড়ির পা মাড়িয়ে দেয়, 'বিড়াল মারার ছলে' তাকে লাঠি ছুঁড়ে মারে এবং আহত স্থান পরীক্ষা করার ছলে তার চোখে খোঁচা দেয়। এক্ষেত্রে দৃষ্টি না থাকা তার কার্যসিদ্ধির সহায়ক। শব্দসচেতনতার মতো লেখক তার স্পর্শ শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। মেয়ের কান্নায় সন্দেহ হলে সে স্পর্শ করে চোখের জল দেখে। আবার মেয়ের গলার হার কিম্বা হাতের সোনার বালা স্পর্শ করে মেয়ের প্রতি তার ঘৃণার উদ্রেক হয়, কারণ গহনার জন্য একদিন তার স্ত্রী আত্মহত্যা করেছিল।

এভাবে সনাতন চরিত্রটি হয়ে উঠেছে ভালো-মন্দে মেশানো রক্তমাংসের জীবন্ত মানুষ। তার মধ্যে একইসঙ্গে নিজেকে ধ্বংস করা এবং অন্যকে আঘাত করার প্রবণতা দেখা দিয়েছে। ফ্রয়েডীয় পরিভাষায় এরস ও থ্যানাটস উভয়ই তার চরিত্রে একইসঙ্গে সক্রিয়। দৃষ্টিহীনতা সত্ত্বেও লেখক তার যে সজাগ দৃষ্টি এবং সক্রিয়তা এই গল্পে উপস্থাপন করেছেন, সমকালীন সমাজবাস্তবতার প্রেক্ষিতে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। পূর্ববর্তী গল্পকারদের তুলনায় সনাতন চরিত্রটি স্বতন্ত্র্য হয়ে উঠেছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর গুণে। সনাতনের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের পাশাপাশি তার সামাজিক পারিবারিক অবস্থানটি লেখক গুরুত্বের সাথে দেখিয়েছেন। সমাজ ও পরিবার তাকে বর্জন করতে পারেনি। তার জীবনের যেটুকু একাকিত্ব তাকে এক রকম স্বেচ্ছা নির্বাসন বলা যায়। এর মূলে রয়েছে তার হিসাবী মনোভাব এবং নিজ কৃতকর্মের জন্য পাপবোধ বা অপরাধবোধ জাত এক ধরণের অনুশোচনা।

আততায়ী: *'সমুদ্রের স্বাদ* গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'আততায়ী' গল্পের কৃত্তিবাসের অবস্থান সনাতনের বিপরীতে। সনাতনের সজাগ দৃষ্টি ও সক্রিয় ব্যক্তিত্বের জন্য সমাজ ও পরিবার তাকে বঞ্চিত করতে পারে নি। কিন্তু কৃত্তিবাসের বন্ধুপ্রীতি এবং সচেতন ব্যক্তিত্বের অভাব সর্বোপরি তার দৃষ্টিহীনতা ছোটবেলা থেকে তাকে অবজ্ঞা ও বঞ্চনার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। একই গ্রামের একটি পুকুরের দুপারে দুই বন্ধু কৃত্তিবাস ও দিবাকরের বাস। একদিন স্কুল না গিয়ে দুই বন্ধু খেলা করছিল। এই অপরাধে কৃত্তিবাসের বাবা ধনদাস দুজনকে প্রহার করে। এর প্রতিশোধ নিতে দুই বন্ধু মিলে ধনদাসের বাড়ির চালে আগুন লাগিয়ে দেয়। পরদিন জানা যায় যে, এই কর্মকাণ্ডের নায়ক ধনদাসের পুত্র কৃত্তিবাস। ধনদাস অত্যন্ত বদমেজাজি, তিনি একটি জ্বলন্ত বাঁশ তুলে পুত্রের মুখে-বুকে, পিঠে আঘাত করেন। এই আগুনের চিহ্ন তার শরীরে চিরস্থায়ী ক্ষত সৃষ্টি করে এবং তার একটি চোখ

সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। লাঞ্ছনা, বঞ্চনা এড়িয়ে সে দিবাকরকে নিয়ে পিসির কাছে গিয়ে আশ্রয় নেয়।

কৃত্তিবাসের শরীরে আগুনের চিরস্থায়ী ক্ষতচিহ্ন এবং এক চোখের দৃষ্টি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাওয়া যেমন তার শারীরিক সৌন্দর্য হানি করে তেমনই জীবনের স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ গতি বাধা প্রাপ্ত হয়। তাই পিসির কাছে কৃত্তিবাসের তুলনায় দিবাকর বেশী আদর ও যত্ন পেতে আরম্ভ করে। একদিন কৃত্তিবাস পিসির আশ্রয় ছেড়ে একটি মেসে গিয়ে ওঠে। পিসির মৃত্যুর পর দিবাকরও সেখানে গিয়ে হাজির হয়। দুজনে ডাক্তার হয়ে ওঠার পর কৃত্তিবাসের অর্থে লালিত দিবাকর ডাক্তারিতে পসার জমায়। কৃত্তিবাসের স্ত্রী মহামায়া গ্রাম ছেড়ে শহরে কৃত্তিবাসের সাথে চলে আসার পর দিবাকর সম্পর্কে তার আপত্তির কথা জানায়। কিন্তু ব্যক্তিত্বের অভাব ও বন্ধুপ্রীতি মহামায়াকে আহত করলেও শেষ পর্যন্ত সে দিবাকরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। দিবাকর একদিন কৃত্তিবাসের চোখ অপারেশনের নামে কৃত্তিবাসের দ্বিতীয় চোখটি নষ্ট করে দেয়। এই সুযোগে সে বন্ধুপত্নীকে আত্মসাৎ করে। লেখকের কথায়, "তাহার কানে যেন নারীপুরুষকণ্ঠের ফিসফিসানির বজ্রপাত হইতে আরম্ভ হইল। সে বজ্রাহতের মতো দাঁড়াইয়া রহিল।"[২৬] কৃত্তিবাস বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার পর তার মূল্যবান সম্পত্তির একটি দলিল দিবাকরের নামে পাঠিয়ে দেয়। লেখক এই ঘটনাকে কৃত্তিবাসের নিষ্ক্রিয় প্রতিশোধ বলেছেন। গল্পটি শেষ হচ্ছে লেখকের অমোঘ মন্তব্য দিয়ে, "কৃত্তিবাসের মতো মানুষদের ওপর দিবাকরদের মতো মানুষরা এরকম চাল চালিয়া আসিতেছে।"[২৭]

দৃষ্টিহীনতার কারণে কৃত্তিবাসের জীবনের যে বঞ্চনা ও অসম্মান নেমে এসেছে গল্পকার নির্বিকারভাবে সে বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন। মানুষ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য মানুষকে প্রতিবন্ধী বানাই সচেতনভাবে লেখক সে বিষয়টি দেখিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে ফাল্গুনীবাবুর মন্তব্যটি উল্লেখ্য, " 'আততায়ী' গল্পে তিনি দেখালেন নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য মানুষ মানুষকে

কিভাবে প্রতিবন্ধী করে দেয় তার হীন চেষ্টা আর সফলতাকে।"[২৮] এই গল্পে গল্পের নামকরণের ক্ষেত্রেও রয়েছে তার শিল্পীসুলভ মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয়। গল্পের শুরুতে আগুনের বর্ণনা আছে, আবার 'আততায়ী' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো ঘাতক বা আক্রমণকারী, এখানে বন্ধু দিবাকর কৃত্তিবাসের অর্থে লালিত হওয়া সত্ত্বেও আততায়ীর ভূমিকা পালন করে। সেদিক থেকে 'অন্ধ', 'অন্ধের বউ' ইত্যাদির তুলনায় এই নামকরণ তাৎপর্যবাহী হয়েছে। এমনকি পূর্ববর্তী 'তমসা' ও 'রজনী'র ক্ষেত্রে যেমন অন্ধকারের উপমা ব্যবহার করা হয়েছে এক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ঘটেছে। সব মিলিয়ে আততায়ী গল্পটি কৃত্তিবাসের সামাজিক ও পারিবারিক বঞ্চনার দলিল হয়েও শিল্পরীতির দিক দিয়ে নিজ স্থান অধিকার করেছে।

অন্ধের বউ: এই গল্পের প্রধান চরিত্র ধীরাজের হঠাৎ অসুখে দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। মানসিকভাবে এই ঘটনা তার স্ত্রী সুনয়নার মনে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে তা এই গল্পের প্রধান উপজীব্য। ধীরাজ কোনো মতেই তার অবস্থা মেনে নিতে পারে না। তার ধারণা ডাক্তারি চিকিৎসার পর সে ক্ষীণ দৃষ্টি ফিরে পাবে। তার নিজের মনে এবং সুনয়নার মনে এই ঘটনা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনিশ্চয়তা তৈরি করে। কিন্তু এই অবস্থাতেও সে নিজেকে শান্ত ও সংযত রাখে। সর্বপ্রকারে স্বামীর সহায়তা করে। গল্পের নামকরণ তার এই ভূমিকাকে ইঙ্গিত করেছে।

ধীরাজ ও সুনয়না যখন উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছে তখন আত্মীয়-স্বজনদের অনেকে সুনয়নার প্রতি কপট সহানুভূতি প্রদর্শন করে। এই ঘটনা ধীরাজকে আরো উত্তেজিত করে তোলে। সে মনে করে তার যত্ন করতে গিয়ে সুনয়না নিজের প্রতি অবহেলা করছে। তাই সে বলে "কচি ছেলের মতো যত খুশি আমাকে ভোলাও।"[২৯] এই সময় পাড়া-প্রতিবেশীদের লোকদেখানো সহানুভূতিও তাদের দুজনকে বিব্রত করে। এইসব ঘটনা

দৃষ্টিহীনতা এবং সমাজে দৃষ্টিপ্রতিস্পর্ধীদের প্রতি মনোভাবকে ইঙ্গিত করে। লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় স্বল্প পরিসরে শিল্পের এক আঁচড়ে সমাজের নেতিবাচক মনোভাবটি তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন।

অন্ধ ও ধাঁধা: এই গল্পটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১৯৪৫ সালে প্রকাশিত *হলুদ পোড়া* গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত। এই গল্পের প্রধান চরিত্র অধর, হেরম্ব ও রাধা। অধর চল্লিশ বছর বয়সে ওষুধের প্রতিক্রিয়ায় দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছে। তার স্ত্রী রাধা দিনরাত সেবা করে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। কিন্তু অসুখের কারণে তার অকাল মৃত্যু ঘটে। অধর এবং রাধার কাহিনীবৃত্তটি এখানে হেরম্বের দৃষ্টিকোণে পরিবেশিত হয়েছে। নিজের ঘরে হেরম্বের উপস্থিতি বুঝতে পেরে অধর বলে যে, তার ঘরে হেরম্বের ভালো লাগবে না কারণ সেখানে হাসি নেই, আনন্দ নেই, চোখে চোখে চাওয়া নেই, শুধুই অন্ধকার। অধরের এই উক্তিতে তার হতাশা ও যন্ত্রণার দিকটি পরিস্ফুট হয়েছে। আবার রাধার অধরকে বাঁচিয়ে তোলার যে আকুতি তার মধ্যেও রয়েছে তার জীবনের ব্যর্থতা ও হতাশাবোধ। রাধা নিঃসন্তান সে কারণেই হয়তো চল্লিশ বছরের স্বামীকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এমন তীব্র আকুতি। আবার, দৃষ্টিশক্তি হারালে মানুষ অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হয় সেইজন্যই হয়তো তার স্ত্রী তাকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। হেরম্বের এই ধারণা সমাজে দৃষ্টিহীনদের সম্পর্কে প্রচলিত বিশ্বাসের কথা মনে করিয়ে দেয়। তাই গল্পটি দাম্পত্য জীবনের দলিল হওয়া সত্ত্বেও দৃষ্টিপ্রতিস্পর্ধী কেন্দ্রীক ভাবনার দিক থেকেও উল্লেখযোগ্য।

দৃষ্টিপ্রতিস্পর্ধীদের নিয়ে লেখা এই চারটি গল্প মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামগ্রিক শিল্পকীর্তিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। সমাজবাস্তবতার প্রেক্ষাপটে তাদের বঞ্চনা ও সংগ্রামের কাহিনি সজীবতা, সক্রিয়তা এবং মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন তিনি দক্ষতার সাথে উপস্থাপন করেছেন। শুধু মাত্র অন্ধকারের ব্যঞ্জনা কিম্বা তাদের একঘেয়ে জীবনচিত্র চিত্রণের মধ্যে

তিনি সীমাবদ্ধ থাকেন নি। মানুষের ভালো-মন্দ সবরকম সম্ভাবনাকে তিনি শিল্পের সততায় উপস্থাপন করেছেন। তাদের অনুভূতির জগৎ, ইন্দ্রিয়সচেতনতা ইত্যাদি বিষয় অক্ষুণ্ণ রেখে রক্তমাংসের জীবন্ত মানুষরূপে সাহিত্যে আর পাঁচটা চরিত্রের পাশে তাদের প্রতিষ্ঠা করেছেন। এখানেই শিল্পী হিসাবে নতুন যুগের কথাকার রূপে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব।

আমাদের আলোচ্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই চারটি গল্প পর্যালোচনা করে বলা যেতে পারে -

প্রথমত, দৃষ্টিহীন ব্যক্তিরাও আর পাঁচটা চরিত্রের মতো ভালো-মন্দে মেশানো মানুষ।

দ্বিতীয়ত, নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য অনেক ক্ষেত্রে মানুষ মানুষকে প্রতিবন্ধী বানায়। প্রতিবন্ধকতা এখানে শোষণের হাতিয়ার। যারা এই কাজ করে তারা তথাকথিত সুস্থ, স্বাভাবিক, সক্ষম চরিত্রের মানুষ।

তৃতীয়ত, দৃষ্টিহীনতার সঙ্গে অলৌকিক ক্ষমতার সামাজিক মিথ সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিদ্যমান।

৫.১১ সোমেন চন্দ (১৯২০-১৯৪২ খ্রীঃ)

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সোমেন চন্দের পরিচয় প্রসঙ্গে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন- "সোমেন চন্দ প্রবলভাবেই সমাজ সচেতন ও রাজনৈতিক ভাবনায় নিষ্ঠ। আর মানুষের প্রতি ছিল তাঁর গভীর নিবিড় ভালোবাসা। এক প্রখর সমাজবোধই তাঁর রচনার উৎস।"[৩০] সোমেন চন্দ বিশ শতকের চারের দশকে একজন সম্ভাবনাময় লেখক। তিনি বাংলার প্রগতি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয়ে কবি সুকান্তের মতো তার অকাল প্রয়াণ ঘটে। কিন্তু অল্প বয়সের মধ্যে তিনি বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। সময়ের দিক থেকে তিনি তারাশঙ্কর ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

সমসাময়িক। সত্তরের দশকে দিলীপ কুমার মজুমদার এই অকাল প্রয়াত প্রতিভাবান লেখককে নিয়ে প্রথম গবেষণা করেন। তারই উদ্যোগে সোমেন চন্দ এবং তার রচনা সংগ্রহ প্রকাশিত হয়। সোমেন চন্দের ইঁদুর গল্পটি বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। ১৯৩৭ সালে *দেশ পত্রিকায়* তাঁর প্রথম গল্প 'শিশু তপন' প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৩৮ সালের মধ্যে তাঁর ১১টি ছোটগল্প নানান পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পগুলি হলো, 'দাঙ্গা', 'ভালো না লাগার শেষ', 'সংকেত' ইত্যাদি। দৃষ্টিপ্রতিস্পর্ধীদের নিয়ে লেখা 'অন্ধ শ্রীবিলাসের অনেক দিনের একদিন' গল্পটি 'সোমেন চন্দ এবং তার রচনা সংগ্রহ'এ স্থান পেয়েছে। আমাদের আলোচ্য গল্পটি তাঁর *মুহূর্ত কথা* গল্প সংকলন থেকে সংগৃহীত।

অন্ধ শ্রীবিলাসের অনেক দিনের একদিন: এই গল্পের প্রধান চরিত্র দৃষ্টিপ্রতিস্পর্ধী শ্রীবিলাস, তার স্ত্রী বিন্দু, তিন ছেলেমেয়ে হেবো, কেলো এবং সদুকে নিয়ে চারজনের পরিবার। পারিবারিক ক্ষেত্রে যে শ্রীবিলাস কীভাবে জীবন যাপন করে, বিশেষত তার দাম্পত্য জীবন এই গল্পের মূখ্য উপজীব্য। গল্পের শুরুতে ভোরের বর্ণনা আছে। শ্রীবিলাসের জীবনে অবসর বেশী অথবা তার কাছে দিনরাত্রির তফাৎ নেই তাই সে সবার আগে ঘুম থেকে ওঠে। ঘুম থেকে উঠেই শ্রীবিলাস তার লাঠির খোঁজ করে। এই লাঠির সাহায্য ছাড়া সে বাড়িতে এবং বাড়ির বাইরে এক পা চলাফেরা করতে পারে না। মনে হয় লেখক এখানে 'অন্ধের যষ্ঠী' এই সামাজিক প্রবাদের প্রসঙ্গটি ব্যবহার করেছেন। লেখকের কথায় "ঘুম থেকে উঠে প্রথমে খুঁজবে লাঠি, এটা ছাড়া সে চলতে পারে না। তার অন্ধত্বকে সে কতকটা উপহাস করে এই লাঠির সাহায্য নিয়ে।"[৩১] গল্পকার তাকে এমনই অক্ষম এবং অসহায়ভাবে চিত্রিত করেছেন যে, লাঠির সাহায্য কিম্বা ছোট মেয়ে সদুর সাহায্য ছাড়া সে বাড়ির বাইরে জলের কল পর্যন্ত যেতে পারে না। এই অক্ষমতার কারণে সমাজে ও পরিবারে তার ভূমিকা নিষ্ক্রিয়। ছোট-ছোট ছেলেমেয়েগুলো পর্যন্ত তাকে অমান্য করে। ঘরে-বারান্দায় পায়চারি

করা, ছেলেমেয়েদের তর্জন-গর্জন করা আর বসে বসে ঝিমানো ছাড়া তার আর কোনো কাজ নেই। লেখকের কথায় "অন্ধের আর কি কাজ"।[৩২]

এই শ্রীবিলাসের জগৎ ও জীবন সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা আছে। এক্ষেত্রে গল্পকারের সদর্থক ভূমিকা প্রশংসনীয়। শ্রীবিলাস প্রতিবেশী বীরুকে বলে, "অল্প মাইনে পাও দুজনের পেট কী করে চলবে এতে?"[৩৩] এই বক্তব্যটি তার বাস্তব বোধের পরিচয় বহন করে, আবার জীবন সম্পর্কে তার উপলব্ধি "কিছু সাথে যাবে না, কেউ সঙ্গে যাবে না, স্ত্রীপুত্র নয়, ভাই-বোন নয়, ধনদৌলত নয়।" [৩৪]এর পর শ্রীবিলাস গুনগুনিয়ে পরলোকত্ব বিষয়ে একটা গান ধরল। জীবনের সবটুকুই যার অবসর এমন মানুষের পক্ষে ক্ষিধে বিশ্বত কামনাকে ভুলে থাকা সম্ভব নয়। তাই সামান্য মুড়ির ভাগ না পেলে সে ছেলেমেয়েদের প্রতি আক্রোশে ফেটে পড়ে। বিন্দু সারাদিন পরের বাড়িতে পরিশ্রম করে আসার পর বিছানায় তাকে সঙ্গ দিতে না পারলে সে সম্মান হানির ভয় দেখিয়ে বিন্দুকে সঙ্গ দিতে বাধ্য করে, "তোমার চোখে কি ঘুম নেই, তোমার চোখের আগুন নেভাও। আমি তো আর পারি নে"।[৩৫]

গল্পকার তাকে খিদে ও কামনায় অন্ধ, সমাজ ও পরিবারের পক্ষে অসহায় ও নিষ্ক্রিয় চরিত্র রূপে চিত্রিত করেছেন। সমালোচকের মতে, "রাত্রে তার স্ত্রী বিন্দু কর্মক্লান্ত ফিরে এসেও নিস্তার পায় না। শ্রীবিলাস তাকে চায়, তার ভেতরের ক্ষুধা-তৃষ্ণা কামনার রক্তিমতার বাস্তব প্রতিবেদন গল্পটি।"[৩৬] বাস্তবে এই জাতীয় চরিত্রের সঙ্গে এই গল্পের অভিজ্ঞতাকে মেলানো যায় না। এর মূলে থাকতে পারে লেখকের নিজস্ব মনস্তত্ত্ব অথবা যথার্থ বাস্তব অভিজ্ঞতার অভাব। ১৮৭৭ সালের '*রজনী* এবং তার পরবর্তীকালের নানান ছোটগল্পের দৃষ্টিপ্রতিস্পর্ধীদের যেমন সজাগ ও সক্রিয়ভাবে চিত্রিত করা হয়েছে এক্ষেত্রে গল্পকার যেন বিপরীত পথে যাত্রা করেছেন। যদিও লেখক বাস্তব সমাজ ও পরিবারের প্রেক্ষাপটটি

বিশ্বাসযোগ্যতার সাথে চিত্রিত করেছেন, শ্রীবিলাসের জীবন ও জগৎ সম্পর্কে ধারণা, তার সময় আন্দাজ করার ক্ষমতা এমন বেশ কয়েকটি সদর্থক বিষয় এই গল্পে দেখিয়েছেন। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে এই জাতীয় চরিত্রের বিকাশের ক্ষেত্রে কিছু ঘাটতি থেকে গেছে। প্রগতি আন্দোলনের একজন লেখক হিসাবে তার বাস্তব পরিবেশ রচনার দক্ষতা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। খিদে এবং কামনার কাছে মানুষের আত্মসমর্পণ সমসাময়িক অনেক কথাকারের বৈশিষ্ট্য। সেদিক থেকে শ্রীবিলাস চরিত্রটি গল্পের পরিবেশের সঙ্গে মানানসই মনে হতে পারে, কিন্তু দৃষ্টিপ্রতিস্পর্ধী হিসাবে শ্রীবিলাসের চরিত্রের বিকাশ আর একটু বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে চিত্রিত হলে কথাসাহিত্যের এই গল্পটি এক অনন্য সৃষ্টির মর্যাদা লাভ করতে পারতো। এই গল্পটিপাঠ ও বিশ্লেষণ থেকে বলা যেতে পারে -

প্রথমত, দৃষ্টিহীনতার কারণে শ্রীবিলাস পরিবারে থাকা সত্ত্বেও বহুলাংশে সমাজ ও পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন।

দ্বিতীয়ত, দৃষ্টিহীনতা সম্পর্কে প্রচলিত বিভিন্ন মিথ ও প্রবাদ প্রবচনকে এই গল্পে ব্যবহার করা হয়েছে।

তৃতীয়ত, দৃষ্টিহীনতা সমাজে ও পরিবারে তার ভূমিকাকে নিষ্ক্রিয় করে তুলেছে।

চতুর্থত, দৃষ্টিহীনতার কারণেই যেন সে দার্শনিক মনোভাবাপন্ন।

৫.১২ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭৯ খ্রীঃ)

এই বিশিষ্ট সাহিত্যিক বাংলা সাহিত্যে বনফুল ছদ্মনামে পরিচিত। তিনি বাংলা সাহিত্যে অণুগল্প রচনার ক্ষেত্রে অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপকার। এক-একটি পোস্টকার্ড প্রমাণ অণুগল্প রচনা করে তিনি পাঠক সমাজকে বিস্মিত করেন। শুধু আকারের দিক থেকে নয়, ভাবের সংহতি এবং ভাষার সংযম তার গল্পগুলিকে অনন্য মাত্রা দান করেছে। 'নিমগাছ', 'তাজমহল', 'পাশাপাশি' বাংলা অণুগল্পের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। ১৮৯৯ থেকে ১৯৭৯ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে

তার এই দীর্ঘায়ু জীবনে ডাক্তারি করার পাশাপাশি সমান গুরুত্বের সাথে সাহিত্যচর্চা করে গেছেন। ছোটগল্প ও উপন্যাসের বিষয়ে ও রূপরীতির নির্মাণে তিনি আজীবন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যাপৃত ছিলেন। আমাদের আলোচ্য দৃষ্টিপ্রতিস্পর্ধীদের নিয়ে লেখা 'অজান্তে' ও 'চোখ গেলো' গল্প দুটি তাঁর রচনাবলীর প্রথম খণ্ড থেকে সংগৃহীত। তাঁর *গল্পগুচ্ছ* সংকলনে এই গল্প দুটি স্থান পেয়েছে।

অজান্তে: 'অজান্তে' গল্পের কথক মাইনে পেয়ে তার স্ত্রীর জন্য নতুন জামা কিনে এক বৃষ্টিমুখর সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরছিলেন। গলির অন্ধকারে অন্য আর একটি লোকের সঙ্গে ধাক্কায় দুজনেই মাটিতে পড়ে যায়। তার নতুন জামাটি কাদায় নষ্ট হয়ে যায়। কথক নির্মমভাবে ওই ব্যক্তিকে প্রহার করে। শেষে জানা যায় যে, পথের কাদায় পড়ে যাওয়া প্রহৃত ব্যক্তিটি শ্রবণ ও দৃষ্টিপ্রতিস্পর্ধী। এই গল্পে গল্পকার আত্মকথনের ভঙ্গীটি অনুসরণ করেছেন। এর ফলে গল্পটি সহৃদয় পাঠকের কাছে হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে ছোট একটি ঘটনার মাধ্যমে লেখক প্রতিস্পর্ধীদের প্রতি সমাজের মনোভাবটি চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন। "মারের চোটে সে বেচারা কাঁপছে, গাময় কাদা। আমার দিকে কাতর মুখে অন্ধ দৃষ্টি তুলে দুটি হাত জোর করে আছে"।[৩৭] এই বক্তব্য যেন লাঞ্ছিত-নির্যাতিত প্রতিস্পর্ধীদের সমাজে মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকার প্রার্থনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

এই গল্পের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষণীয় গল্পকার প্রতিস্পর্ধী মানুষটির কোনো নাম দেননি। তার মতো প্রতিস্পর্ধী ব্যক্তিরা যারা ভিক্ষা করে জীবন যাপন করে সমাজে তাদের নামকরণের কোনো তাৎপর্য নেই। মানুষ হিসাবে তাদের অস্তিত্ব সংকটাপন্ন। নাম উল্লেখ না করার মধ্যে দিয়ে গল্পকার একইসঙ্গে ওই ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান এবং প্রতিস্পর্ধীদের প্রতি সামাজিক মনোভাবের প্রতি অঙ্গুলি সংকেত করেছেন। এই কারণেই হয়তো গল্পের নাম 'অজান্তে'।

চোখ গেলো: 'অজান্তে' ও 'চোখ গেলো' গল্প দুটি যেন পরস্পরের পরিপূরক। একটিতে আছে মানুষের স্বার্থপরতার কাহিনি অন্যটিতে প্রেমের জন্য নির্মম আত্মদানের কথা। এই গল্পের নায়িকা মিনির চোখ দুটো ছিল সবচেয়ে সুন্দর। লেখকের কথায় "এমন স্বপ্নময় সুন্দর চোখ আমি জীবনে কখনো দেখিনি"।[৩৮] এত সুন্দর লোভনীয় চোখ দুটি সে তার প্রেমিককে না পাওয়ার জন্য গোলাপজল মাখার ছুতোয় অন্য ওষুধ প্রয়োগ করে সম্পূর্ণ রূপে নষ্ট করে। গল্পের শেষে তার মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। "আমার চোখ যে কেন গেলো তা যদি বুঝতে না পেরে থাকো তাহলে ....."[৩৯]

এই গল্পের ক্ষেত্রেও আত্মকথনের ভঙ্গীটিই অনুসৃত। সামান্য কথায় মানুষের জীবনের এমন মর্মান্তিক সত্য উদ্ঘাটন বনফুলের পক্ষেই সম্ভব। প্রথম গল্পটিতে যেমন প্রতিস্পর্ধীদের প্রতি সামাজিক মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে, দ্বিতীয় গল্পে এ ধরণের প্রচেষ্টা নেই। এই গল্পে গুপ্ত প্রেম এবং প্রেমের জন্য আত্মদানের কথা বড়ো হয়ে উঠেছে। চোখ গেলো পাখির অনুষঙ্গকে গল্পের নামকরণের মধ্যে দিয়ে গল্পকার শিল্পের কৌশলে প্রকাশ করেছেন। এই বিশিষ্ট কথাকার অল্প কথায় শিল্পের এক আঁচড়ে হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো যে সত্যকে প্রকাশ করে তা পাঠকের মর্মকে বিদ্ধ করে। এখানেই শিল্পী হিসাবে তার কৃতিত্ব।

৫.১৩ সুবোধ ঘোষ (১৯০৯-১৯৮০ খ্রীঃ)

সুবোধ ঘোষ বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাকার। ১৯০৯-১৯৮০ খ্রীস্টাব্দ তার জীবনের সময়কাল। তিনি কর্মমুখর জীবনের নানা অধ্যায় অতিক্রম করে সাহিত্য জগতে প্রবেশ করেন। বাসের একজন কণ্ডাক্টর রূপে তিনি তার কর্মজীবন শুরু করেন। সার্কাস দলের ক্লাউনের ভূমিকায় নাম লিখিয়েছিলেন। মুম্বাই মিউনিসিপ্যালিটিতে ঝাড়ুদারের কাজ করেছেন। মহামারির টিকা দিতে পূর্ব আফ্রিকায় পাড়ি দিয়েছিলেন।

স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য জেল খেটেছেন। এর পর আনন্দবাজার পত্রিকায় সম্পাদনার কাজ করেছেন। পুরাতত্ত্ব, প্রত্নবিদ্যা এবং সামরিক বিদ্যায় তার দক্ষতা ছিল। 'ফসিল' ও 'অযান্ত্রিক' গল্প দুটি রচনার মাধ্যমে পাঠকসমাজকে বিস্মিত করে তিনি সাহিত্যের আঙিনায় প্রবেশ করেন। তার রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে *পরশুরামের কুঠার, তিলাঞ্জলি (১৯৪৪ খ্রী), গঙ্গোত্রী (১৩৫৪), শতকিয়া (১৯৫৮ খ্রীঃ)* বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তার বিচিত্র কর্মময় জীবন সাহিত্যকে প্রভাবিত করে। মানুষ ও মানুষের জীবন সম্পর্কে বিচিত্র অভিজ্ঞতা এবং মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য তিনি বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয়।

চোখ গেলো: তাঁর রচিত 'চোখ গেলো' গল্পটি দৃষ্টিপ্রতিস্পর্ধীদের নিয়ে লেখা অন্যান্য গল্পের তুলনায় মৌলিক ও স্বতন্ত্র। এই গল্পে প্রথম দৃষ্টিপ্রতিস্পর্ধীদের আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। গল্পের প্রধান চরিত্র হিরণ্ময় একজন আয়রন কোম্পানির মালিক। হিরণ্ময় ও অপরাজিতার দাম্পত্য সমস্যা, তাদের বন্ধু কিংশুককে ঘিরে ত্রিকোণ প্রেমের সম্ভাবনা এবং সমাধান গল্পের মুখ্য উপজীব্য।

এই গল্পে হিরণ্ময় এবং অপরাজিতা সম্পর্কে আলাদা করে আলোচনার অবকাশ আছে। অপরাজিতা মহিয়সী হওয়ার লোভে কিংশুককে প্রত্যাখ্যান করে এবং হিরণ্ময়কে জীবনসঙ্গী হিসাবে বেছে নেয়। কিন্তু জীবনের বাস্তব পরিস্থিতি তাদের দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে অপরাজিতাকে বীতশ্রদ্ধ করে তোলে। বিয়ের আগে যে হিরণ্ময়কে তার 'মায়াবী চাঁদ' বলে মনে হতো সে হিরণ্ময়কে তার 'মৃত চাঁদ' বলে মনে হয়। হিরণ্ময়ের জীবনে দৃষ্টির অভাব এবং অপরাজিতার প্রতি তার নির্ভরতা সে ভালোভাবে মেনে নিতে পারে না। পাড়া-প্রতিবেশীর নানা মন্তব্য তাকে যে বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয় সেই পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই করার মতো মনের জোর তার ছিল না। ফলে বিয়ের এক বছরের মধ্যে তার মনে যে বিরক্তি ও শূন্যতার সৃষ্টি হয় কিংশুক তার সুযোগ নিয়ে অপরাজিতার

জীবনে প্রবেশ করতে চায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত "মানুষ দুটো চোখ দিয়ে কেবল তাকায়, দেখে না"[৪০] কিম্বা "তোমার সুন্দর দুটো চোখ পাথরের নয় গো, আলোর চোখ"[৪১] এই উপলব্ধি তাকে আবার হিরণ্ময়ের কাছে ফিরিয়ে আনে। যে অভাব একদিন তাকে হিরণ্ময়ের থেকে আলাদা করে দিতে চেয়েছিল হিরণ্ময়ের জীবনে সেই আলোর উপস্থিতি তার জীবনবোধ বদলে দেয়। শেষ পর্যন্ত সে বলে "তুমি কি ভয়ঙ্কর দেখতে পাও।"[৪২]

হিরণ্ময় একজন আয়রন কোম্পানির মালিক হলেও তার মধ্যে কোনো রকম অহংবোধ নেই। বাড়ির চাকর মধু এবং কোম্পানির কর্মচারীদের সাথে তার মধুর বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার তাকে সহৃদয় সামাজিক মানুষের মর্যাদা দিয়েছে। স্ত্রীর অপমান ও লাঞ্ছনাতেও সে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে না। কোম্পানির উপরিভাগে রাজীব বসুর মতো ভালো মানুষকে স্থান দেওয়ার মধ্যেও তার দূরদর্শীতার পরিচয় আছে। তার দূরদর্শী মানসিকতা এবং পরসহিষ্ণু মন শেষ পর্যন্ত বিপথগামী স্ত্রীকে নিজের কাছে ফিরিয়ে আনে।

গল্পকার 'তমসা' গল্পের পঙ্কের মতো তার মধ্যেও তীব্র ইন্দ্রিয়সচেতনতার কথা এই গল্পে প্রকাশ করেছেন। শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ, হিরণ্ময়ের জীবনের প্রধান অবলম্বন। অপরাজিতার দীর্ঘশ্বাসের শব্দে সে তার মনোকষ্ট বুঝতে পারে। হাতের চুড়ির শব্দে সিঁদুর মুছে ফেলার ঘটনাটি আন্দাজ করে। তার ব্যবহারের কলমটি অপরাজিতা অন্যত্র সরিয়ে রাখলে সে ওই কলমে তার স্ত্রীর দেহসৌরভ অনুভব করে। দূরদর্শিতার পাশাপাশি তার এই ইন্দ্রিয়সচেতনতা বাস্তব প্রেক্ষাপটে তাকে আরো গভীর সংবেদনশীল এবং সক্রিয় চরিত্রের মর্যাদা দান করেছে।

গল্পকার হিরণ্ময়ের জীবনের দুঃখ বঞ্চনার কাহিনি বলার পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডে তার অংশগ্রহণের বিষয়টি দেখানোর মধ্যে দিয়ে পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে একজন সচেতন মানুষ হিসাবে তার ভূমিকা দক্ষতার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। হিরণ্ময়ের

উপস্থিতিতে কিংশুক অপরাজিতার সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়। হিরণ্ময়ের কথায় অপরাজিতা আত্মসংবিত ফিরে পায়। এই পরিস্থিতিতে কিংশুক চলে যেতে বাধ্য হয়। এই চলে যাওয়ার ঘটনা সম্পর্কে হিরণ্ময় প্রশ্ন করলে উত্তরে অপরাজিতা জানায়, "একটা চোখ গেলো পাখি ঘরে ঢুকেছিল, পালিয়ে বাঁচলো"।[৪৩] উপসংহারের এই চমৎকারিত্বটুকু গল্পকারের স্বতন্ত্র্য শিল্প প্রতিভাকে চিহ্নিত করে। সময়ের প্রেক্ষাপটে দৃষ্টিপ্রতিস্পর্ধীদের সামাজিক বিবর্তন এই গল্পে যেভাবে ধরা পড়েছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে। এই গল্পটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে -

প্রথমত, সহানুভূতির পরিবর্তে গল্পকার হিরণ্ময়কে একজন সামাজিক মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন যা বাংলা সাহিত্যে বিরলদৃষ্ট এবং তার ইন্দ্রিয়সচেতন অনুভূতির জগৎ তাকে একজন সংবেদনশীল মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

দ্বিতীয়ত, মহিয়সী হওয়ার লোভে হিরণ্ময়কে বিয়ে করার প্রসঙ্গের মধ্যে আর্থিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ।

তৃতীয়ত, প্রতিবন্ধকতার সুযোগ নিয়ে মানুষকে ঠকানো হচ্ছে, সে ক্ষেত্রে বঞ্চনার মাধ্যম হয়ে উঠেছে প্রতিবন্ধকতা।

৫.১৪ বিমল কর-এর (১৯২১-২০০৩ খ্রীঃ) দুটি গল্পের আলোচনা

বিমল কর বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের গল্পকারদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর জীবনের সময়কাল ১৯২১ থেকে ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ। ১৯৭৫ সালে সাহিত্যকৃতির জন্য তিনি সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কারে সম্মানিত হন। চমকপ্রদ কাহিনি রচনার পরিবর্তে মানুষের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং প্রতীকী ব্যঞ্জনা সৃষ্টি তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। 'ইঁদুর' 'মানবপুত্র', 'আত্মজা' গল্পগুলি তার এই জাতীয় মনোভাবের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এবং তার পরবর্তী সময়ে বাংলা ছোটগল্পের রূপরীতি নিয়ে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়, বিমল কর ছিলেন

তার অন্যতম হোতা। *খরকুটো, অসময়, বালিকাবধূ* ইত্যাদি গ্রন্থ তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

জননী: আমাদের আলোচ্য 'জননী' গল্পের মেজদা দীনেন্দ্র দৃষ্টিপ্রতিস্পর্ধী হিসাবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই গল্পেও নিটোল কাহিনি সৃষ্টির চেষ্টা নেই। এটি একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের কাহিনি, বাবা-মা ও পাঁচ ভাইবোনকে নিয়ে তাদের পরিবার। দুর্ঘটনায় মেজদার চোখ নষ্ট হয়ে যাওয়া, বড়দির শ্বশুরবাড়ি থেকে চলে আসা, ছোটর অসুখ করা এইভাবে পরপর পাঁচটি দুর্ঘটনা ঘটে। তবে মায়ের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে অন্যান্য ভাইবোনসহ দীনেন্দ্রের মনোজগতের বিশ্লেষণ লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য।

মায়ের মৃত্যুর পর পাঁচ ভাই-বোন মিলে ঠিক করে তারা নিজেদের বাগানে মায়ের শবদেহ সৎকার করবে। এই সৎকারের পর পাঁচ ভাই-বোন এক আলোচনায় তাদের জননীর শেষ যাত্রাপথে নিজেদের পছন্দ মতো উপহার জননীর উদ্দেশ্যে নিবেদন করবে। বড়দা দেয় ভালোবাসার মন, তার মতে সৌন্দর্যের চেয়ে ভালোবাসা বড়ো। বড়দি মাকে উপহার দিতে চায় উপযুক্ত সাহস যা তাদের মায়ের ছিল না। ছোটর আত্মত্যাগ বা স্বার্থত্যাগ তাদের মায়ের উদ্দেশ্যে নিবেদন করে। তার মতে সংসারে তাদের মা আত্মত্যাগ করতে শেখেনি। পাঁচ ভাই-বোনের মধ্যে কনিষ্ঠতম এই গল্পের কথক ভালোবাসার মন দেয়। দীনু বা মেজদা মাকে দিতে চায় মানস চক্ষু , কেননা সংসারের মোহে তাদের মা অন্ধ হয়েছিল। এই মানসচক্ষু দিয়ে যাতে শেষ যাত্রাপথে অনেক দূর পর্যন্ত স্পষ্ট দেখতে পায় এই ছিল তার উদ্দেশ্য।

গল্পকার দীনেন্দ্রকে যেভাবে নির্মাণ করেছেন সেখানে তার বাইরের জগৎ উপেক্ষিত, লেখকের মতে সে তার মনোজগৎ নিয়ে ব্যস্ত। দার্শনিক মনোভাবাপন্ন সে বলে যে, মৃত্যুর পর আমরা যখন কাউকে শশ্মানে দাহ করে আসি তখন সে অনেক সঙ্গীসাথী পায়। কিন্তু

তাদের মায়ের ক্ষেত্রে এই ঘটনা ঘটেনি। তার এই কথা তাদের আলোচনায় নতুন মাত্রা এনে দেয়। সবার সব কিছু দেওয়া হয়ে গেলে মেজদা শেষে মাকে নিজের হৃদয়ের চোখ দান করে। জননীর উদ্দেশ্যে তার এই বিশেষ নিবেদনটিও আমাদের তার মনোজগৎকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করে।

দীনেন্দ্র সম্পর্কে লেখকের এই বক্তব্য একইসঙ্গে সদর্থক ও নেতিবাচক মনোভাবের পরিচয়বাহী। এই বক্তব্যের ইতিবাচক দিক হলো যারা দৃষ্টিপ্রতিস্পর্ধী তাদের অন্তরজগৎ বিশেষভাবে সজাগ ও সক্রিয়। কিন্তু বাস্তবে তা সর্বক্ষেত্রে নাও হতে পারে। তাছাড়া বাইরের জগৎ দেখতে না পেলে তার মন বিক্ষিপ্ত হয় না এই ধারণাটি অত্যন্ত প্রাচীন। আধুনিক মনোবিদ্যা বলেন যে, দৃষ্টিপ্রতিস্পর্ধীদের মনও অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের কারণে বিক্ষিপ্ত হতে পারে। বাস্তবে এই জাতীয় উদাহরণের অভাব নেই। কারণ দৃষ্টিপ্রতিস্পর্ধী মাত্রই অত্যন্ত মেধাবী ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তি নয়।

কাম ও কামিনী: উক্ত গল্পের প্রধান চরিত্র কুঞ্জবাবু দৃষ্টিগত প্রতিবন্ধকতার শিকার। এই গল্পে দৃষ্টিহীন ব্যক্তির অলৌকিক উপায়ে দৃষ্টি ফিরে পাওয়ার চেষ্টার মধ্যে একইসঙ্গে মানুষের অলৌকিক বিশ্বাসের প্রসঙ্গ যেমন এসেছে তেমনই দৃষ্টিহীন ব্যক্তির দৃষ্টি ফিরে পাওয়ার চেষ্টার মধ্যে তার জীবনযন্ত্রণা প্রকাশিত হয়েছে। গ্রামীণ কামদেবের মেলায় সকলেই তার মনস্কামনা পূরণ করার জন্য নিজের সঙ্গিনীকে নিয়ে হাজির হয়। কুঞ্জবাবু কামদেবের কাছে নিজের দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়ার জন্য প্রার্থনা জানিয়েছে। মানুষের মানসিক দুর্বলতা, দৃষ্টিশক্তি হারানোর যন্ত্রণা এবং অলৌকিক শক্তির প্রতি গ্রামীণ সমাজের বিশ্বাসকে দেখানোই এই গল্পের মূল উদ্দেশ্য।

৫.১৫ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী (১৯১২-১৯৮২ খ্রীঃ)

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর জীবনের সময়কাল ১৯১২ থেকে ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের তিনি একজন অন্যতম কথাকার। তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে *সূর্যমুখী, বারো ঘর এক উঠান, হৃদয়ের রঙ* উল্লেখযোগ্য। 'খেলনা', 'গিরগিটি', 'বন্ধুপত্নী' গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যের অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। আমাদের আলোচ্য গল্পটি ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর *খেলনা* গ্রন্থের অন্তর্গত। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তার অনেকগুলি গল্পে প্রতিস্পর্ধীকেন্দ্রীক সমাজবাস্তবতার ছবি এঁকেছেন। তার 'নীল রাত্রি,' 'পঙ্গু,' 'সামনে চামেলি,' প্রতিস্পর্ধীকেন্দ্রীক গল্পভাবনার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

নদী ও নারী: আমাদের আলোচ্য 'নদী ও নারী' গল্পে এমন এক দৃষ্টিপ্রতিস্পর্ধী চরিত্রে পরিচয় পাই যে দুর্ঘটনাজনিত কারণে বহুবিধ প্রতিবন্ধকতার শিকার। সুরপতি এবং তার স্ত্রী নির্মলা একদিন পদ্মানদীতে নৌকা ভ্রমণ কালে একজন নারীকে দেখতে পায়, যে মাছ ধরে এবং শিকার করে। এই ঘটনা তাদের বেপরোয়া নারী স্বভাবের পরিচয়বাহী বলে মনে হয়। পরে তারা দেখতে পায় অদূরে একটি নৌকার ওপর তার স্বামী নিয়ে এক পরিচ্ছন্ন সংসার। তার স্বামী দুর্ঘটনায় একটি পা, একটি হাত এবং দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছে মেয়েটি তার সর্বস্ব দিয়ে তার স্বামীকে সুখী করার চেষ্টা করে যাচ্ছে।

নারী ও নদীর সংস্পর্শে এই মানুষটির বেঁচে থাকার চিত্র নানা দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে ফাল্গুনীবাবু বলেন, "নদী আর নারীর সংস্পর্শে প্রতিবন্ধী মানুষটির এই বেঁচে থাকা বেশ তাৎপর্যময়।"[৪৪] আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে এই দম্পতি কি আসলে সমাজের মূল স্রোত থেকে নিজেদের বেঁচে থাকার রসদ খুঁজে পেয়েছে? আবার এমনও হতে পারে জীবিকার প্রয়োজনে তার স্ত্রী আশ্রয় নিয়েছে পদ্মার বুকে। তবে নদী ও নারীর সংস্পর্শে এই মানুষটির বেঁচে থাকা যেমন মানবিক, তেমনই তার স্ত্রীর সাহস ও স্পর্ধা তাকে প্রতিস্পর্ধীর

মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে। গল্পকার এখানে গতানুগতিক সহানুভূতি, ভিক্ষাবৃত্তি এসবের পরিবর্তে তাদের জীবনের লড়াই এবং মানবিক দিককে গুরুত্ব দিয়েছেন।

৫.১৬ সৈয়দ মুজতবা সিরাজ (১৯৩০-২০১২ খ্রীঃ)

সৈয়দ মুজতবা সিরাজের জীবনের সময়কাল ১৯৩০ থেকে ২০১২ খ্রিস্টাব্দ। সাম্প্রতিক কালের কথাকারদের মধ্যে তিনি অন্যতম। *'অলীক মানুষ* বাংলা সাহিত্যে তাঁর উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। এই গ্রন্থটি রচনার জন্য তিনি সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কারে সম্মানিত হন। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে *মৃত্যুর ঘড়া, রক্তের প্রত্যাশা, রানির ঘাটের বৃত্তান্ত* এর নাম উল্লেখযোগ্য। কথাকার সৈয়দ মুজতবা সিরাজ তাঁর অনেকগুলি গল্পে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষের সমাজবাস্তবতার ছবি এঁকেছেন। তাঁর 'বৃষ্টিতে দাবানল,' 'জুলেখা, এবং আমাদের আলোচ্য 'বুড়া পীরের দর্গাতলায়' গল্পটি প্রতিস্পর্ধীকেন্দ্রীক সমাজবাস্তবতার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

বুড়া পীরের দর্গাতলায়: গল্পের প্রধান চরিত্র বৃন্দাবন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধকতার শিকার। একে সে দৃষ্টিহীন আবার আর্থিকভাবে অত্যন্ত দুর্বল। দারিদ্র ও দৃষ্টিহীনতা তাকে তথাকথিত সভ্য ও উন্নত সমাজ থেকে অনেক নিচে নামিয়ে দিয়েছে। কঠোর পরিশ্রমের ফলে তার অর্থোপার্জনের বাস্তবতা এবং মানসিকতা কোনোটাই নেই। তাই সে দারিদ্রের তাড়নায় নিজের পুত্রকে বেচে দিয়েছে।

নিজের সন্তানকে বেচে দেওয়ার মতো সামাজিক অপরাধে কেউ তাকে শাস্তি দেয়নি কিন্তু বৃন্দাবন মানসিক যন্ত্রণায় জর্জরিত। দর্গাতলায় পীরের কাছে সে প্রার্থনা জানায় তার ছেলে যেখানেই থাক যেন সুখে থাকে, আর একদিন তার কাছে ফিরে আসে। দারিদ্র ও দৃষ্টিহীনতা যেন এখানে পরস্পরের পরিপূরক এই দুয়ের কারণেই সে স্বাচ্ছন্দ্য জীবনযাপন

করতে পারছে না। তার অসুস্থ, যন্ত্রণাময় জীবনের জন্য এই দুটি উপাদান একই ভূমিকা পালন করেছে। সে দিক থেকে এই গল্পের সমাজবাস্তবতা আমাদের আলোড়িত করে।

৫.১৭ সমরেশ বসু (১৯২৪-১৯৮৮ খ্রীঃ)

কথাসাহিত্যে সমাজবাস্তবতা এবং মানুষের মনস্তাত্ত্বিক রহস্য উদ্ঘাটনের প্রশ্নে সমরেশ বসু এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। সাহিত্য ও চলচ্চিত্র কৃতির জন্য তিনি সাহিত্য অ্যাকাডেমি এবং ফিল্ম ফেয়ার পুরস্কারে ভূষিত হন। *গঙ্গা, দেখি নাই ফিরে, বিবর, (২০০৬ খ্রীঃ) প্রজাপতি (১৯৬৭ খ্রীঃ)* বাংলা সাহিত্যে তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা। আমাদের আলোচ্য সমরেশ বসুর লেখা 'মহাযুদ্ধের পর'গল্পটি ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত *মনোমুকুর* গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত।

মহাযুদ্ধের পর: গল্পটিতে অন্ধতা এবং অজ্ঞতা সমর্থক। সুলা এবং বটা নামে দুই দৃষ্টিহীন ভিখারি যুবক প্রাগৈতিহাসিক যুগের গুহাবাসী মানুষের মতো জীবন যাপন করে। কুর্চি নাম্নি এক দৃষ্টিহীন ভিখারিনীকে কেন্দ্র করে তাদের জীবনে ট্র্যাজেডি নেমে আসে। বর্তমান সভ্যতার মানুষ হওয়া সত্ত্বেও তাদের আচরণে কোনো সভ্যতার ছাপ পড়েনি। উক্ত গল্পে তারা না মানুষ হিসেবে চিত্রিত। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তমসা' গল্পের পঙ্খের মতো এরা সমাজ থেকে নির্বাসিত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পের ভিক্ষু চরিত্রের মধ্যে শেষ পর্যন্ত যে মানবিক উত্তরণের বিষয়টি লেখক দেখিয়েছেন এই কাহিনিবৃত্তে সেটুকুও অনুপস্থিত। তাই দুই দৃষ্টিহীন ভিখারি যুবকের প্রবৃত্তির তাড়নায় হত্যা ও নির্বাসন এই গল্পের মূখ্য আলোচ্য বিষয়।

বটা ও সুলা নামক দুই দৃষ্টিহীন ভিখারি যুবক সারাদিন ভিক্ষে করে এবং দিনের শেষে হোটেলের অবশিষ্ট খাবার খেয়ে পরিত্যক্ত পাটের গুদামে রাত্রি বাস করে। তারা পরস্পরের সুখদুঃখে অংশীদার ছিল। আকস্মিকভাবে ভিখারিনী কুর্চির আবির্ভাবে তাকে দখলের প্রশ্নে

দুজনের মধ্যে বিরোধ বাধে। এই বিরোধে কুর্চির মৃত্যু হয়। তারা দুজনেই এই ঘটনার জন্য অনুতপ্ত হয় কিন্তু কারোর কাছে প্রকাশ করতে পারে না কিম্বা কুর্চির হত্যার জন্য তাদের কেউ সন্দেহ করে না। তাদের জীবনের ট্র্যাজেডি এখানেই। এরা কোথা থেকে এসেছে বা এদের সামাজিক ও পারিবারিক পরিচয় কি সে সম্পর্কে লেখক কিছু বলেননি। সভ্য মানুষের চেহারা ও আচরণ সম্পর্কে এরা যে সম্পূর্ণ অজ্ঞ লেখক বারবার সে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। যে প্রসঙ্গে এরা বলে, 'মানসে কয়' 'মানসে দেখে' ইত্যাদি। জৈবিকক্ষুধা, কামনার মতো অনুভূতির বাইরে এদের কোনো মানবিক অনুভূতি নেই। গল্পের শেষে 'সুরহীন,' 'চিৎকারহীন' কান্নার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে লেখক বলতে চেয়েছেন এটা আসলে 'না মানুষ' রূপী মানুষের গল্প।

গল্পের শুরুতে আছে মেঘাচ্ছন্ন রাত্রির বর্ণনা। গল্পে বারবার ফিরে এসেছে বৃষ্টি ও মেঘলা আকাশের কথা। 'ঝিঁঝিঁর ডাক,' 'জোনাকির জ্বলে থাকা,' 'ব্যাঙের উল্লাস ধ্বনি' সব কিছুর মধ্যের লেখক বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আহ্বান এবং কামনার ইঙ্গিত দিয়েছেন। কামট সংকুল ইছামতীর স্রোত এই পরিবেশকে যেন আরো ত্বরান্বিত করেছে। এমন পটভূমিতে দৃষ্টিহীন কুর্চিকে কেন্দ্র করে দুই পুরুষের লড়াই এবং ভুলবশত কুর্চির মৃত্যু তাদের বেঁচে থাকাকে ভেতর থেকে দুঃসহ করে তুলেছে। পাটের গুদামে বাস করা রাত জাগা এক পাখি হয়ে উঠেছে এই গল্পে মহাকালের প্রতীক। সে যেন সমস্ত ঘটনার সাক্ষী অথচ সভ্য জগতের মানুষরা তা জানে না আর জানতেও চায় না।

গল্পের পরিবেশ রচনায় এবং প্রতীকের ব্যবহারে লেখক মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন কিন্তু চরিত্র নির্মাণে তার দৃষ্টিভঙ্গি সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনের হাতিয়ার হয়ে ওঠেনি। সমাজনির্বাসিত তিনটি চরিত্রের মধ্যে লেখক মানুষ হয়ে ওঠার কোনো সম্ভাবনাকে গুরুত্ব দেননি। যেন তারা নিজেরাও নিজেদের মানুষ বলে বিশ্বাস করে না। তাই সমাজমনস্কতার

প্রশ্নে এটি একটি ব্যর্থ রচনা এবং প্রতিবন্ধকতা ও দৃষ্টিহীনতা যে শুধু মাত্র একটি শারীরিক সমস্যা নয় সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে এর যোগসূত্রটি স্পষ্ট করে।

৫.১৮ কমল কুমার মজুমদার (১৯১৪-১৯৭৯ খ্রীঃ)

কমলকুমার মজুমদার একালের একজন বিশিষ্ট কথাকার। তাঁর জীবনের সময়কাল **১৯১৪** থেকে **১৯৭৯** খ্রিস্টাব্দ। মাত্র ৬৪ বছর তিনি জীবিত ছিলেন। তাঁর মধ্যে কথাসাহিত্যে বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁকে বলা হয় 'লেখকদের লেখক'। 'মতিলাল পাদরী', *অন্তর্জলি যাত্রা, নিম অন্নপূর্ণা* বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। নিজস্ব গদ্যশৈলী এবং দৃষ্টিভঙ্গির জন্য বাংলা কথাসাহিত্যে তিনি স্মরণীয়। তাঁর রচিত গল্প ও উপন্যাসগুলি যথাক্রমে *গল্প সমগ্র ও উপন্যাস সমগ্রে* সংকলিত হয়েছে। কমল কুমার মজুমদার রচিত এই গল্পটি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত *গল্প সমগ্র*-র অন্তর্গত।

আমোদ বোষ্টুমি: এই গল্পের প্রধান নারী ও পুরুষ চরিত্র আমোদিনী ও প্রেমিক গোরাচাঁদ। আমোদিনী তার স্বার্থসিদ্ধির জন্য তার প্রেমিককে নানান গাছ-গাছড়ার ওষুধ ব্যবহার করে ধীরে-ধীরে দৃষ্টিহীন করে দিয়েছে। তার উদ্দেশ্য একটাই যাতে গোরাচাঁদ একমাত্র তার ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'আততায়ী' গল্পেও দেখা যায় যে বন্ধুপত্নীকে আত্মসাৎ করার জন্য তার ডাক্তার বন্ধু দিবাকর তার অস্ত্রোপচারের ছলে দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে দিচ্ছে। শেষ পর্যন্ত সে এই কাজে সফল হচ্ছে। আমাদের আলোচ্য 'আমোদ বোষ্টুমি' গল্পেও নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য মানুষকে প্রতিবন্ধী বানানোর ঘটনা গুরুত্ব পেয়েছে। এখানে প্রতিবন্ধকতা হয়ে উঠেছে মানুষের শোষণ ও বঞ্চনার হাতিয়ার। যারা এইসব ঘটনা ঘটাচ্ছে তারা

প্রত্যেকেই তথাকথিত সুস্থ স্বাভাবিক, সক্ষম মানুষ। মানুষের সক্ষমতা এবং অক্ষমতা বা প্রতিবন্ধকতা বিচারের দিক থেকে এই গল্প তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৫.১৯ সত্যজিৎ রায় (১৯২১-১৯৯২ খ্রীঃ)

বাংলা সাহিত্য ও সিনেমা এবং চিত্রশিল্পের জগতে সত্যজিৎ রায় এক অবিস্মরণীয় নাম। ১৯২১-১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ তাঁর জীবনের সময়কাল। এই কালপর্বের মধ্যে শিল্পসাহিত্যের নানা শাখায় তিনি তাঁর ব্যাপক ও বিচিত্রমুখী প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। *পথের পাঁচালী (১৯৫৫ খ্রীঃ), সোনার কেল্লা (১৯৭৪ খ্রীঃ), হীরক রাজার দেশে (১৯৮০ খ্রীঃ)* বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে তাঁর অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। চিত্রপরিচালক হিসাবে সর্বাধিক পরিচিত হলেও বাংলা রহস্য গল্পে ফেলুদার রচনাতে তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। বাংলা কল্পবিজ্ঞানের ইতিহাসে তাঁর *শঙ্কুসমগ্র* (১৯৬৫ খ্রীঃ)-এর স্থান অবিসংবাদিত। তাঁর গল্পে বহুমুখী জ্ঞানের প্রাচুর্য এবং বুদ্ধির চমক থাকা সত্ত্বেও কখনো তা পাণ্ডিত্যের ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠেনি। বরং তাঁর সাহিত্যকর্মকে সহজ ও সাবলিল গতি দান করেছে। আমাদের আলোচ্য দৃষ্টিপ্রতিস্পর্ধীদের নিয়ে লেখা 'গোলকধাম রহস্য' গল্পটি ১৯৮০ সালে *সন্দেশ* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই গল্পটি রচনার জন্য তিনি নয় দিন সময় নিয়েছিলেন পরবর্তীকালে এই গল্পটি *ফেলুদাসমগ্র* গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

গোলকধাম রহস্য (১৯৮০ খ্রীঃ): বাংলা সাহিত্যে দৃষ্টিপ্রতিস্পর্ধীদের নিয়ে লেখা অন্যান্য গল্পের তুলনায় এই গল্পটি মৌলিক এই কারণে যে, এমন একটি রহস্য গল্পের কেন্দ্রে আছে দৃষ্টিপ্রতিস্পর্ধী নীহার দত্ত। তিনি বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, তার গবেষণার সহযোগী সুপ্রকাশ চৌধুরীর ষড়যন্ত্রে গবেষণাগারে বিস্ফোরণ ঘটে এবং এই বিস্ফোরণে তার চোখ দুটি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। এই দুর্ঘটনা তার সারা জীবনের বিজ্ঞান সাধনাকে ব্যর্থ করে দেয়। এই সুপ্রকাশ

চৌধুরী যখন দস্তরের ছদ্মবেশে অসমাপ্ত গবেষণার নোট হস্তগত করার অভিপ্রায়ে তাদের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। নীহার দত্ত তাকে চিনতে পেরে মাঝরাত্রে রূপো দিয়ে বাঁধানো লাঠির সাহায্যে খুন করে। ফেলুদা ও তোপসে এই চুরি ও খুনের সমস্যা সমাধান করে। গল্পের কেন্দ্রে আছে একটি চুরি ও খুন এবং তার সমস্যা সমাধান গল্পের প্রধান বিষয়।

গল্পের শুরুতে *রামায়ণ* ও *মহাভারতের* উল্লেখ আছে। যদিও *রামায়ণ মহাভারতের* সঙ্গে এই গল্পের কোনো প্রত্যক্ষ যোগ নেই। কিন্তু এই গল্পে চুরি ও খুন এবং প্রতিশোধের ঘটনা ঘটেছে। গল্পের শেষে রামায়ণে অন্ধ মুনির পুত্রকে রাজা দশরথ হরিণভ্রমে শব্দভেদী বাণ ছুড়ে হত্যা করলে ক্ষুব্ধ মুনি রাজা দশরথকে অভিশাপ দেন যে, তারও পুত্রশোকে মৃত্যু ঘটবে। নীহার দত্তের খুন প্রসঙ্গে অন্ধকারে শব্দভেদী বাণ ছোঁড়ার অনুসঙ্গটি ব্যবহার করা হয়েছে। এই গল্পের প্রধান চরিত্র নীহার দত্ত গবেষণাগারে বিস্ফোরণে চোখ নষ্ট হয়ে যাবার পর সে তার অসমাপ্ত গবেষণার নোট নিয়ে দেশে ফিরে আসে। এর পর সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে তার বিশেষ ভূমিকা গল্পকার দেখাননি। বিজ্ঞানের পড়াশোনা করা ছাড়া তার কোনো কাজ ছিল না। অবশ্য তার মতো বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও অভিজাত পরিবারের সন্তানের পক্ষে অর্থ উপার্জনের প্রয়োজনও ছিল না। কিন্তু অলসভাবে সময় কাটানোর পরিবর্তে অন্যরকম কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে তার নিঃসঙ্গ জীবন অতিবাহিত হতে পারত। লেখক সেই সম্ভাবনাকে গুরুত্ব দেননি।

গল্পকার তার স্মৃতি এবং প্রখর শ্রবণশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। বাড়ির মধ্যে এবং বাইরে নীহার দত্ত একাই চলাফেরা করতে সক্ষম। অবশ্য বাড়িতে লাঠির ব্যবহারের মধ্যে গল্পকারের অন্য পরিকল্পনা ছিল। তার ঠাকুরদার তৈরি রূপো দিয়ে বাঁধানো ওই লাঠির সাহায্যে সে দস্তরবেশী সুপ্রকাশ চৌধুরীকে খুন করে। গলার স্বর শুনে সুপ্রকাশ চৌধুরীকে চিহ্নিত করা এবং নাক ডাকার শব্দে মাথায় আঘাত করার মধ্যেও প্রখর শ্রবণশক্তির পরিচয়

আছে। বাড়ির সমস্ত ঘর তার চেনা, এক্ষেত্রে স্মৃতির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। নীহার দত্তের কথায়, শব্দ, স্পর্শ ও স্মৃতি তার জীবনের প্রধান অবলম্বন। তার মতো বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর ক্ষেত্রে খুন, তারপরে আত্মহত্যা এবং একইসঙ্গে তার জীবনের ব্যর্থতা ও বৈরাগ্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়। অন্যদিকে তার প্রতিশোধ স্পৃহা বা জিঘাংসার পরিচয় বহন করে। বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও দৃষ্টিপ্রতিস্পর্ধী হিসাবে তার এই চরম সিদ্ধান্ত আইনের চোখে অপরাধ মনে হলেও তা শেষ পর্যন্ত পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণ করে। কারণ এর পিছনে আছে তার জীবনের বঞ্চনা ও ব্যর্থ সংগ্রামের ইতিবৃত্ত।

সমাজের অন্যান্য প্রতিস্পর্ধীদের মতো নীহার দত্তকে আমাদের প্রান্তিক অবহেলিত চরিত্র বলে মনে হয় না। কিন্তু লোভী মানুষের ষড়যন্ত্র তার দৃষ্টিশক্তি যেভাবে নষ্ট করে সেই দৃষ্টিহীনতার কারণে তার জীবন শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। গল্পকার এই বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। অন্যরকম সম্ভাবনার পথে তিনি হাঁটেননি। এই গল্পে আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য নীহার দত্তের কোনো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ছিল না। তার উপার্জনের টাকা আসতো সুধীর দত্তের নামে। এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন গল্পটি ১৯৮০ সালে প্রকাশিত হয়। তাই অ্যাকাউন্ট না থাকার বিষয়টি সে সময়ের সমাজচিত্র বলা যায় না, কারণ এই কালপর্বের মধ্যে বহু দৃষ্টিপ্রতিস্পর্ধী ব্যক্তি তাদের বিদ্যাশিক্ষা ও প্রতিভাবলে নানান সরকারি ক্ষেত্রে কর্মরত ছিলেন এবং তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ছিল। হয়তো গল্পকার সেই সম্বন্ধে অবগত ছিলেন না অথবা এই সম্ভাবনার দিকে গুরুত্ব দেননি। "জিঘাংসা অন্ধের দেহমনে সঞ্চার করতে পারে প্রচণ্ড শক্তি"[৪৫] গল্পের শেষে এই মন্তব্য শেষ পর্যন্ত প্রতিশোধ বা প্রতিহিংসাকে প্রতিষ্ঠিত করে। হতাশাগ্রস্ত, ব্যর্থ প্রতিস্পর্ধী হিসাবে নীহার দত্তের এ এক প্রকার প্রতিবাদ। গল্পকার সে বিচারের দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন সুধী পাঠকসমাজের ওপর। সব মিলিয়ে গল্পটি অন্যরকম এই কারণে যে, মানুষের ভালো-মন্দ যাবতীয় সম্ভাবনা তার

কোনো অঙ্গহানির ওপর নির্ভর করে না। নেতিবাচক উদাহরণের সাহায্যে এই ধারণাটি প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু প্রতিশোধ প্রতিহিংসার পরিবর্তে ইতিবাচক দিক থেকে এই ধারণাটি প্রতিষ্ঠিত হতে পারত। গল্পটির মূল আলোচ্য বিষয় হলো –

প্রথমত, দৃষ্টিহীনতার কারণে সে স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করতে পারছে না।

দ্বিতীয়ত, লেখক দৃষ্টিহীনতা সম্পর্কে প্রচলিত নানান মিথ ও প্রবাদ প্রবচনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।

তৃতীয়ত, মানুষের ভালো-মন্দ যে, কোনো অঙ্গহানির ওপর নির্ভর করে না নেতিবাচক দিক থেকে এই ধারণাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৫.২০ মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬-২০১৬ খ্রীঃ)

একালের বিশিষ্ট কথাকারদের মধ্যে মহাশ্বেতা দেবী অন্যতম। তিনি বাংলা সাহিত্যের এক প্রতিবাদী ধারার রূপকার। সমাজের তথাকথিত প্রান্তিক বা অবহেলিত মানুষের জীবনসংগ্রাম তার ছোটগল্প এবং উপন্যাসে রূপায়িত। গ্রাম বাংলার মানুষের লোকায়ত জীবন, তাদের ভাষা, সংস্কৃতি, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের জগৎ তিনি বিশ্বস্তভাবে চিত্রিত করেছেন। নরনারীর প্রেম বা মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের তুলনায় বাস্তব সমাজ পরিবেশের প্রেক্ষিতে মানুষের বেঁচে থাকার লড়াই তার সাহিত্যে বড়ো হয়ে উঠেছে। *হাজার চুরাশির মা (১৯৭৪ খ্রীঃ), অরণ্যের অধিকার ১৯৭৭ খ্রীঃ), রুদালি (১৯৯৩ খ্রীঃ), বীরসা মুণ্ডা, এতোয়া মুণ্ডার যুদ্ধ বিজয় তার* উল্লেখযোগ্য রচনা। দৃষ্টিপ্রতিস্পর্ধীদের নিয়ে লেখা তার 'কবিপত্নী' গল্পটি 'মহাশ্বেতা দেবীর পঞ্চাশটি গল্প' নামক সংকলনে স্থান পেয়েছে।

কবিপত্নী: এই গল্পের প্রধান চরিত্র কবি সুপ্রকাশ দত্ত চৌধুরী। জীবনের মাঝপথে আকস্মিকভাবে তার দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। এই দৃষ্টিহীনতার কারণে তাকে চাকরি

হারাতে হয়। তার ছেলে এই চাকরি পেলেও সে বাবা-মাকে দেখে না। কবি এবং তার স্ত্রী দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকার কাহিনি এই গল্পের মূখ্য উপজীব্য।

সুপ্রকাশ দত্ত চৌধুরী দুর্ঘটনায় দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন। বাতে পঙ্গু তার পূর্বতন কবিখ্যাতিও আর নেই। দারিদ্র তাদের জীবনের নিত্য সঙ্গী। এই পরিস্থিতিতে তার স্ত্রী যেভাবে জীবনসংগ্রামে তাকে সঙ্গ দিয়ে এসেছে গল্পের নামকরণ সেই সামান্য নারীর অসামান্য হয়ে ওঠার ভূমিকাকে ইঙ্গিত করে। সুপ্রকাশ দত্ত চৌধুরীকে সকলে যখন ভুলতে বসেছে এমন সময় পাড়ার তরুণ সংঘ এক সম্বর্ধনার মধ্যে কবি এবং কবিতাকে সম্মান জানানোর চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের আয়োজনের মধ্যে নিজেদের প্রচারের আস্ফালন এবং তাকে আর্থিক সাহায্য দানের বিষয়টি বড়ো হয়ে উঠেছে। সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে গিয়ে কবিপত্নীর এই ভেবে আনন্দ হয় যে, দৃষ্টিহীনতার কারণে তার স্বামীকে এই অসম্মানের মুখোমুখি হতে হয় না।

কবির মুখ থেকে শুনে কবিপত্নী যে ভাষণ লিখে নিয়ে যায় সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে তা পড়ার সুযোগ হয় না। কিন্তু কবি সুপ্রকাশ দত্ত চৌধুরী বিগত যৌবনের স্মৃতি এবং কবিত্বের গৌরব সম্বল করে বেঁচে আছেন। স্ত্রীকে স্পর্শ করে তার স্বাস্থ্যের বর্তমান ভগ্ন দশা, পূর্বের নধর গঠন এবং যৌবনের স্নানসিক্ত স্মৃতি তার মনে পড়ে। এই গল্পের স্বল্প পরিসরে কবি চরিত্রটি যেভাবে চিত্রিত হয়েছে তা নিঃসন্দেহে পাঠকের প্রশংসার দাবী রাখে। এই গল্পে আবেগের প্রাবল্য আছে। লেখিকা সুপ্রকাশ দত্ত চৌধুরীর কবিত্বের গৌরব ও বিগত যৌবনের স্মৃতি এবং দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করে তাদের বেঁচে থাকার কাহিনিটি সহৃদয়ভাবে চিত্রিত করেছেন। স্মৃতি, শব্দ, স্পর্শ নিয়ে তার বেঁচে থাকা এবং কবিপত্নীর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা এই গল্পটিকে আর পাঁচটা দৃষ্টিপ্রতিস্পর্ধীদের নিয়ে লেখা ছোটগল্পের তুলনায় স্বতন্ত্র্য মর্যাদা দিয়েছে। কোনোরকম একপেশে মনোভাব বা বাস্তবতার অভাব এই গল্পে পরিলক্ষিত

হয় না। বাস্তব সমাজ পরিবেশের নিখুঁত চিত্রণ এবং মানুষের প্রতি সমবেদনায় গল্পের লেখিকা ও কথকের সীমারেখা কোথাও যেন একাকার হয়ে গেছে। এখানেই মহাশ্বেতা দেবীর বাস্তবধর্মী চরিত্র চিত্রণের কৃতিত্ব। এই গল্পের মুখ্য আলোচ্য বিষয় হল –

প্রথমত, দৃষ্টিহীনতার সঙ্গে সঙ্গে তার জীবনে দারিদ্র নেমে এসেছে, অর্থাৎ দৃষ্টিহীনতা এবং দারিদ্র অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত।

দ্বিতীয়ত, দৃষ্টিহীনতা তাকে সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে।

তৃতীয়ত, অন্যান্য গল্পের মতো এখানেও তীব্র ইন্দ্রিয়সচেতনতার কথা গুরুত্ব পেয়েছে।

৫.২১ ভগীরথ মিশ্র (১৯৪৭ খ্রীঃ)

ভগীরথ মিশ্র এ কালের একজন বিশিষ্ট কথাকার। তিনি শতাধিক ছোটগল্প রচনা করেন। তার অনেকগুলি ছোটগল্প *মধুপর্ণী* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সাহিত্যকৃতির জন্য তিনি বঙ্কিম পুরস্কারে সম্মানিত হন। তাঁর গ্রন্থগুলির মধ্যে *জাইগেনসিয়া ও অন্যান্য গল্প* (১৯৮৩ খ্রীঃ), *অন্তর্গত নীলস্রোত* (১৯৯০ খ্রীঃ), *মৃগয়া* (প্রথম খণ্ড ১৯৯৬, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৯৭, তৃতীয় খণ্ড ১৯৯৮, চতুর্থ খণ্ড ১৯৯৯ ও পঞ্চম খণ্ড ২০০০ খ্রীঃ), *অমানুষনামার* নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভগীরথ মিশ্রের লেখা এই গল্পটি ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত।

দৃষ্টি (১৯৯৩ খ্রীঃ): গল্পটিতে সমাজের নিম্নবর্গীয় মানুষের কথা স্থান পেয়েছে। এই গল্পের প্রধান চরিত্র লইতন অস্থিগত প্রতিস্পর্ধী পেশায় ভিখারিনী। তার প্রেমিক কৈলাস দৃষ্টিপ্রতিবন্ধকতার শিকার। লইতনের স্বামী আপাত দৃষ্টিতে সক্ষম চরিত্র। দুই পুরুষ ও এক নারীকে কেন্দ্র করে গল্পের কাহিনি গড়ে উঠেছে। এই ত্রিকোণ প্রেমের দ্বন্দ্বে কৈলাস ও ঝড়েস্বর দুজনেই লইতনকে সন্দেহ করে। লেখক দেখিয়েছেন মানুষের বাইরের দৃষ্টি

অপেক্ষা অন্তরের দৃষ্টি বেশী প্রখর। তাই, লইতনের তার স্বামী ঝড়েস্বর অপেক্ষা কৈলাসকে বেশী ভয়। শেষ পর্যন্ত কৈলাসকেই সে বিয়ে করে এবং স্বামীর সঙ্গ ত্যাগ করে।

এই গল্পে দৃষ্টিহীনের দৃষ্টি তথাকথিত দৃষ্টিমান অপেক্ষা প্রখর এই কথাটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই তত্ত্বকথাটুকু বাদ দিলে এটি একটি চিরকালীন নারীর ওপর পুরুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার গল্প। তাই, সমকালীন সমাজবাস্তবতা অপেক্ষা তত্ত্ব ও দর্শন এই গল্পে বেশী গুরুত্ব পেয়েছে।

৫.২২ নন্তু সরকার (১৯৫০ খ্রীঃ)

নন্তু সরকারের জন্ম ১৯৫০ সালে। চক্ষুদান ও রক্তদান আন্দোলনের পাশাপাশি তিনি সাহিত্যসাধনায় ব্যাপৃত। পুলিস বিভাগের সরকারি চাকরি করতে-করতে তিনি সাতটি উপন্যাস এবং দেড়শোটি ছোটগল্প রচনা করেন। তাঁর রচনায় সমাজসচেতন সজাগ দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের আলোচ্য গল্পটি লেখকের গল্পসংকলন *ঝিনুক থেকে মুক্ত* গল্প সংকলনের অন্তর্গত। নয়ের দশকে প্রকাশিত তাঁর উক্ত গল্পসংকলনটি লেখকের সাহিত্যচর্চার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

ভুল ছন্দ (১৯৯৪ খ্রীঃ): আলোচ্য গল্পটিতে লেখকের এক দৃষ্টিহীন মেয়ের অন্তর্বেদনা এবং সমাজে তার অবস্থান স্বল্প কথায় যেভাবে ব্যক্ত করেছেন তা অতুলনীয়। তথাকথিত স্বনামধন্য লেখকদের অনেকেই যখন সামাজিক দায়বদ্ধতার পরিবর্তে এই ধরনের চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে সহানুভূতিকেই গুরুত্ব দিয়েছেন সেই সামাজিক ও সাহিত্যিক পরিমণ্ডলে লেখক নন্তু সরকারের সাহিত্যভাবনা আমাদের আলোড়িত করে।

গল্পের প্রধান চরিত্র শৈবাল এবং রুমি নাম্নী এক দৃষ্টিহীন তরুণী। লেখক নিজেই এখানে কথকের ভূমিকায় অবতীর্ণ। তবে নিজেকে আড়াল রেখে যুবক শৈবালের চোখ

দিয়েই ঘটনাপ্রবাহকে উপস্থাপন করেছেন। নির্মাণশৈলীর দিক থেকে গল্পটির সার্থকতা এখানেই। রুমির অন্তর্বেদনা এবং সমাজে দৃষ্টিহীন মেয়েদের অবস্থান ব্যাখ্যায় গল্পটি প্রচলিত সামাজিক ধারণার মূলে আঘাত করেছেন।

চলন্ত ট্রেনের কামড়ায় শৈবালের মুখোমুখি বসে থাকা এক অনিন্দ্যসুন্দর তরুণীকে দেখে তার মনে প্রথম দর্শনে যে বিস্ময়জড়িত মুগ্ধতা এবং প্রেমের সঞ্চার হয়েছে শেষ পর্যন্ত তা ব্যঙ্গচিত্রে পরিণত হয়েছে। যে শৈবাল কয়েক মুহূর্ত আগে মেয়েটির 'অক্ষিদ্বয়, ভ্রূযুগল, নাসিকা' প্রভৃতি শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রশংসায় উল্লসিত এবং রূপকথার রাজকন্যার সঙ্গে তার তুলনা করে সাত সমুদ্র তেরো নদীর পেরিয়ে যাওয়ার স্বপ্নে মশগুল হয়ে উঠেছিল তখনও সে জানতো না যে, মেয়েটি দৃষ্টিহীন। এই সত্য জানার পর ক্ষণস্থায়ী ফানুসের মতো তার স্বপ্নকল্পনা উড়ে গিয়ে নিঃশেসিত হয়ে যায়। তখন তার মনোজগতে একইসঙ্গে আশাভঙ্গের বেদনা অন্যদিকে প্রচলিত সহানুভূতি ভিড় করে আসে। তার মনে হয় এমন সুন্দর একটি মেয়েকে যদি দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেওয়া যেত তাহলে তাকে অনায়াসে জীবনসঙ্গিনী করা চলতো। কিন্তু এই গল্পে আকস্মিক রুমির দৃষ্টিহীনতার সংবাদে শৈবালের প্রেমের ছন্দ কেটে যায়। প্রেমদেবীর সমস্ত আয়োজন পর্যবসিত হয় রসিকতায়। রুমির দৃষ্টিহীন বিদ্যালয়ে পড়ার কথা শুনে শৈবাল বলে, "ব্লাইণ্ড স্কুলে, মেয়েটি অন্ধ?"[৪৬]

শৈবালের এই ভাবনা আসলে প্রচলিত সমাজভাবনারই প্রতিরূপ। দৃষ্টিহীন মানুষরা যে সামাজিকভাবে ব্রাত্য, দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতে না পারলে তাদের সমাজের অঙ্গীভূত করা যাবে না শৈবাল চরিত্রে এই কথাটাই প্রধান হয়ে উঠেছে। সেদিক থেকে এই চরিত্রটির অবস্থান আধুনিক অন্তর্ভুক্তিমূলক সম্ভাবনার বিপরীতে। অক্ষমতাবিদ্যাচর্চাই একদল মানুষকে প্রতিবন্ধী আখ্যা দিয়ে আলাদা করে রাখার যে সমালোচনা করা হয়েছে লেখক শিল্পসম্মতভাবে সে পথেই হেঁটেছেন। মানুষের অঙ্গহানির বিষয়টি বাস্তবসম্মত হলেও

প্রতিবন্ধকতা বিষয়টি যে সামাজিক এবং সহানুভূতির পরিবর্তে সামাজিক দায়বদ্ধতাকে গুরুত্ব দিতে হবে লেখক শিল্পের সীমারেখায় তা প্রতিষ্ঠা করেছে।

৫.২৩ বাংলা ছোটগল্পে প্রতিস্পর্ধী উত্তরাধিকার

যার তীব্র অন্তর্দৃষ্টি আছে মানুষ ও মানুষের জীবনকে প্রকাশ করার ভাষার অমোঘ নিয়মটি যার আয়ত্তাধীন সাহিত্যের আঙিনায় তিনি শিল্পী। বিশেষ কালে সমাজে সাহিত্যকারের আত্মপ্রকাশ মানুষ ও মানুষের জীবন তার সৃষ্টির প্রধান উৎস। তাই তিনি মনুষ্যত্বের কাছে দায়বদ্ধ না থেকে পারেন না। তার তীব্র অন্তর্দৃষ্টি এবং এই দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে পাঠকের মনে প্রত্যাশা গড়ে ওঠে।

বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আত্মপ্রকাশের সময় থেকে শুরু করে ব্যাপক ও বিচিত্রমুখী প্রতিভার অধিকারী সত্যজিৎ রায়ের কাল পর্যন্ত শতাধিক বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে। এই কালপর্বের মধ্যে দৃষ্টিপ্রতিস্পর্ধীদের নিয়ে লেখা নানা গল্পে অন্ধ শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। বঙ্কিমচন্দ্রের *'রজনী',* তারাশঙ্করের 'তমসা', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অন্ধের বউ', 'আততায়ী' ইত্যাদি নামকরণের ক্ষেত্রেও অন্ধকারের ব্যঞ্জনা আভাসিত হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে এই শব্দটি সমাজের নেতিবাচক মনোভাবের পরিচয় বহন করে। যদিও অন্ধ বা প্রতিবন্ধী শব্দের পরিবর্তে ব্যতিক্রমধর্মী বা দৃষ্টিপ্রতিস্পর্ধী শব্দের প্রয়োগ সাম্প্রতিক কালের ঘটনা। কিন্তু সচেতন শিল্পকর্মে অনেকে অক্ষম বা প্রতিবন্ধী শব্দের পরিবর্তে ব্যতিক্রমধর্মী শব্দের ব্যবহার করলেও এর মধ্যেও কিছু পরিমাণ নেতিবাচক মনোভাব থেকে গেছে। তাই পূর্বে উল্লেখিত নানান নেতিবাচক শব্দের পরিবর্তে প্রতিস্পর্ধী শব্দের ব্যবহার অনেক বেশী কাম্য সদর্থক বলে মনে হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার সৃষ্ট *'রজনী'* চরিত্রে রজনীর সংবেদনশীল অনুভূতির জগৎ শিল্পের সততায় চিত্রিত করেছেন। কিন্তু উপন্যাসের শেষে শচীন্দ্রের সঙ্গে বিবাহের

পূর্ব মুহূর্তে সন্ন্যাসীর অলৌকিক ক্ষমতার সাহায্যে রজনীর দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। রক্ষণশীল পাত্রপক্ষ হিসেবে তিনি দৃষ্টিহীন কন্যার বিবাহকে মেনে নিতে পারেননি। অবশ্য এর দায় শুধু লেখকের ওপর বর্তায় না। তৎকালীন পাঠকসমাজের মানসিকতার বিষয়টিও এক্ষেত্রে বিচার্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'দৃষ্টিদান' গল্পের প্রথম সংস্করণে কুমুর দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেও দ্বিতীয় সংস্করণে কুমুর দৃষ্টিহীনতা অক্ষুণ্ণ রেখে উদারতা ও সমাজমনস্কতার পরিচয় দিয়েছেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটে 'তমসা' গল্পের পঙ্কে চরিত্রটি যেভাবে নির্মাণ করেছেন তা তৎকালীন সমাজবাস্তবতাকে মনে করিয়ে দেয়। পঙ্কে তার দৃষ্টিহীনতার কারণে সমাজ ও পরিবার থেকে নির্বাসিত। লেখক তার ইন্দ্রিয়সচেতন অনুভূতির জগৎ যেভাবে প্রকাশ করেছেন তার সামাজিক মানুষ হয়ে ওঠার সম্ভাবনার প্রতি ততখানি গুরুত্ব দেননি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অন্ধ', 'আততায়ী', এবং অন্ধের বউ' গল্পে চরিত্র নির্মাণে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তার সৃষ্ট চরিত্রগুলি শুধুমাত্র দৃষ্টিপ্রতিস্পর্ধী না হয়ে, হয়ে উঠেছে অন্তর্দ্বন্দ্বও বহির্দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত, ভালোমন্দে মেশানো রক্তমাংসের জীবন্ত মানুষ। বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় তার 'অজান্তে' ও 'চোখ গেল' গল্পে একইসঙ্গে প্রতিস্পর্ধীদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী, স্বার্থপরতা এবং অন্য গল্পে মানুষের আত্মত্যাগের বিষয়টি দেখিয়েছেন। সুবোধ ঘোষের 'চোখ গেল' গল্পটি বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় ব্যতিক্রমধর্মী। এই গল্পে প্রথম দৃষ্টিপ্রতিস্পর্ধী হিরণ্ময়ের সামাজিক ও পারিবারিক ভূমিকা, আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডে তার অংশগ্রহণের বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। বিমল কর 'জননী' গল্পে দীনেন্দ্রকে যেভাবে নির্মাণ করেছেন সেখানে তার বেঁচে থাকার বাইরের জগৎ উপেক্ষিত। লেখকের মতে সে তার মনোজগৎ নিয়ে ব্যস্ত। ফেলুদা সিরিজের 'গোলকধাম রহস্য' গল্পটিতে সত্যজিৎ রায় বিজ্ঞানী নিহার দত্তকে নির্মাণ করেছেন প্রতিশোধ ও জিঘাংসার প্রতিমূর্তিরূপে। সে যেভাবে খুন ও আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত হয়, সেখানে মানুষ হিসেবে

তার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। এই গল্পে নেতিবাচক কর্মকাণ্ডের দ্বারা প্রতিবন্ধকতা বিষয়টি উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। মহাশ্বেতা দেবীর 'কবিপত্নী' গল্পটি সমাজবাস্তবতার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

৫.২৪ উপসংহার

বাংলা কথাসাহিত্যে দৃষ্টিহীন চরিত্রের আলোচনায় অক্ষমতাবিদ্যাচর্চা হল একটি বিশেষ ফ্রেম। এর পরিপ্রেক্ষিত ও সূত্রগুলি স্মরণে রেখে আমরা প্রাপ্ত চরিত্রগুলির বিচার বিশ্লেষণ করেছি। আমাদের পঠনপাঠন ও বিশ্লেষণে প্রাপ্ত সিদ্ধান্তগুলি হল –

১। দৃষ্টিহীনতার কারণে একদল মানুষ সামাজিক ও পারিবারিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে।

২। প্রতিবন্ধকতা ও দারিদ্র ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কযুক্ত। অধিকাংশ গল্পে দৃষ্টিহীনতার সাথে দারিদ্রের ছবি আঁকা হয়েছে।

৩। প্রতিবন্ধকতা অনেক ক্ষেত্রে হয়ে উঠেছে তথাকথিত সক্ষম ব্যক্তিদের দ্বারা অক্ষম ব্যক্তিদের শোষণের হাতিয়ার।

৪। দৃষ্টিহীনতার কারণে এক দল মানুষ সামাজিকভাবে স্বাধীন জীবনযাপনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত।

৫। অনেকগুলি গল্পে দেখা যাচ্ছে লেখকরা দৃষ্টিহীন চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রচলিত মিথ ও প্রবাদ প্রবচনের দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন। এ ক্ষেত্রে অবৈজ্ঞানিক ধারণাগুলি ভাঙার জন্য তারা কোনো সদর্থক ভূমিকা পালন করেননি। এসব ক্ষেত্রে তাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা বা সমাজমনস্কতার বিষয়টি প্রশ্নের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

৬। বাস্তব সমস্যা চিত্রণ এবং সম্ভাবনার পরিবর্তে অনেকেই সহানুভূতিকে গুরুত্ব দিয়েছেন।

৭। অধিকাংশ গল্পে দৃষ্টিহীনদের তীব্র ইন্দ্রিয়সচেতনতা এবং মনোজগতের বিশ্লেষণ গুরুত্ব পেয়েছে।

৮। অনেকগুলি ছোটগল্প ও উপন্যাসে আমরা দেখেছি প্রতিবন্ধকতা মানুষের বিবাহ ও বিবাহ উত্তর জীবনে সমস্যা সৃষ্টি করেছে। বিষয়টি অঙ্গহানিযুক্ত ব্যক্তিদের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্নকে উত্থাপন করে।

৯। দৃষ্টিহীনদের অগ্রগতি ও সামাজিক বিবর্তনের বিষয়টি অধিকাংশ বাংলা ছোটগল্পে গুরুত্ব পায়নি। এ ক্ষেত্রেও লেখকদের সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয়টি আমাদের ভাবাচ্ছে।

তথ্যসূত্র

১। বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার। *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত।* মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রা. লি.: কলকাতা, ১৯৬৬। পৃ. ৪৪৮।

২। চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল। *সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*। রত্নাবলী: কলকাতা, ১৯৯৫। পৃ. ২০০।

৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ২০০।

৪। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৯।

৫। পূর্বোক্ত, পৃ. ২০১।

৬। *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত,* পূর্বোক্ত পৃ. ৪৫২।

৭। *সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ,* পূর্বোক্ত পৃ. ১৯৯।

৮। বর্ষাযাপন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। https://bn.m.wikisource.org

৯। *সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ,* পূর্বোক্ত পৃ. ২০১।

১০। বসু, বুদ্ধদেব। *প্রবন্ধ সংকলন,* দেজ: কলকাতা, ১৯৮৩। পৃ. ৪৭।

১১। বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার। *রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা*। কলকাতা*:* ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ২০১০। পৃ. ৪২৫।

১২। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *গল্পগুচ্ছ*। রিফ্লেক্ট: কলকাতা, ২০০৪। পৃ. ৪০৭।

১৩। রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা। পূর্বোক্ত পৃ. ৪২৬।

১৪। *গল্পগুচ্ছ*। পূর্বোক্ত পৃ. ৪১০।

১৫। পূর্বোক্ত পৃ. ১০১।

১৬। ভট্টাচার্য, ফাল্গুনী। *'সাহিত্য ও সিনেমায় প্রতিবন্ধী*, পরম্পরা: কলকাতা। ২০১১। পৃ. ৯৯।

১৭। রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা। পূর্বোক্ত পৃ. ৪২৮।

১৮। *'সাহিত্য ও সিনেমায় প্রতিবন্ধী*, পৃ. ১০০।

১৯। পূর্বোক্ত পৃ. ১০১।

২০। বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার। *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা।* মডার্ণ বুক এজেন্সী: কলকাতা। ২০১৯-২০২০। পৃ. ১০০।

২১। বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর। *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প*, 'তমসা'। বেঙ্গল পাবলিশার্স: কলকাতা, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ। পৃ. ২৩৫।

২২। *'সাহিত্য ও সিনেমায় প্রতিবন্ধী*, পৃ. ১০২।

২৩। বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক। *লেখকের কথা*। কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা. লি., ১৯৫৭। পৃ. ১৩।

২৪। *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*। পৃ. ২২০।

২৫। বন্দ্যোপাধ্যায় মাণিক। 'অন্ধ', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র* (দ্বিতীয় খণ্ড)। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অ্যাকাডেমি: কলকাতা, ১৯৯৮। পৃ. ২১৫।

২৬। বন্দ্যোপাধ্যায় মাণিক। 'আততায়ী', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র* (চতুর্থ খণ্ড)। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অ্যাকাডেমি*:* কলকাতা, ১৯৯৯। পৃ. ১৩১।

২৭। পূর্বোক্ত পৃ. ১৩১।

২৮। *'সাহিত্য ও সিনেমায় প্রতিবন্ধী*, পরম্পরা। পূর্বোক্ত পৃ. ১০৯।

২৯। বন্দ্যোপাধ্যায় মাণিক। *অন্ধের বউ*, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র দ্বিতীয় খণ্ড। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অ্যাকাডেমি*:* কলকাতা, ১৯৯৮। পৃ. ২১৫।

৩০। *'সাহিত্য ও সিনেমায় প্রতিবন্ধী*, পূর্বোক্ত পৃ. ১০২।

৩১। চন্দ, সোমেন। 'মুহূর্ত কথা', *অন্ধ শ্রীবিলাসের অনেক দিনের একদিন*। পারুল প্রকাশনী *:* কলকাতা, ২০২০, পৃ. ১০৬।

৩২। পূর্বোক্ত পৃ. ১১০।

৩৩। পূর্বোক্ত পৃ. ১১০।

৩৪। পূর্বোক্ত পৃ. ১০৭।

৩৫। পূর্বোক্ত পৃ. ১০৭।

৩৬। *'সাহিত্য ও সিনেমায় প্রতিবন্ধী*, পূর্বোক্ত পৃ. ১০৫।

৩৭। মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ। 'অজান্তে', *রচনাবলী প্রথম খণ্ড*। গ্রন্থালয় প্রা.লি*:* কলকাতা, ১৯৭৩। পৃ. ২৫৮।

৩৮। মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ। ‘চোখ গেল’, *রচনাবলী প্রথম খণ্ড*। গ্রন্থালয় প্রা.লি: কলকাতা ১৯৭৩। পৃ. ২৫৩।

৩৯। পূর্বোক্ত পৃ. ২১৯।

৪০। ঘোষ সুবোধ। চোখ গেল, গল্পসমগ্র ১। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি: কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ২১৯।

৪১। পূর্বোক্ত পৃ. ২১৯।

৪২। পূর্বোক্ত পৃ. ২১৯।

৪৩। পূর্বোক্ত পৃ. ২১৯।

৪৪। *সাহিত্য ও সিনেমায় প্রতিবন্ধী* ,পূর্বোক্ত পৃ. ১১৬ -১১৭।

৪৫। রায় সত্যজিৎ। গোলকধাম রহস্য, ফেলুদা সমগ্র ২, আনন্দ পাবলিশার্স: কলকাতা । পৃ. ৮০।

৪৬। সরকার, নন্তু। ঝিনুক থেকে মুক্ত, তরুণ প্রেস: কলকাতা, ১৯৯৪। পৃ. ৭৩।

ষষ্ঠ অধ্যায়

দৃষ্টিহীন চরিত্র নির্মাণে বাংলা কথাসাহিত্য ও চলচ্চিত্রের একটি তুলনামূলক আলোচনা

৬.১ সূচনা

আমাদের মূল আলোচ্য আধুনিক বাংলা সাহিত্যে দৃষ্টিহীনদের চর্চা ও অবস্থান। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে উক্ত বিষয়টি বিচার বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি। কথাসাহিত্যে দৃষ্টিহীনদের চর্চা ও অবস্থান বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে আমরা লেখকদের সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রশ্নটিও পর্যালোচনা করেছি। এই অধ্যায়ে আমরা দৃষ্টিহীন চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে কথাসাহিত্য ও বাংলা চলচ্চিত্রের একটি তুলনামূলক আলোচনা করব। দুটি জনপ্রিয় প্রকাশ মাধ্যমের ভূমিকা পর্যালোচনা করার মাধ্যমে চলমান সমাজ ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যগুলি বোঝার চেষ্টা করব।

সাহিত্যের প্রধান বাহন হলো ভাষা। কিন্তু সংলাপ ছাড়াও, ক্যামেরা ও আলোকসম্পাত, দৃশ্যসংস্থাপন ও আবহ সঙ্গীতের সম্মিলিত কৌশলে গড়ে ওঠে চলচ্চিত্রের নিজস্ব শিল্পরূপ। আঙ্গিকগত দিক থেকে নানান পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সাহিত্য ও সিনেমা পরস্পরের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত। সাহিত্যের উপাদান নিয়ে গড়ে ওঠে সিনেমা আবার, সিনেমার পরোক্ষ প্রভাবও পড়ে সমকালীন সাহিত্যে। কখনো সিনেমার প্রয়োজনে লেখা হয় নতুন চিত্রনাট্য। সাহিত্য যেমন সমাজ ও সমকাল নিরপেক্ষ হতে পারে না তেমনই চলচ্চিত্রেও ফুটে ওঠে সমকালীন সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতির বাস্তব প্রতিবিম্ব। মানুষ মানুষেরই কথা শুনতে ও দেখতে ভালোবাসে। সাহিত্যের থাকে পাঠক সমাজ, সিনেমার

থাকে শ্রোতা ও দর্শক। সমাজের কাহিনি সাহিত্য ও সিনেমার মাধ্যমে পুনর্নির্মিত হয়ে সমাজের সমর্থন ও অনুমোদন প্রত্যাশা করে। তবে সাহিত্য অনেক সময় কলাকৈবল্যবাদের ছলনায় সমাজ ও সমকালকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করলেও সিনেমা জন্মলগ্ন থেকেই প্রতিবেদকের ভূমিকা পালন করে চলেছে। "চলচ্চিত্র এভাবেই আধুনিকতার শিলমোহর দিয়ে যাচ্ছে সমকালীন সভ্যতার পাতা থেকে পাতায়। আমার মনে হয় অন্য কোনো প্রকাশ মাধ্যম বিদ্যুল্লতার মতো এমন ক্ষিপ্র ও বিস্তৃত মন্তব্য করতে পারত না আমাদের সাংস্কৃতিক বিষয়ে।"[১] তাই, বাণিজ্যিক ছবি, তথ্যচিত্র কিম্বা বিনোদন মূলক ছবি যাইহোক, চলচ্চিত্র সমকালীন সমাজবাস্তবতাকে এড়িয়ে যেতে পারে না। সাহিত্যের তুলনায় সিনেমা অনেক সহজেই মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। যারা 'পথের পাঁচালি' কিম্বা 'চোখের বালি' উপন্যাস পড়েনি তাদের অনেকেই সিনেমাগুলি দেখেছে। তাই বাংলা কথাসাহিত্যে দৃষ্টিহীনদের সামাজিক অগ্রগতি ও বিবর্তন কতখানি ধরা পড়েছে তা দেখার পাশাপাশি আমরা বাংলা সিনেমায় দৃষ্টিহীনদের চর্চা ও অবস্থান কতখানি ধরা পড়ে তাও পর্যালোচনা করে দেখব।

বাংলা সিনেমা জন্মলগ্নে পুরাকথাকে আশ্রয় করলেও ক্রমশ উঠে এসেছে সমকালীন সমাজবাস্তবতার ছবি। সত্যজিত রায়ের 'পথের পাঁচালি', ঋত্বিক ঘটকের 'মেঘে ঢাকা তারা', মৃণাল সেনের 'তাহাদের কথা'র পরম্পরা ধরে উঠে এসেছে সাধারণ মানুষের কথা। বাংলা তথা ভারতীয় সিনেমায় আর পাঁচটা বাস্তবধর্মী কাহিনির মতো উঠে এসেছে প্রতিস্পর্ধী মানুষের জীবনযন্ত্রণার ছবি। কোথাও তা হয়ে উঠেছে নিছক কাহিনিধর্মী প্রতিবেদন, কোথাও আবার গবেষণাধর্মী documentation, আবার কোথাও শিল্পের সূক্ষ্ম কৌশল নাড়া দিয়ে যায় আমাদের বোধের গভীরে। আমাদের আলোচনার মূল ক্ষেত্র যেহেতু বাংলা কথাসাহিত্য ও দৃষ্টিহীনতা সেজন্য এখানে প্রধানত দৃষ্টিপ্রতিস্পর্ধী কেন্দ্রীক বাংলা সিনেমার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হবে।

৬.২ বাংলা চলচ্চিত্র মাধ্যমে প্রতিবন্ধকতার চর্চা

বাংলা সিনেমায় প্রতিবন্ধী চর্চা সম্পর্কে ফাল্গুনী ভট্টাচার্য লেখেন- "সাদা কালো থেকে রঙিন, স্বাধীনতা পূর্ব সিনেমা থেকে আজকের একবিংশ শতাব্দীর তথ্য প্রযুক্তি সমৃদ্ধ ঝাঁ চকচকে সিনেমায় এসে গেছে শারীরিক মানসিকভাবে অক্ষম নরনারীর কথা।"[২] বাংলা চলচ্চিত্র মাধ্যমে দৃষ্টিহীন চরিত্র নির্মাণ প্রসঙ্গে আমরা ঐতিহাসিক কাল পর্ব ধরে উক্ত মাধ্যমে প্রতিবন্ধকতার চর্চার একটি রূপরেখা অঙ্কনের চেষ্টা করব। ১৯৪৯ সালে 'রজনী'র কাহিনি অবলম্বনে সমর সিনেমাটি নির্মিত হয়। পরিচালক ছিলেন নিতিন বসু। একই বিষয় অবলম্বনে তিনি ১৯৫০ সালে হিন্দি ভাষা মাধ্যমে *মশাল* সিনেমাটি তৈরি করেন। এর পঁচিশ বছর পর দীনেন গুপ্তের পরিচালনায় বাংলা ভাষা মাধ্যমে সিনেমাটি পুনর্নির্মিত হয়। এই সিনেমায় দৃষ্টিহীনা রজনীর জীবনযন্ত্রণা, ইন্দ্রিয়সচেতন অনুভূতির জগৎ এবং তার জীবনের উত্তরণের কাহিনি উপস্থাপিত হয়েছে। ১৯৫২ সালে অনুরূপা দেবীর 'শ্যামলী' উপন্যাস অবলম্বনে পরিচালক অজয় কর *শ্যামলী* ছবিটি তৈরি করেন। এই ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্র শ্যামলী মূক ও বধির এবং মানসিকভাবে জড়প্রকৃতির। শেষ পর্যন্ত সে কীভাবে তার প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে সেটাই এই সিনেমার মূল উপজীব্য। ১৯৫৯ সালে মুক্তি পায় পরিচালক তপন সিংহ নির্মিত *ক্ষণিকের অতিথি* সিনেমাটি। এখানে দেখা যায় আকস্মিক দুর্ঘটনায় বাবু অস্থিগত প্রতিবন্ধকতার শিকার হয়। বিমল নামক এক ডাক্তারের প্রচেষ্টায় সে কীভাবে উঠে দাঁড়ায় তার সেই লড়াইকে এই সিনেমায় রূপায়িত করা হয়েছে। ১৯৭৩ সালে তপন সিংহের পরিচালনায় মুক্তি পায় *আঁধার পেরিয়ে* সিনেমাটি। এর কেন্দ্রীয় চরিত্র কাজল আকস্মিকভাবে তার দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ব্যক্তিজীবন ও পরিবারে কতখানি সমস্যা ও জীবনযন্ত্রণার শিকার হয় তা দেখানো হয়েছে।

সমরেশ মজুমদারের কাহিনি অবলম্বনে শংকর ভট্টাচার্যের পরিচালনায় *দৌড়* সিনেমাটি মুক্তি পায় ১৯৮৯ সালে। এখানে দেখানো হয়েছে 'ফিজিকালি ইনভ্যালিড' নীরা কিভাবে জীবনের মূল স্রোতে ফিরে আসছে। ১৯৮৯ সালে অপর্ণা সেন তার *সতী* সিনেমায় দেখালেন মূক ও বধির উমা কিভাবে সমাজে কৌলিন্য প্রথার শিকার হয়ে অকথ্য নির্যাতন ভোগ করছে। ১৯৯৪ সালে *হুইল চেয়ার* সিনেমায় দেখানো হলো মানুষ কিভাবে তার শারীরিক প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে সমাজসেবার আদর্শ পালন করে চলেছে। ২০০১ সালে *পারমিতার একদিন* সিনেমায় অপর্ণা সেন দেখান যে, মানুষের শারীরিক প্রতিবন্ধকতা কীভাবে পারিবারিক জীবনে সমস্যার কারণ হয়ে উঠছে। ২০০১ সালে বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত তার *উত্তরা* সিনেমায় বামন চরিত্রের মধ্যে দিয়ে দেখালেন যে ,সমাজ যাদের প্রতিবন্ধী বলে সমাজ সংগঠনের প্রশ্নে তারা কতখানি প্রগতিশীল মানসিকতার চর্চা করে চলেছে। এইভাবে প্রতিবন্ধী ও প্রতিবন্ধকতা চর্চার প্রশ্নে স্বল্প কালের মধ্যে বাংলা চলচ্চিত্র মাধ্যম এক সমৃদ্ধশালী পরম্পরা বহন করে চলেছে। এর পর আমরা বাংলা চলচ্চিত্রে দৃষ্টিহীন চরিত্র নির্মাণ প্রসঙ্গে এ জাতীয় চরিত্র আছে এমন সিনেমা সম্পর্কে আলোচনা করব। দৃষ্টিহীন চরিত্র আছে এমন কয়েকটি বাংলা চলচ্চিত্রের তালিকা নিচে দেওয়া হল।

১। আঁধার পেরিয়ে, পরিচালক - তপন সিংহ, মুক্তি ১৯৭৩ খ্রীস্টাব্দ।

২। রজনী, পরিচালক - দীনেন গুপ্ত, মুক্তি ১৯৭৮ খ্রীস্টাব্দ।

৩। দেখা, পরিচালক - গৌতম ঘোষ, মুক্তি ২০০১ খ্রীস্টাব্দ।

৪। ল্যাপটপ, পরিচালক - কৌশিক গাঙ্গুলী, মুক্তি ২০১১ খ্রীস্টাব্দ।

৫। কেয়ার অফ স্যার, পরিচালক - কৌশিক গাঙ্গুলী, মুক্তি ২০১৩ খ্রীস্টাব্দ।

৬.৩ আঁধার পেরিয়ে (১৯৭৩ খ্রীঃ)

চিত্তরঞ্জন মাইতির কাহিনি অবলম্বনে নির্মিত ছবিটি মুক্তি পায় ১৯৭৩ সালে। সঙ্গীত পরিচালনা ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক তপন সিংহ। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন মাধবী চক্রবর্তী, শুভেন্দু চ্যাটার্জী, সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়, অনিল রায়, নির্মল কুমার প্রমুখ। ছবিটির পটভূমিতে রয়েছে কলকাতা ও কুলু মানালির পার্বত্য অঞ্চল। ফ্ল্যাশব্যাকের সাহায্যে পুরো গল্পটা বলা হয়েছে। উল্টো দিক থেকে কাহিনি বলার এই রীতি সমকালীন উপন্যাস ও চলচ্চিত্রে লক্ষ্য করা যায়।

ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্র ফটোগ্রাফার শান্তনু। কাজলকে সে ভালোবেসে বিয়ে করে। বিয়ের কিছু দিনের মধ্যে তার স্ত্রী আকস্মিকভাবে সম্পূর্ণ দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলে। এই ঘটনা শান্তনুকে আহত করে কিন্তু কাজল এই অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে না। যদিও সে আপ্রাণ চেষ্টা করে দৃষ্টির অভাব সত্ত্বেও আত্মনির্ভর হয়ে ওঠার। তবে তার মনে হয় অন্য মানুষের সঙ্গে তার যোগাযোগের সেতু নষ্ট হয়ে গেছে। কেবলই মনে হয় সকলে তাকে দয়া করছে, সহানুভূতি দেখাচ্ছে। আকস্মিক দৃষ্টিশক্তি হারানোয় এ যেন এক মানসিক বিকার যা তার জীবনকে আরো জটিল করে তুলেছে। অথচ আপাতভাবে শান্তনু তাকে সব রকমের সাহায্য করে। মধুর ব্যবহার করে কিন্তু কাজল কথায় কথায় প্রতিক্রিয়া দেখায়। তার অন্যান্য ইন্দ্রিয় আগের তুলনায় অনেক বেশী সজাগ হয়ে উঠেছে। কাজলের মন ভালো করার জন্যই একদিন শান্তনু তাকে নিয়ে কুলু মানালি বেড়াতে যায়। সেখানে ঘটনাচক্রে স্বাতী নামে একটি মেয়ের সঙ্গে তার আলাপ হয়। ক্রমশ কাজল আরো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তাকে হোটেলে একা রেখে স্বাতীর সঙ্গে শান্তনু এক পাহাড়ি হ্রদ দেখতে যায়। ফেরার সময় ধস নেমে রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ফিরতে দেরি হয়। এমন সময় কাজল একা বাইরে বেড়িয়ে আসে এবং খাদে পড়ে গিয়ে মারা যায়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পদ্মানদীর মাঝি’ উপন্যাসে যেমন মালার বিপরীতে হাজির করা হয়েছে কপিলা চরিত্রটিকে তেমনই এই সিনেমায় কাজলের অবস্থান। কপিলা সজীব, সক্রিয়, পদ্মানদীর প্রতিনিধি স্থানীয়া। মনের অজান্তে কুবের তার অনুকূলে ভেসে চলে। তুলনায় মালা চরিত্রটি নিষ্প্রভ এবং নিষ্ক্রিয়। সে নানাভাবে তার অস্থিগত সমস্যাকে অতিক্রম করার চেষ্টা করে তবু মালা উপন্যাসের উপেক্ষিতা নায়িকা। আবার, উক্ত ছবিটি কিয়দাংশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘দৃষ্টিদান’ গল্পের সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু কুমু শেষ পর্যন্ত নিজের দৃষ্টিহীনতাকে অতিক্রম করে স্বামীর চোখ খুলে দিতে সক্ষম হয়। এখানেও কাজল আর শান্তনুর দাম্পত্যজীবনে দৃষ্টিহীনতা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের যোগাযোগের সেতু সত্যি নষ্ট হয়ে যায়। তাই পরিণতিতে এমন মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটে। কাজলের জীবন-যন্ত্রণা এবং আঁধার পেরোনোর চেষ্টাটুকুই এ ছবির সম্বল। সমালোচকের মতে, “ছবিটি প্রতিবন্ধী রমণীর জীবনের দুর্ভাগ্যকে খুব সূক্ষ্ম রেখায় ফুটিয়ে তুলেছে।।”[৪]

৬.৪ রজনী (১৯৭৮ খ্রীঃ)

সিনেমাটির মূল কাহিনির রচয়িতা হলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। চিত্রনাট্য লিখেছেন শেখর চট্টোপাধ্যায়। গানগুলি লিখেছেন পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। অভিনয়ে রঞ্জিত মল্লিক ও সুমিত্রা মুখোপাধ্যায় ছাড়া রয়েছেন ইন্দু দেবী, কাজল গুপ্ত, অনামিকা সাহা, সোনালী গুপ্ত, স্মিতা সিংহ, প্রমুখ। ১৯৭৮ সালে ছবিটি পরিচালনা করেন দীনেন গুপ্ত। উপন্যাসে মূল কাহিনি চলচ্চিত্রে পরিবেশনার ক্ষেত্রে কি ধরনের পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে তা যেমন আমরা লক্ষ্য করব তেমনই সমাজবাস্তবতার দিকটিও আমরা পর্যালোচনা করে দেখবো।

মূল উপন্যাসটি শুরু হচ্ছে রজনীর আত্মকথনের মধ্যে দিয়ে। “আমি জন্মান্ধ রজনী, তোমরা কি আমার কাহিনি মন দিয়া শুনিবে?”[৬] সিনেমার শুরুতে আমরা পাই অমরনাথ ও

লবঙ্গলতার একটি প্রেমের দৃশ্য। বসন্তকালীন প্রেক্ষাপটে দুজনের আবেগ বিহ্বল আলাপের দৃশ্য দর্শকের মনোযোগ আকর্ষণ করে। চিত্রনাট্যটি কিছু দূর এগোনোর পর রজনীর প্রসঙ্গ এসেছে স্বাভাবিকভাবে। ফুল বিক্রেতার কন্যা রজনী নিয়মিত রামসদয় মিত্রের স্ত্রী লবঙ্গলতাকে ফুল দিতে আসে। এমনই একদিন তাড়াহুড়োর সময় জমিদার বাড়ির ফুলদানিটি তার পায়ে পড়ে যায় এবং সে আহত হয়। ছোটোমা লবঙ্গলতার কথায় ডাক্তার শচীন্দ্র তার শুশ্রূষা করে। এখানেই রজনীর সঙ্গে তার প্রথম আলাপ। সে রজনীর দৃষ্টি ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। সেই উপলক্ষে মাঝেমধ্যেই রজনীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটে। স্পর্শ ও শ্রবণের মাধ্যমে ছোটোবাবু শচীন্দ্রের সামগ্রিক উপস্থিতি রজনীর মনোজগতে তরঙ্গ সৃষ্টি করে। পরিচালক এখানে মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে রজনীর সঙ্গে ছোটোবাবুর ঘনিষ্ঠতার মুহূর্তগুলি তৈরি করেছেন। মূল উপন্যাসে যেখানে যতটুকু সম্ভাবনা সুপ্ত ছিল পরিচালক চলচ্চিত্র মাধ্যমে তাকে প্রকট করে তুলেছেন এবং তা বাস্তবসম্মত হয়েছে বলেই আমাদের ধারণা।

ছোটোমার ইচ্ছা অনুযায়ী রজনীর বিয়ে ঠিক করা হয় গোপাল নামক এক নায়েবপুত্রের সঙ্গে। গোপাল অত্যন্ত নির্দয় স্বভাব যদিও বাইরের লোক তার এই স্বভাবের কথা জানে না। সে ঘরে বউ থাকা সত্ত্বেও রজনীকে বিয়ে করতে চায় বংশরক্ষার উদ্দেশ্যে। এখানে একাধারে দারিদ্র ও দৃষ্টিহীনতা এবং অন্যদিকে কন্যা হওয়ার অপরাধে রজনী পুরুষের লালসার শিকার হতে যাচ্ছিল। যদিও শেষ পর্যন্ত সেই পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। তবে রজনী যার ওপর বিশ্বাস করে ঘর ছেড়েছিল সেই হিরালালের কুপ্রস্তাব এবং প্ররোচনা তাকে আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দেয়। এখানেও নারীত্ব ও দৃষ্টিহীনতা নির্যাতনের কারণ। পরিচালক শিল্পের কৌশলে বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন।

চলচ্চিত্রের শেষে রজনীর হৃতসম্পত্তির পুনরোদ্ধার এবং আর্থিক অবস্থান পরিবর্তনের পর শচীন্দ্রের সঙ্গে বিবাহের পূর্বমুহূর্তে রজনীর দৃষ্টি ফিরে পাওয়ার ঘটনাটিও মূল উপন্যাসের থেকে আলাদা। মূল উপন্যাসে ছিল এক সন্ন্যাসীর সাহায্যে রজনী তার দৃষ্টি ফিরে পেয়েছে। চলচ্চিত্রে রজনী ছোটোবাবুর চিকিৎসায় দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাচ্ছে। বিষয়টি যেমন বাস্তবানুগ তেমনই বিজ্ঞানসম্মত হয়েছে। চলচ্চিত্রের এই পরিবর্তন তাই যুগোপযোগী বলে মনে হয়। মূল কাহিনি অক্ষুণ্ণ রেখে বাস্তব সমাজ পরিবেশে রজনীর স্বাভাবিক উপস্থাপনা প্রশংসার দাবি রাখে।

৬.৫ দেখা (২০০১ খ্রীঃ)

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাহিনি অবলম্বনে নির্মিত দেখা সিনেমাটি মুক্তি পায় ২০০১ সালে। সঙ্গীত পরিচালনা ও চিত্রনাট্য লিখেছেন পরিচালক গৌতম ঘোষ। *দেখা* সিনেমাটি সব দিক থেকেই প্রচলিত ঘরানার ছবির তুলনায় আলাদা। কেন্দ্রীয় চরিত্র শশীভূষণ সান্যালের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। অন্যান্য চরিত্রের ভূমিকায় রয়েছেন দেবশ্রী রায়, ইন্দ্রানী হালদার, রূপা গঙ্গোপাধ্যায়, অঞ্জন দত্ত প্রমুখ। কমল কাঞ্জিলাল নামে এক দৃষ্টিহীন অভিনেতা উক্ত চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন। ঘটনাটি আধুনিক বাংলা চলচ্চিত্রের জগতে উল্লেখযোগ্য। কৃষ্ণচন্দ্র দের পর চলচ্চিত্র জগতে দৃষ্টিহীন অভিনেতার উপস্থিতি সেভাবে লক্ষ্য করা যায় না।

ছবিটির কেন্দ্রীয় চরিত্র শশীবাবু সাহিত্যের অধ্যাপক ও কবি। গ্লুকোমাজনিত কারণে তার চোখে দৃষ্টি ক্ষীণ হতে হতে একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। তার স্বাধীন জীবন যাপন ও বিশেষ জীবনদর্শনের জন্য অনেকেই যেমন দূরে সরে গেছে তেমনই নতুন নতুন মানুষের সঙ্গে গড়ে উঠেছে সম্পর্ক। একদিন তার স্ত্রী রেবা তাদের একমাত্র কন্যা সোহিনীকে নিয়ে চলে যায়। স্মৃতি আর নিঃসঙ্গতা তাকে ঘিরে ধরে। তবু পুরোনো মত ও বিশ্বাসে সে অটল।

কমিউনিজমে বিশ্বাস করে, মানুষের স্বার্থপরতাকে সমালোচনা করে। দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে জীবন ও জগতকে নতুনভাবে দেখার চেষ্টা করে। পুরোনো বাড়ি সে প্রোমোটারের হাতে তুলে দিতে চায় না কারণ সেখানে জড়িয়ে আছে ছেলেবেলার অনেক স্মৃতি, তার প্রথম কবিতার বই ছাপানোর রহস্যময় অনুভূতি। বাড়ির পুকুর পারে অনেক পাখির বাস, স্থানীয় বস্তির মানুষগুলোর কাছে জলাশয়টি একটি ভরসাস্থল।

দৃষ্টিশক্তি হারানোর পর সে ব্রেল পদ্ধতি শিখেছে, ব্রেল ঘড়ি ব্যবহার করে, সহকারীর সাহায্যে খবরের কাগজ পড়ে, এইভাবে নতুন পৃথিবীর সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যায়। তবে তার জীবনযাপন আগের মতোই এলোমেলো। মদ্যপান ও বহু নারীতে আসক্তি যেমন তার চরিত্র বৈশিষ্ট্য তেমনই মানুষের পাশে দাঁড়ানো তার অভ্যেস। তার মাস্টার মশায়ের মেয়ের কাছে সে ভাড়া নিতে আপত্তি করে কারণ সে চাকরি করলেও স্বামী পরিত্যক্তা এবং একটি সন্তানকে সে ভালোভাবে মানুষ করার চেষ্টা করছে।শশীভূষণ সান্যাল তাই ভালোমন্দে মেশানো একটি বাস্তব চরিত্র। দৃষ্টিশক্তি হারানোর পরও জীবনসংগ্রাম জারি রেখেছে।

অন্যদিকে রয়েছে আর এক দৃষ্টিহীন চরিত্র গগন। সে শশীবাবুর মতো আলোক প্রাপ্ত নয়। জন্মসূত্রেই সে দৃষ্টিহীন। তার অনুভূতির জগৎ এখানে গুরুত্ব পেয়েছে। গগন ভালো গান গায়, পাখির ডাক নকল করতে পারে। চরিত্রটি অনেকটা তারাশঙ্করের 'তমসা' গল্পের পঙ্খে চরিত্রের মতো। তবে পঙ্খে চরিত্রে লেখক উত্তরণ অপেক্ষা বাস্তব সমস্যাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। এখানে গগন উত্তরণের খোঁজে উত্তরবঙ্গ থেকে কলকাতায় আসে, তার হাত ধরে শশীবাবুও মাস্টার মশায়ের সেই মেয়ে যে শশীবাবুর বাড়ি ভাড়া থাকে। গগনের চরিত্রায়ন সম্পর্কে ফাল্গুনীবাবু বলেন, "দৃষ্টিহীন এই যুবক ধর্ষিত হচ্ছে যা অভাবনীয়ভাবে

অভূতপূর্ব।"[৮] শশীবাবুর যৌনতার প্রসঙ্গটিও 'দেখা' সিনেমায় গুরুত্ব পেয়েছে। আমরা 'রজনী' উপন্যাসেও লক্ষ্য করেছি যে, রজনী হীরালালের কামনার শিকার হতে যাচ্ছিল।

দুটি দৃষ্টিহীন চরিত্র পাশাপাশি দেখালেও একজন শহরের আলোক প্রাপ্ত কবি ও অধ্যাপক, আর এক জন হিন্দুমুসলিম দাঙ্গায় ওপার বাংলা থেকে ছিটকে আসা গগন। দুজনের জীবনচিত্র ও বোধের জগতকে আলাদাভাবে দেখানো হয়েছে। প্রত্যেকেই চেষ্টা করছে তার মতো করে বাঁচার এবং জীবন ও জগতকে তার মতো করে দেখার। জীবন, সমাজ, সময়কে দেখার প্রসঙ্গ যেমন রয়েছে তেমনই দেখা না দেখার নানান ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তুলেছেন পরিচালক শিল্পের কৌশলে। দেখা বিষয়টি তাই চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বিস্তৃত হয়ে যায় বহুমাত্রিক ধারণায়। পরিচালকের কৃতিত্ব এখানেই। তার জীবনদৃষ্টি যেমন গভীর তেমন তীব্র সমাজসচেতনতা লক্ষ্য করা যায় দৃষ্টিহীন চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে। ছবিটি তাই প্রচলিত ঘরানার সিনেমার চেয়ে আলাদা এবং দৃষ্টিহীন চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যের প্রচলিত ছাঁদকে বদলে দিয়েছে।

৬.৬ কৌশিক গাঙ্গুলীর দুটি সিনেমা

ল্যাপটপ (২০১১ খ্রীঃ): কৌশিক গাঙ্গুলীর পরিচালিত এই ছবিটি মুক্তি পায় ২০১১ সালে। কাহিনি ও চিত্রনাট্যরচনা করেছেন পরিচালক নিজেই। মূখ্য চরিত্র পার্থবাবুর ভূমিকাতেও তিনি অভিনয় করেছেন। অন্যান্য চরিত্রের ভূমিকায় রয়েছেন অনন্যা চ্যাটার্জী, রাহুল বোস, শাশ্বত চ্যাটার্জী, চূর্ণি গাঙ্গুলী প্রমুখ। কাহিনির প্রেক্ষাপটে রয়েছে কলকাতা ও দার্জিলিঙের পার্বত্য অঞ্চল। কাহিনির কেন্দ্রে রয়েছে একটি ল্যাপটপ। নানাভাবে সেই ল্যাপটপটির হস্তান্তর এবং তাকে কেন্দ্র করে কাহিনিবৃত্ত আবর্তিত হয়েছে। দৃষ্টিহীনতার প্রসঙ্গ যেমন রয়েছে তেমনই মানুষের যৌন অক্ষমতার প্রসঙ্গটিও উত্থাপন করা হয়েছে এই ছবিতে। সে প্রসঙ্গে সমাজ নির্ধারিত অক্ষমতা ও স্বাভাবিকতার প্রশ্নটি এসেছে। দৃষ্টি বা শ্রবণ অক্ষমতা

বিষয়ে সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন থাকতে পারে কিন্তু যৌন অক্ষমতা বিষয়টি তার চেয়েও মারাত্মক। তাই মানুষ একে সর্বপ্রকারে গোপন রাখতে চায়।

প্রজনন সমস্যা সংক্রান্ত এক ক্লিনিক থেকে একদিন একটি ল্যাপটপ চুরি যায় যার মূলে ছিল সেই অক্ষমতার প্রসঙ্গ। জনৈক ট্যাক্সি ড্রাইভার তার স্ত্রীকে সন্তানবতী করার জন্য সেখানে নিয়ে আসে। তার একমাত্র সম্বল ট্যাক্সিটি বেচেও যখন ষোলো হাজার টাকা কম পড়ে যায় এবং নানান অনুনয় সত্ত্বেও তাকে সেই ঋণ থেকে নিষ্কৃতি দেওয়া হয় না, তখন সে ক্লিনিকেরই ডাক্তারের ল্যাপটপটি চুরি করে সেই টাকা পরিশোধ করে। ঘটনাচক্রে ল্যাপটপটি এক ছোটো হোটেলের মালিক তার ছেলের জন্য কিনে নেয়। শেষ পর্যন্ত তারা চোর সাব্যস্ত হয় এবং কলকাতা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। যাওয়ার সময় ভাড়া বাবদ সেটি বাড়িওয়ালাকে দিয়ে যায়। বাড়িওয়ালা পার্থবাবু হলেন পেশায় একজন লেখক। তিনি সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন। লাঠির সাহায্যে চলাফেরা করেন, ব্রেল ঘড়িতে সময় দেখেন, রেডিও শোনেন আর উপন্যাস লেখেন তার শ্রুতিলেখিকা শোভার সাহায্যে। পার্থবাবু একজন স্বনামধন্য লেখক এবং আর্থিকভাবে স্বনির্ভর ব্যক্তি। সমাজে তিনি আত্মমর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকতে চান। অন্য মানুষদেরও তিনি মর্যাদার চোখে দেখেন। তাই ভাড়াটের কাছে ভাড়া চাইতে তিনি লজ্জা পান। সহকারী শ্রুতিলেখিকাকে তিনি চাকরানি ভাবেন না বরং সমবেদনার দৃষ্টিতে দেখেন। সহকারী শোভাও তাকে সম্মান করে। দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে তাদের মধ্যে এক মানসিক বোঝাপড়া গড়ে ওঠে। তাই শোভা যখন বাবার কথায় কাজ ছেড়ে দিতে চায় পার্থবাবু ভেতরে ভেতরে আহত হলেও তাকে বাধা দেন না। শোভার নিজেরও এতে সম্মতি ছিল না। কিন্তু তিনি বলেন বাবার অনুমতি নিয়ে আসতে। তার বাবার আকস্মিকভাবে মৃত্যু হলে তা সম্ভব হয় না। শোভার চলে যাওয়ার সময় ল্যাপটপটি তিনি শোভার বিয়ের জন্য উপহার দেন কিন্তু শোভা তা বিক্রি করে তাকে টাকা ফিরিয়ে

দেয়। ইত্যাদি ঘটনা পরম্পরা দুজনের মধ্যে একইসঙ্গে আত্মমর্যাদাবোধ এবং মানসিক সম্পর্কের টানাপোড়েনকে ইঙ্গিত করে।

উক্ত ছবিতে পরিচালক দৃষ্টিহীন চরিত্রটির আর্থসামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অবস্থানটি দক্ষতার সঙ্গে পরিবেশন করেছেন। কোনো রকম ভ্রান্ত ধারণা বা মিথের দ্বারা প্রভাবিত হননি বরং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ছবিটিকে বাস্তবানুগ করে তুলেছে। পাশাপাশি যৌন অক্ষমতার প্রসঙ্গটি উত্থাপন করে সমাজসচেতনতার প্রশ্নে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছেন। ছবির শেষে ইন্দ্র নামক চরিত্রটির গুলিবিদ্ধ হওয়ার মধ্যে দিয়ে মানুষের প্রজনন অক্ষমতার বিষয়টিকে সামাজিকভাবে অস্বীকার করার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। তাই আমরা বলতে পারি সবদিক থেকেই বাংলা চলচ্চিত্রের ধারায় এটি একটি নবতম সংযোজন।

কেয়ার অফ স্যার (২০১৩ খ্রীঃ)

কৌশিক গাঙ্গুলী পরিচালিত ছবিটি মুক্তি পায় ২০১৩ সালে। কাহিনি ও চিত্রনাট্য লিখেছেন পরিচালক স্বয়ং। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন শাশ্বত চ্যাটার্জী, রাইমা সেন, সুদীপ্তা চক্রবর্তী, ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত, সব্যসাচী চক্রবর্তী, কৌশিক গাঙ্গুলী প্রমুখ। সঙ্গীত পরিচালনায় রাজানারায়ণ দেব। ছবিটির প্রেক্ষাপটে রয়েছে দার্জিলিং এর কার্শিয়াং শহর।

জয়ব্রত রায় একজন স্কুল শিক্ষক। তার চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হতে হতে একদিন সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। চিকিৎসায় কোনো ফল হয় না। তার দৃষ্টিশক্তি হারানোর পর কর্মক্ষেত্রে ও সমাজে সে কীভাবে প্রতারণা ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছে সেটাই এই সিনেমায় দেখানো হয়েছে। তার জীবনের লড়াই ও উত্তরণের পাশাপাশি রয়েছে নারীদের দেহভিত্তিক শোষণের প্রসঙ্গ।

জয়ব্রতবাবুর পৈতৃকসূত্রে পাওয়া বিদ্যালয় লাগোয়া একটি বিশাল বাংলো ছিল। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগসাজস করে এক ধনী ব্যবসায়ী তা কিনে নিতে চায়।

জয়ব্রতবাবু বাধা দিলে তার ওপর নানান ধরনের আক্রমণ নেমে আসে। দৃষ্টি অক্ষমতার সুযোগ নিয়ে তার সঙ্গে প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য সহকর্মীরা সব রকমের অসহযোগিতা আরম্ভ করে। কিন্তু অন্যায়ের বিরুদ্ধে সে অনমনীয়, আদর্শবাদী শিক্ষক। তাকে বরখাস্ত করা হলে সে বলে যে, স্কুলের বাইরেও একজন শিক্ষক শিক্ষকই থাকে। ওই বিদ্যালয়ের মেঘনা নামে এক শিক্ষিকা এবং ছাত্ররা তার পাশে দাঁড়ায়। জয়ব্রতবাবু তার অ্যাডভোকেট বন্ধু রণবীরকে বিশ্বাস করে সম্পত্তি রক্ষা করার চেষ্টা করে। কিন্তু তার বন্ধু আর এক মহিলা অ্যাডভোকেটের সাহায্যে তাকে ঠকানোর চেষ্টা করে। শিক্ষকের সততায় মুগ্ধ হয়ে সুস্মিতা অরফে রেশমী নামক অ্যাডভোকেট মহিলাটি তার পাশে দাঁড়ায়। পরোক্ষভাবে তাকে সাহায্য করে মেঘনা। শেষ পর্যন্ত সব ষড়যন্ত্র প্রকাশ্যে এসে পড়ে। জয়ব্রতবাবু তার হৃত সম্পত্তি চাকরি এবং সম্মান ফিরে পাচ্ছে।

দৃষ্টিহীনতার অজুহাতে কাউকে চাকরি থেকে বরখাস্ত এবং সহকর্মীদের নানান অসহযোগিতা, প্রতারণার, মাধ্যমে কোনো দৃষ্টিহীন ব্যক্তির সম্পত্তি আত্মসাৎ করার চেষ্টা সমাজে দৃষ্টিহীনদের অবস্থানকে চিহ্নিত করে। পক্ষান্তরে সক্ষমতা এবং অক্ষমতার প্রসঙ্গটিও উত্থাপন করে। তবে শেষ পর্যন্ত তার অনমনীয় মনোভাব এবং আপসহীন লড়াই তাকে প্রতিস্পর্ধীর মর্যাদা দিয়েছে। সিনেমার শেষে রেশমী সুন্দরী নারী হওয়ার জন্য পুরুষের লিঙ্গভিত্তিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। তার পাশে দাঁড়ায় জয়ব্রত। দৃষ্টিহীনদের আর্থ-সামাজিক লড়াইকে দেখানোর পাশাপাশি নারীর লিঙ্গভিত্তিক শোষণের প্রসঙ্গ ব্যবহার করে পরিচালক তীব্র সমাজমনস্কতার পরিচয় দিয়েছেন। সব দিক থেকে বাংলা চলচ্চিত্রের ধারাই এটি একটি সার্থক সংযোজন।

৬.৭ উপসংহার

বাংলা সিনেমার বিবর্তনের ইতিহাস কথাসাহিত্যের তুলনায় আধুনিক কালের হলেও স্বল্প কালের মধ্যে বাংলা চলচ্চিত্র গণমুখী চেহারা লাভ করেছে। আমরা বাংলা কথাসাহিত্য ও চলচ্চিত্রের তুলনামূলক আলোচনা করে দেখেছি যে, দৃষ্টিহীন চরিত্রকেন্দ্রীক বাংলা ছবির সংখ্যা সামান্য হলেও প্রতিস্পর্ধীকেন্দ্রীক বাংলা সিনেমার ধারাটি বেশ সমৃদ্ধ। কথাসাহিত্য ও চলচ্চিত্রের তুলনামূলক পর্যালোচনা করে আমরা নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি চিহ্নিত করেছি।

প্রথমত, বাংলা কথাসাহিত্যে দৃষ্টিহীনদের আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থান অবহেলিত, বাংলা চলচ্চিত্র বহুলাংশে সেই অভাব পূর্ণ করেছে।

দ্বিতীয়ত, বাংলা চলচ্চিত্রে দৃষ্টিহীনদের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের লড়াইয়ের মানসিকতাকে গুরুত্ব দিয়েছে যা মানুষকে প্রতিবন্ধী থেকে প্রতিস্পর্ধী করে তোলে।

তৃতীয়ত, অধিকাংশ ছবিতে দৃষ্টিহীনতার কারণে প্রেম ও দাম্পত্য জীবনে সমস্যা দেখানো হয়েছে। বিষয়টি সর্বাংশে সত্য নয়। দৃষ্টিহীনতা বা অন্য শারীরিক সমস্যা সত্ত্বেও অনেকে সুখী দাম্পত্যজীবন যাপন করে বাস্তবে এমন উদাহরণের অভাব নেই।

চতুর্থত, কথাসাহিত্যের তুলনায় বাংলা চলচ্চিত্রে দৃষ্টিহীন চরিত্রের উপস্থাপনা অনেক বেশী বাস্তবধর্মী ও বিজ্ঞানসম্মত বলে মনে করি।

পঞ্চমত, বাংলা কথাসাহিত্যের তুলনায় চলচ্চিত্রে প্রতিস্পর্ধী দৃষ্টিকোণকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে বলা যায় যে, কথাসাহিত্যের তুলনায় বাংলাচলচ্চিত্র দৃষ্টিহীন চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে কয়েক ধাপ এগিয়ে রয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১। *সমাজের চলচ্চিত্র:* চলচ্চিত্রের সামাজিকতা, পশ্চিমবঙ্গ দ্বাদশ কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব সংখ্যা, নভেম্বর ২০০৬। পৃ. ৫৩।

২। ভট্টাচার্য, ফাল্গুনী। *'সাহিত্য ও সিনেমায় প্রতিবন্ধী*, পরম্পরা: কলকাতা। ২০১১। পৃ. ১৩৬।

৩। *আঁধার পেরিয়ে,* পরিচালক তপন সিংহ, অভিনয় মাধবী চক্রবর্তী, শুভেন্দু চ্যাটার্জী, মুক্তি ১৯৭৩ খ্রীস্টাব্দ, কলকাতা, ফিল্ম।

৪। *'সাহিত্য ও সিনেমায় প্রতিবন্ধী পূর্বোক্ত,* পৃ. ১৪১।

৫। *রজনী,* পরিচালক দীনেন গুপ্ত , অভিনয় রঞ্জিত মল্লিক, সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়, মুক্তি ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ, কলকাতা, ফিল্ম।

৬। চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম। *বঙ্কিম রচনাবলী* (১ম খণ্ড, সমগ্র উপন্যাস)। কামিনী প্রকাশালয় : কলকাতা, ১৯৯১। পৃ. ১।

৭। *দেখা,* পরিচালক গৌতম ঘোষ, অভিনয় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, দেবশ্রী রায়, মুক্তি ২০০১ খ্রীস্টাব্দ, কলকাতা, ফিল্ম।

৮। *সাহিত্য ও সিনেমায় প্রতিবন্ধী* পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৯।

৯। *ল্যাপটপ,* পরিচালক কৌশিক গাঙ্গুলী, অভিনয় কৌশিক গাঙ্গুলী, অনন্যা চ্যাটার্জী, মুক্তি ২০১১ খ্রীস্টাব্দ, কলকাতা, ফিল্ম।

১০। *কেয়ার অফ স্যার,* পরিচালক কৌশিক গাঙ্গুলী, অভিনয় শাশ্বত চ্যাটার্জী, রাইমা সেন, মুক্তি ২০১৩ খ্রীস্টাব্দ, কলকাতা, ফিল্ম।

উপসংহার

'আধুনিক বাংলা সাহিত্যে দৃষ্টিহীনতা প্রসঙ্গ: চর্চা, অবস্থান ও সমাজমনস্কতার পাঠ' শীর্ষক যে গবেষণা প্রকল্প গৃহীত হয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আধুনিক বাংলা সাহিত্যে দৃষ্টিহীনতার প্রসঙ্গ আছে এমন বেশ কিছু কবিতা ও নাটক এবং এগারোটি উপন্যাস ও তেইশটি ছোটগল্প অনুসন্ধান করেছি। এখানে বলে রাখা ভালো উক্ত গবেষণাটি যথেষ্ট সময় ও শ্রম দাবী করে। তাছাড়া, প্রতিস্পর্ধীরা হলো সমাজের সংখ্যালঘু শ্রেণীর মতো একটি অবহেলিত এবং অবদমিত গোষ্ঠী। তাই, বাংলা সাহিত্যের বিপুল ভাণ্ডার থেকে এ জাতীয় চরিত্রের অনুসন্ধান সহজ ব্যাপার নয়। কথাসাহিত্যের জন্মলগ্নে আমরা পাই রজনীর কথা। 'রজনী'র জন্মলগ্ন থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত কালপর্বকে আমার এই গবেষণায় ধরতে চেষ্টা করেছি। যদিও সমাজে নানা ধরনের অঙ্গহানি যুক্ত ব্যক্তিরা প্রায় একই সমস্যার শিকার। তবে উক্ত গবেষণায় প্রধানত আধুনিক বাংলা সাহিত্যে দৃষ্টিহীনদের চর্চা ও অবস্থানের বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে কারণ সমাজে দৃষ্টিহীনদের লড়াইয়ের ইতিহাস কিছুটা আলাদা তাছাড়া, এ সম্বন্ধে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে গবেষণাগ্রন্থ হাতে গোনা। তাই একটি নির্দিষ্ট সমস্যাকে কেন্দ্র করে যথাসম্ভব বিজ্ঞানভিত্তিক অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছি।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করেছি লেখকরা এ জাতীয় চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে স্কেচধর্মী চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রশ্ন কিম্বা বাস্তব অভিজ্ঞতার বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ অনেক ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। তাই কয়েকটি হাতে গোনা গল্প-উপন্যাস ছাড়া প্রতিস্পর্ধীদের সমাজজীবনে নায়ক হয়ে ওঠার লড়াই বড়ো একটা দেখা যায় না। শুধু আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রেই নয়, খেলাধূলা ও সাহিত্য সংস্কৃতির জগতে তাদের লড়াই ও

সাফল্যের খতিয়ানও বড়ো একটা পাওয়া যায় না। তার কারণ সম্ভবত বাংলা ভাষায় যেমন দলিত জনগোষ্ঠীকেন্দ্রীক বা নারীবাদী দর্শনসম্পৃক্ত সাহিত্য সংস্কৃতির নিজস্ব ধারা গড়ে উঠেছে তেমন প্রতিস্পর্ধীকেন্দ্রীক কোনো ধারা গড়ে ওঠেনি। এরই মধ্যে কোনো কোনো কথাকার তীব্র সমাজমনস্কতার পরিচয়ও দিয়েছেন। যদিও আমাদের আলোচ্য বাংলা সাহিত্য কিন্তু বাংলা সিনেমার সঙ্গে কথাসাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে আমরা দেখিয়েছি যে, সাম্প্রতিক কালের বাংলা সিনেমা প্রতিস্পর্ধীদের আর্থসামাজিক লড়াইকে তুলে ধরতে বহুলাংশে সফল হয়েছে।

গবেষণাপত্রের *প্রথম অধ্যায়ে* সামাজিক, আইনগত ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে প্রতিবন্ধকতা বিষয়টিকে দেখা হয়েছে। সে প্রসঙ্গে অন্ধ, কানা, খোঁড়া, প্রতিবন্ধী, অক্ষম প্রভৃতি নেতিবাচক শব্দের পরিবর্তে প্রতিস্পর্ধীর মত যথাযথ পরিভাষা অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছি। প্রসঙ্গত প্রতিবন্ধকতা বিচারের নানা মাপকাঠি পর্যালোচনা করার ক্ষেত্রে ভারতীয় প্রেক্ষিতে প্রতিবন্ধী চর্চার স্বরূপ ও সম্ভাবনার কথা আলোচিত হয়েছে। আমরা দেখেছি প্রতিবন্ধকতা কিভাবে একটি সামাজিক নির্মাণ হয়ে উঠেছে। সেখানে প্রতিবন্ধী অপ্রতিবন্ধী দৃষ্টিকোণ যেমন গুরুত্ব পেয়েছে তেমনই দেশ কাল নির্বিশেষে প্রতিবন্ধী চর্চার প্রাসঙ্গিকতা প্রমাণের চেষ্টা করেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে দৃষ্টিহীনদের সামাজিক অবস্থানের বিবর্তন ও অগ্রগতি আলোচনা প্রসঙ্গে পুরাণ ও কিংবদন্তি থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত তাদের শিক্ষা, পুনর্বাসন, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাস পর্যালোচনা করে আমরা তাদের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থান নির্ধারণের চেষ্টা করেছি। যেহেতু আমাদের মূল আলোচ্য আধুনিক বাংলা সাহিত্যে দৃষ্টিহীনতা প্রসঙ্গ সেজন্য পশ্চিমবঙ্গের দৃষ্টিহীনদের আর্থ-সামাজিক অবস্থানকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে সৃষ্ট চরিত্রগুলি বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমাজে ও সাহিত্যে দৃষ্টিহীনদের চর্চা ও অবস্থান নির্ধারণের ক্ষেত্রে যেমন কলকাতা ও তার আশেপাশের অঞ্চলকে ক্ষেত্রসমীক্ষার অঞ্চল হিসেবে ধরে নিয়ে প্রতিবন্ধী চর্চার সঙ্গে যুক্ত নানান সংগঠন ও ব্যক্তিবর্গের দ্বারস্থ হয়েছি তেমনই আমাদের আলোচনাকে যথাযথ স্বচ্ছ, মানবিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক করার উদ্দেশ্যে অক্ষমতাবিদ্যাচর্চার মতো বিষয়ের সাহায্য নিয়েছি। নানান পত্র-পত্রিকা ও অন্তর্জালের সাহায্য উক্ত আলোচনাকে প্রভাবিত করেছে। আমরা যখন সাহিত্যিকদের সমাজমনস্কতার ওপর গুরুত্ব দিয়েছি সেক্ষেত্রে স্বাভাবিক ভাবেই শিল্পের জন্য শিল্প তত্ত্বটি বর্জিত ও সমালোচিত হয়েছে।

মানুষের অঙ্গহানির বিষয়টিকে একটি শারীরিক সমস্যা ধরে নিয়ে তাকে প্রতিবন্ধকতার তকমা লাগানো এবং বিষয়টিকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিষয় হিসেবে গণ্য করার যে রীতি সমাজে প্রচলিত আছে আমরা তার বিরোধিতা করি। ইতিহাস ও সমাজতত্ত্বের নিরিখে এ কথা প্রমাণিত যে, প্রতিবন্ধকতা একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যা। অক্ষমতা বিদ্যাচর্চাই বলা হয়েছে যে –

১। অঙ্গহানি ও অক্ষমতা দুটি আলাদা বিষয়। অঙ্গহানির ওপর অক্ষমতা বা প্রতিবন্ধকতা আরোপ করা হয়।

২। প্রতিবন্ধকতার বিপরীত ধারণা হলো স্বাভাবিকতার ধারণা। কিন্তু নিখুঁত দেহসৌন্দর্য বা সক্ষমতা যদি স্বাভাবিকতার লক্ষণ হয় তাহলে বাস্তবে কোনো মানুষের পক্ষেই স্বাভাবিক হওয়া সম্ভব নয়। দার্শনিক দৃষ্টিতে যদি পূর্ণতা ও স্বাভাবিকতা সমর্থক হয় সেক্ষেত্রেও এর বাস্তব অস্তিত্ব প্রমাণ নিরপেক্ষ হতে পারে না।

৩। দেহকেন্দ্রীক সংস্কৃতি লিঙ্গভিত্তিক মানসিকতার মতোয় একটি সামাজিক ব্যাধি।

৪। সমাজ নির্ধারিত প্রতিবন্ধী বা অক্ষম ব্যক্তিরা তথাকথিত সক্ষম ব্যক্তিদের দ্বারা শোষিত ও অবদমিত। এই শোষণ কোথাও প্রত্যক্ষ আবার কোথাও পরোক্ষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

৫। প্রতিবন্ধকতা হলো একটি শোষণের হাতিয়ার। বহুক্ষেত্রে মানুষ নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য অন্যকে প্রতিবন্ধী বানিয়ে রাখে।

৬। সমাজ অঙ্গহানিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রতিবন্ধী তকমা দেয় এবং আলাদা করে, এরা হলো সমাজের একটি সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী। তাই অধিকার ও ক্ষমতার প্রশ্নে এরা অবদমিত।

৭। অক্ষমতাবিদ্যাচর্চার একদল গবেষক প্রতিবন্ধকতার চিকিৎসা বিজ্ঞানের আরোগ্যকারী গঠনের বিরোধিতা করে সামাজিক গঠনের কথা বলেছেন। এর অর্থ হলো সমাজ ও পরিবেশকে প্রতিবন্ধী বান্ধব করে তোলা। আমরা চিকিৎসাবিজ্ঞানের আরোগ্যকারী গঠন এবং সামাজিক গঠন উভয়ের সমন্বয়ের পক্ষপাতী।

৮। অঙ্গহানিযুক্ত ব্যক্তিদের অন্ধ, প্রতিবন্ধী বলার মধ্যে সামাজিক নেতিবাচক মনোভাব প্রকাশিত হয়। আমরা দৃষ্টিহীন, প্রতিস্পর্ধী, দৃষ্টিপ্রতিস্পর্ধী ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার কাম্য বলে মনে করি।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে প্রাপ্ত উপন্যাস ও ছোটগল্পগুলি পঠনপাঠন ও বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে কতগুলি নির্দিষ্ট প্রবণতা বা লক্ষণ চিহ্নিত করেছি। সে প্রসঙ্গে কাব্য ও নাটকে প্রাপ্ত দৃষ্টিহীনতার প্রসঙ্গকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। উক্ত লক্ষণগুলি চিহ্নিত করার মাধ্যমে সমাজে ও সাহিত্যে দৃষ্টিহীনদের অবস্থান এবং লেখকদের সমাজমনস্কতা বা সামাজিক দায়বদ্ধতা বোঝবার চেষ্টা করেছি। উক্ত আলোচনা থেকে প্রাপ্ত সিদ্ধান্তগুলি হল –

প্রথমত, অধিকাংশ উপন্যাস ছোটগল্পে দৃষ্টিহীনতার কারণে সামাজিক বিচ্ছিন্নতার ছবি আছে। প্রথম বাংলা প্রতিস্পর্ধীকেন্দ্রীক উপন্যাস *রজনী* তে দৃষ্টিহীনা রজনী তার দৃষ্টিহীনতার

কারণে সামাজিক বিচ্ছিন্নতার শিকার হয়েছে। পরে তার আর্থিক অবস্থানের পরিবর্তন এবং অলৌকিক উপায়ে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়ায় সে বৃহত্তর সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দৃষ্টিদান' এবং তারাশঙ্করের 'তমসা' ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ে 'আততায়ী' গল্পেও আমরা একই ছবি দেখতে পাচ্ছি। দৃষ্টিহীনতার কারণে একদল মানুষ সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন। আধুনিক কাব্য ও নাটকে যেখানে দৃষ্টিহীনতার প্রসঙ্গ এসেছে সেখানেও তাদের সমাজের প্রান্তিক বা অবহেলিত মানুষ হিসেবে দেখানো হয়েছে। সহজ পাঠে দৃষ্টিহীনদের গান শুনিয়ে ভিক্ষা করার প্রসঙ্গ পাচ্ছি। 'অন্ধ বধূ' কবিতাতেও এক দৃষ্টিহীনা গ্রাম্য বধূর জীবন-যন্ত্রণা যেভাবে চিত্রিত হয়েছে তাতে তাকে সমাজ ও পরিবারের মধ্যে থেকেও নানান অবহেলা ও বৈষম্যের শিকার হতে হয়েছে। কাব্যের তুলনায় নাটকে দৃষ্টিহীনদের একটু অন্যরকমভাবে চিত্রিত করা হয়েছে। সেখানে কোথাও বাস্তব পটভূমিতে তাদের জীবনের সংকট গুরুত্ব পেয়েছে কোথাও আবার তারা হয়ে উঠেছে তত্ত্বচরিত্র। বিজন ভট্টাচার্যের 'মরা চাঁদ' নাটকে কবিয়াল পবন বৈরাগীর শিল্পীজীবনের সংকটকে দেখানো হয়েছে। রবীন্দ্রনাটকে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, অন্ধ বাউল চরিত্রগুলির মধ্যে একটা তত্ত্ব বা ব্যঞ্জনার আভাস রয়েছে। সমকালীন সমাজবাস্তবতা সেখানে গৌণ।

দ্বিতীয়ত, প্রতিবন্ধকতা হয়ে উঠেছে শোষণের হাতিয়ার। রজনী দৃষ্টিহীনা এবং লিঙ্গগত কারণে নারী হওয়ার জন্য নানাভাবে লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার শিকার। 'অন্ধ বধূ' কবিতাতেও একই বিষয় লক্ষ্য করা গেছে। 'দৃষ্টিদান' গল্পের কুমুর ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে। 'আততায়ী' গল্পের দিবাকর বন্ধু কৃত্তিবাসকে দৃষ্টিহীন বানিয়ে তার পত্নীকে আত্মসাৎ করে। তারাশঙ্করের *কান্না* উপন্যাসেও মানুষকে প্রতিবন্ধি বানিয়ে অর্থোপার্জনের প্রসঙ্গ আছে। 'আমোদ বোষ্টুমী' গল্পেও আমরা একই বিষয় লক্ষ্য করেছি। বিমল মিত্রের *শেষ পৃষ্ঠায়*

দেখুন উপন্যাসেও দেখা গেছে রাজনৈতিক সংঘর্ষে বকুলের দৃষ্টি ফিরিয়ে দেওয়ার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

তৃতীয়ত, দু'একটি উপন্যাসে লেখকরা প্রতিবন্ধকতা ও স্বাভাবিকতার প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেছেন। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের *তৃতীয় নয়ন* উপন্যাসে মিহিরের দৃষ্টি ফেরানোর চেষ্টার মধ্যে নায়িকা মিনতির যে আকুতি ধরা পড়েছে সেখানে দেখা যাচ্ছে সে সমাজকে দেখানোর জন্যই বেশী করে মিহিরের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিতে চায়। আবার *পূর্ণ অপূর্ণ* উপন্যাসে লেখক দেখিয়েছেন পূর্ণতা বা স্বাভাবিকতা ব্যক্তি ও সমাজনিরপেক্ষ হতে পারে না। মানুষের পূর্ণতার ধারণাটি যতখানি দার্শনিক ততখানি বাস্তবসম্মত নয়।

চতুর্থত, কোনো কোনো উপন্যাস ও ছোটগল্পে দেখা গেছে লেখকরা দৃষ্টিহীনতাকে বিশেষ প্রতীকী অর্থে ব্যবহার করেছেন। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের *তৃতীয় নয়ন* উপন্যাসে দেখা যায় পরনির্ভরতার অপর নাম তৃতীয় নয়ন। সমীর রক্ষিতের *অন্ধজন্মান্ধদের কথা অথবা একটি প্রেমের উপাখ্যান* উপন্যাসে অন্ধ হলো শাসককুল। মানুষ কেউ কামে কেউ প্রেমে, আবার কেউ ক্ষমতায় অন্ধ হয়ে আছে। জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্র সব যুগেরই শাসককুলের প্রতিনিধি।

পঞ্চমত, অধিকাংশ গল্প উপন্যাসে দৃষ্টিহীনদের ইন্দ্রিয়সচেতন অনুভূতির জগৎ গুরুত্ব পেয়েছে। *রজনী* উপন্যাসের রজনী, 'দৃষ্টিদান' গল্পের কুমু, 'তমসা' গল্পের পঙ্খে এবং *ভুবনপুরের হাট* উপন্যাসে নব ঠাকুর চরিত্রের মধ্যে আমরা তীব্র ইন্দ্রিয়সচেতনতার পরিচয় পাই। এই ইন্দ্রিয়সচেতনতা কিয়দাংশে অতিরঞ্জন হলেও বহুলাংশে বিজ্ঞানসম্মত। শরীরের যে অঙ্গটি বেশী ব্যবহার করা হয় তার সক্রিয়তা বৃদ্ধি বিজ্ঞানের দ্বারা সমর্থিত।

ষষ্ঠত, লেখকরা বহুক্ষেত্রে সমাজে প্রচলিত নানান মিথ ও অবৈজ্ঞানিক ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন যা সমাজমনস্কতার পরিপন্থী। যেমন, দৃষ্টিহীনরা সঙ্গীতে পারদর্শী কিম্বা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বিজ্ঞান এ জাতীয় ভ্রান্ত ধারণাকে সমর্থন করে না। তারাশঙ্কর

বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধিকাংশ গল্পেই আমরা লক্ষ্য করেছি তিনি সঙ্গীতবিদ্যার মিথকে ব্যবহার করেছেন। 'তমসা'র পঙ্খে, *কান্নার* জন, *ভুবনপুরের হাট* উপন্যাসে নবঠাকুর সঙ্গীতে পারদর্শী। অনিতা অগ্নিহোত্রঈ-র 'মাটির সুর গল্পেও আমরা একই বিষয় লক্ষ্য করতে পারি। সপ্তমত, কোনো কোনো গল্প ও উপন্যাসে লেখকরা একপেশে মনোভাব নিয়ে এ জাতীয় চরিত্র নির্মাণ করেছেন। বিমল করের 'জননী' গল্পের মেজদাদা দার্শনিক মনোভাবাপন্ন, বাইরের জগৎ তাকে বিচলিত করে না। আবার সোমেন চন্দের 'অন্ধ শ্রীবিলাসের অনেক দিনের একদিন' গল্পে শ্রীবিলাসকে অক্ষম ও ক্ষিধে ও কামনায় অন্ধ হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে যা অবৈজ্ঞানিক।

অষ্টমত, অধিকাংশ গল্প-উপন্যাসে দৃষ্টিহীনদের দুঃখদুর্দশা ও জীবন-যন্ত্রণার ছবি আঁকা হয়েছে বিষয়টি লেখকদের সমাজমনস্কতাকে নির্দেশ করে। *রজনী*, 'তমসা', 'নদী ও নারী', 'কবিপত্নী' ইত্যাদি তার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

নবমত, অধিকাংশ গল্প ও উপন্যাসে দৃষ্টিহীনদের আর্থ-সামাজিক বিবর্তনের বিষয়টি অনুপস্থিত। লেখকদের অনেকেই উত্তরণ অপেক্ষা উত্তরাধিকার এবং মর্যাদার পরিবর্তে সহানুভূতিকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। *অন্ধজন্মান্ধদের কথা অথবা একটি প্রেমের উপাখ্যানে* আমরা দেখেছি দৃষ্টিহীন পবন উত্তরাধিকার সূত্রে গান গেয়ে ভিক্ষাবৃত্তির পেশাকেই বেছে নিচ্ছে। তবে বর্তমানে কোনো-কোনো গল্প উপন্যাসে তীব্র সমাজমনস্কতা লক্ষ্য করা গেছে। সুবোধ ঘোষের 'চোখ গেলো' এবং নন্তু সরকারের 'আলোক অভিসারে' ও নীহাররঞ্জন গুপ্তের 'লালুভুলু' এই ধারায় উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত যেখানে দৃষ্টিহীনদের জীবনের লড়াই ও উত্তরণের কাহিনি তাদের সামাজিক মানুষ এবং প্রতিস্পর্ধী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে।

দশমত, অধিকাংশ গল্প-উপন্যাসে দৃষ্টিহীনদের জীবনের বিবাহকেন্দ্রীক সমস্যাকে দেখানো হয়েছে যা তাদের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্নকে উত্থাপন করে। বিজন ভট্টাচার্যের 'মরা

চাঁদ' নাটকেও একই বিষয় লক্ষ্য করা যায়। এখানে প্রতিবন্ধকতার শারীরিক প্রতিচ্ছবি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। একই সঙ্গে বিষয়টি প্রতিবন্ধকতার সামাজিক নির্মাণ তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করে। তবে বিগত দেড়শো বছরে সমাজে তাদের অবস্থানের কিছুটা পরিবর্তন ঘটলেও বাংলা সাহিত্যে তার প্রতিফলন বড়ো একটা দেখা যাচ্ছে না। অথচ সাহিত্য যেমন আমাদের বাস্তব সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করে তেমনই সম্ভাবনার পথেও কিছু দূর এগিয়ে নিয়ে যায়। আরো একটি বিষয় লক্ষ্য করার মতো প্রতিস্পর্ধী চরিত্র চিত্রণের ক্ষেত্রে সাহিত্যকারগণ যৌনতার প্রসঙ্গ উপেক্ষা করে গেছেন। যদিও যৌনতা মানব জীবনের একটি অপরিহার্য উপাদান। তবে সাম্প্রতিক কালের বাংলা সিনেমা তুলনামূলকভাবে কিছুটা এগিয়ে রয়েছে। ভবিষ্যতে দৃষ্টিহীনদের আর্থসামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বাংলাসাহিত্যেও তাদের অবস্থানের পরিবর্তন ঘটবে বলে আশা রাখি। সামান্য মাত্রায় হলেও সাহিত্য ও সিনেমায় সেই পরিবর্তনের চিহ্ন লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

প্রতিস্পর্ধীরা হলো বিশ্বের বৃহত্তম সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী। তাই সমাজে ও সাহিত্যে তাদের চেনবার সময় এসেছে। ছবিটা ক্রমশ বদলাচ্ছে। আরো বদল আসা প্রয়োজন। সমাজের সার্বিক উন্নয়নকে সুনিশ্চিত করার জন্য আমাদের এই বদলকে স্বাগত জানাতেই হবে। শুধুমাত্র পি.ডাবলু.ডি, আর.পিডির মতো আইন প্রণয়নই যথেষ্ট নয়। উক্ত আইনগুলি কার্যকর করার জন্য প্রয়োজন জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ এবং আইন ভঙ্গকারিকে সরাসরি শাস্তি দেওয়া। এ ব্যাপারে গণমাধ্যমগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। পাশাপাশি সমাজের নানান ক্ষেত্রে প্রতিস্পর্ধীবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে উদ্যোগ নিতে হবে। প্রতিস্পর্ধী সংগঠনগুলিকে অধিকার ও সুরক্ষার প্রশ্নে আরো সজাগ ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। যদিও একটি স্বতন্ত্র্য রাজনৈতিক সত্তা বা সামাজিক শ্রেণী হিসেবে প্রতিস্পর্ধীরা এখনও নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়নি

তবে সম্প্রদায় হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে কিছু দূর অগ্রসর হয়েছে যা তাদের নাগরিক অধিকার অর্জনের পথকে সুগম করেছে। তবে রাজনীতি ও সমাজের সর্বস্তরে প্রতিনিধিত্ব ছাড়া পূর্ণ নাগরিক ও সামাজিক মর্যাদা লাভ ঐতিহাসিকভাবে অসম্ভব।

সতর্কতা সত্ত্বেও ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতা এবং তথ্যের অপ্রতুলতার কারণে কিছু ভুল-ত্রুটি রয়ে গেল। তবে চেষ্টাটুকুই এই গবেষণার প্রাণ। আমাদের এই গবেষণা প্রতিস্পর্ধীকেন্দ্রীক সচেতনতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যদি বিন্দুমাত্র সহায়ক হয় তাহলে সমস্ত শ্রম সার্থক জ্ঞান করব। ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে নানা স্তরে কাজ করার ইচ্ছে রইল।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

আচার্য, অনিল (সম্পা)। *সত্তর দশক* (দ্বিতীয় খণ্ড)। অবভাস: কলকাতা। ১৯৭০।

আচার্য, অনিল (সম্পা)। *সত্তর দশক* (প্রথম খণ্ড)। অবভাস: কলকাতা। ১৯৬৬।

আচার্য, দেবেশ কুমার। *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস* (আধুনিক যুগ, ১৯৫০-২০০০)। ইউনাইটেড বুক এজেন্সি: কলকাতা। ২০১০।

কর, বিমল। *পূর্ণ অপূর্ণ*। আনন্দ পাবলিশার্স: কলকাতা। ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ।

গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ। *সাহিত্যে ছোটোগল্প* । মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লি: কলকাতা ১৪১৬ বঙ্গাব্দ।

গঙ্গোপাধ্যায়, পার্থজিৎ। *নির্বাচিত একশো গল্প* । সাহিত্যতীর্থ: কলকাতা। ২০০৪।

গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল (সংকলন ও সম্পাদনা)। *বাংলা গল্পসংকলন* (চতুর্থ খণ্ড)। সাহিত্য আকাডেমি: নতুন দিল্লি। ২০০৯।

গুপ্ত, ক্ষেত্র। *বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস* (তৃতীয় খণ্ড)। গ্রন্থনিলয়: কলকাতা। ১৯৫১।

গুপ্ত, নীহাররঞ্জন। *লালুভুলুও বাদশা*। মিত্র ঘোষ পাবলিশার্স: কলকাতা। ১৪১৮ বঙ্গাব্দ।

ঘোষ, তপোব্রত। *যে ভাবে বঙ্কিম পড়ি*। তবু প্রকাশনী: কলকাতা। ২০০৫।

ঘোষ, তপোব্রত। *রবীন্দ্র-ছোটোগল্পের শিল্পরূপ*। দে'জ পাবলিশিং: কলকাতা। ২০১০।

ঘোষ, বিশ্বজিৎ। *বাংলা কথাসাহিত্য পাঠ*। বাংলা আকাডেমি: ঢাকা। ২০০২।

ঘোষ, বিশ্বজিৎ। *বাংলাদেশের সাহিত্য*। আজকাল: ঢাকা। ২০০৯।

ঘোষ, সুবোধ। *গল্পসমগ্র ১*। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি.: কলকাতা। ১৯৯৪।

চক্রবর্তী (লাহিড়ী), ডঃ ভাস্বতী। *সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাংলা ছোটোগল্প* ১৯৪০-৫০। দে'জ পাবলিশিং: কলকাতা। ২০০৩।

চক্রবর্তী, রংগন। *বিষয় বিশ্বায়ন*। এবং আলাপ: কলকাতা। ২০০৫।

চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল। *সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*। রত্নাবলী: কলকাতা। ১৯৯৫।

চট্টোপাধ্যায়, তপনকুমার। *আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*। প্রজ্ঞাবিকাশ: কলকাতা। ২০১১।

চট্টোপাধ্যায়, পার্থ। ভদ্র, গৌতম। *নিম্নবর্গের ইতিহাস*। আনন্দ পাবলিশার্স: কলকাতা। ১৯৯৮।

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম। *বঙ্কিম রচনাবলী* প্রথম খণ্ড। কামিনী প্রকাশালয়: কলকাতা। ১৯৯১।

চন্দ, সোমেন। *মুহূর্ত কথা*। পারুল প্রকাশনী: কলকাতা। ২০২০।

চৌধুরী, জেসমীন, নাজমা। *বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি*। চিরায়ত প্রকাশনী: কলকাতা। ১৯৮৩।

চৌধুরী, ভূদেব। *ছোটোগল্পের কথা*। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমি: কলকাতা। ২০০০।

চৌধুরী, ভূদেব। *বাংলা সাহিত্যের ছোটোগল্প ও গল্পকার*। মডার্ন বুক এজেন্সী: কলকাতা। ২০১১।

জামান, সুলতানা সারয়াতারা। নন্দ, বিষ্ণুপদ। *ব্যতিক্রমধর্মী শিশু*। মাওলা ব্রাদার্স: ঢাকা। ২০০৫।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *আধুনিক সাহিত্য*। 'সঞ্জীবচন্দ্র'। বিশ্বভারতী প্রকাশনী: কলকাতা। ১৯৩৮।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *গল্পগুচ্ছ*। বিশ্বভারতী: কলকাতা। ১৩০৯।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *ছিন্ন পত্রাবলী*। বিশ্বভারতী: কলকাতা। ১৪১১।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *সঞ্চয়িতা*। বিশ্বভারতী: কলকাতা । ১৩৩৮।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *সহজ পাঠ দ্বিতীয় ভাগ, রবীন্দ্র রচনাবলী* পঞ্চদশ খণ্ড। বিশ্বভারতী: কলকাতা। ১৩৯৮।

ডেভিস, জে. লেনার্ড। *দ্য ডিজ্যাবিলিটিস স্টাডিস রিডার*। রুটলেজ টেলোর অ্যান্ড ফ্র্যান্সিস গ্রুপ: লন্ডন। ২০০৬।

দত্ত, বীরেন্দ্র। *বাংলা ছোটোগল্প: প্রসঙ্গ ও প্রকরণ* (প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড)। পুস্তকবিপণি: কলকাতা। ২০০৯।

দাস, শিশির কুমার। *বাংলা ছোটোগল্প* (১৮৭৩-১৯২৩)। দে'জ পাবলিশিং: কলকাতা। ২০০৭।

দে, বেলা। *বিশ্ববন্দিত প্রতিবন্ধী*। এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড: কলকাতা। ২০০৯।

দেবী, অনুরূপা। *মহানিশা*। মিত্রালয়: কলকাতা।১৯১৯।

নন্দ, বিষ্ণুপদ ও ঘোষ, সনৎ কুমার। *বিশেষ শিক্ষার ইতিহাস*। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়: কলকাতা। ২০০৯।

বক্সি, পাঁচুগোপাল। *মহাকাব্যে ও পুরাণে প্রতিবন্ধীচেতনা*। পুনশ্চ: কলকাতা, ২০০৮।

বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত কুমার। *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*। মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রা: লি: কলকাতা। ১৯৬৬।

বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর। *রচনাবলী, অষ্টাদশ খণ্ড, ভুবনপুরের হাট*। মিত্র ঘোষ পাবলিশার্স : কলকাতা। ১৩৭১।

বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর। রচনাবলী, *কান্না* । ১৩৭১।

বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ। *বিভূতিভূষণ রচনাবলী* (নবম খণ্ড)। মিত্র ও ঘোষ: কলকাতা। ১৪০৪।

বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক। *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র* চতুর্থ খণ্ড। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমি। ১৯৯৯।

বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক। *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র* তৃতীয় খণ্ড। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমি। ১৯৯৯।

বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক। *লেখকের কথা*। নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা. লি: কলকাতা । ১৯৫৭।

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার। *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*। মডার্ণ বুক এজেন্সী: কলকাতা। ২০১৯-২০২০।

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার। *রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা*। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী: কলকাতা। ২০১০।

বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ। *বাংলা উপন্যাস: দ্বান্দ্বিক দর্পণ*। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমি: কলকাতা। ১৯৯৬।

বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ। *বাংলা উপন্যাসে কালান্তর*। দে'জ পাবলিশিং: কলকাতা। ২০০৩।

বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ। *বঙ্গীয় শব্দকোষ* (প্রথম খণ্ড)। সাহিত্য আকাডেমি: নতুন দিল্লি। ২০০৪।

বলাইচাঁদ, মুখোপাধ্যায়। *রচনাবলী প্রথম খণ্ড*। গ্রন্থালয় প্রা: লি: কলকাতা। ১৯৭৩।

বসু, বুদ্ধদেব। *প্রবন্ধ সংকলন*। দে'জ পাবলিশিং: কলকাতা। ১৯৮৩।

ভট্টাচার্য, তপোধীর। *পড়ুয়ার ছোটোগল্প*। অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ: মেদিনীপুর। ২০০৫।

ভট্টাচার্য, ফাল্গুনী। *বাংলা সাহিত্যে প্রতিবন্ধী চরিত্র*। জনকল্যাণ পরিষদ: কলকাতা। ২০০৫।

ভট্টাচার্য, ফাল্গুনী। *সাহিত্য ও সিনেমায় প্রতিবন্ধী*। পরম্পরা: কলকাতা। ২০১১।

মজুমদার, মোহিতলাল। *বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ও বঙ্কিম বরণ*। করুণা প্রকাশনী: কলকাতা। ২০০৫।

মিত্র, অরুণ। *ফরাসী সাহিত্য প্রসঙ্গে*। প্রমা প্রকাশনী: কলকাতা। ২০০৫।

মুখোপাধ্যায়, অরুণ। *কালের পুত্তলিকা*। দে'জ পাবলিশিং: কলকাতা। ২০১০।

মুখোপাধ্যায়, অরুণ। *সাহিত্যসন্ধান*। সাহিত্যবিহার: কলকাতা। ১৯৮৮।

মুখোপাধ্যায়, তরুণ কুমার। *বাংলা কথাসাহিত্য-জিজ্ঞাসা*। দে'জ পাবলিশিং: কলকাতা। ২০০৪।

মুখোপাধ্যায়, ধ্রুবকুমার। *বাংলার সমাজ সংস্কৃতি ও নানা আন্দোলনের ইতিকথা*। প্রজ্ঞাবিকাশ: কলকাতা বইমেলা। ২০২০।

মুখোপাধ্যায়, রামকুমার (সংকলন ও সম্পা)। *কথাযাত্রা: বাংলা গল্প সংকলন*। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়া: নয়া দিল্লি। ২০১০।

রক্ষিত, সমীর। *অন্ধ জন্মান্ধদের কথা অথবা একটি প্রেমের উপাখ্যান*। একুশ শতক: কলকাতা। ২০১৬।

রহমান, মোঃ মুস্তাফিজুর। *বাংলাদেশের ছোটোগল্পে মধ্যবিত্ত জীবনের রূপায়ণ* (১৯৪৭-৯০)। বাংলা আকাডেমী: ঢাকা। ২০০৯।

রায়, অলোক (সম্পা)। *সাহিত্যকোষ: কথাসাহিত্য*। সাহিত্যলোক: কলকাতা। ২০১০।

রায়, অলোক। *কথাসাহিত্য জিজ্ঞাসা*। সাহিত্যলোক: কলকাতা। ১৯৯২।

রায়, অলোক। *বিশ শতক*। প্রমা প্রকাশনী: কলকাতা। ২০১০।

রায়, সত্যজিৎ। *ফেলুদা সমগ্র* ২। আনন্দ পাবলিশার্স: কলকাতা। ২০১৫।

রাহা, দিলীপ। *পথ দেখালো যারা*। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম ব্লাইণ্ড বয়েজ আকাডেমি: কলকাতা। ১৯৮২।

সরকার, নন্তু। *আলোক অভিসারে*। তরুণ প্রেস: কলকাতা। ১৯৯৪।

সরকার, নন্তু। *ঝিনুক থেকে মুক্ত*। তরুণ প্রেস: কলকাতা। ১৯৯৪।

সাধারণ সম্পাদক (সম্পা)। স্বামী বিবেকানন্দ জীবন ও বাণী। রামকৃষ্ণ মিশন ও রামকৃষ্ণ মঠ বেলুড় মঠ: কলকাতা। ২০১৯।

সান্যাল, অবন্তীকুমার। *মোপাসাঁর ছোটোগল্প*। প্রমা প্রকাশনী: কলকাতা। ২০০২।

সান্যাল, নারায়ণ। *নীলিমায় নীল*। দে'জ পাবলিশিং: কলকাতা। ২০১৮।

সিকদার, অশ্রুকুমার (সংকলন ও সম্পাদনা)। *বাংলা গল্প সংকলন* (তৃতীয় খণ্ড)। সাহিত্য আকাদেমি: নতুন দিল্লি। ২০০৬।

সেন, সুকুমার। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (চতুর্থ খণ্ড)। আনন্দ পাবলিশার্স: কলকাতা। ২০০৫।

সেন, সুকুমার। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (তৃতীয় খণ্ড)। আনন্দ পাবলিশার্স: কলকাতা। ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ।

সেন, সুকুমার। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (পঞ্চম খণ্ড)। আনন্দ পাবলিশার্স: কলকাতা। ১৯৭৬।

সেনগুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার। *রচনাবলী* চতুর্থ খণ্ড। গ্রন্থালয় প্রা: লি: কলকাতা। ১৯৭৭।

স্বামী, সুপর্ণানন্দ। *আমার ভারত অমর ভারত*। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্ক: কলকাতা। ১৯৮৬।

হক, হাসান আজিজুল (প্রধান সম্পা)। *অসীমান্তিক*। অক্ষর: আগরতলা। ১৯৯৮।

হক, হাসান আজিজুল। *কথাসাহিত্যের কথকতা*। সাহিত্য প্রকাশ: ঢাকা। ২০১০।

হোসেন, দিলওয়ার (সংগ্রহ ও সম্পা)। *মোহাম্মদী পত্রিকায় মুসলিম সমাজ*। বাংলা আকাডেমী: ঢাকা। ১৯৯৪।

বৈদ্যুতিন উৎস

প্রতিবন্ধী উইকিপিডিয়া
http://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%80

'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন', বাংলাদেশ, ২০১৩।
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_pdf_part.php?id=1126

ইপসা: প্রমোটিং রাইটস্ ফর পারসন উইথ ডিজএ্যাবিলিটি (পিআরপিডি)

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_pdf_part.php?id=1126 জাতীয় ই-তথ্যকোষ: জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউণ্ডেশনের তথ্যাবলী

সমকাল: 'প্রতিবন্ধী শব্দটাই যখন প্রতিবন্ধক' http://www.samakal.net/2014/04/20/49836

BBC বাংলা: প্রতিবন্ধী শিশুদের ব্যাপারে কতটা যত্নবান বাংলাদেশ
http://www.bbc.co.uk/bengali/news/2013/05/130530_mh_unifcef.shtml

BBC বাংলা: প্রতিবন্ধী শিশুরা এখনো বৈষম্যের শিকার
http://www.bbc.co.uk/bengali/multimedia/2013/06/130623_mk_bangladesh_disable_shildren_unicef.shtml

'বাঁধ ভাঙার আওয়াজ: আইনস্টাইন, নিউটন কি প্রতিবন্ধী ছিলেন?'
http://m.somewhereinblog.net/blog/scientificbdblog/28773461

পত্র-পত্রিকা

নন্দ, বিষ্ণুপদ (সম্পাদক) *'প্রতিস্পর্ধী'* কলকাতা।

স্ফুরণ', পশ্চিমবঙ্গ প্রতিবন্ধী আধিকারিক। কলকাতা।

স্পর্শনন্দন পত্রিকা, কলকাতা।

শ্রুতিকল্প পত্রিকা, কলকাতা।

সূর্যমুখী পত্রিকা, কলকাতা।

ইণ্টারন্যাশনাল জার্নাল ফর স্পেশাল নিড অ্যান্ড রিহাবলিটেশন, কলকাতা।

সাক্ষাৎকার

দৈবকি মণ্ডল, অধ্যাপিকা রামপুরহাট কলেজ। ১০ অক্টোবর, ২০১৯।

আসিফউজ্জামান, শিক্ষক, ভরতপুর উচ্চ বিদ্যালয়, মুর্শিদাবাদ। ৮ অক্টোবর, ২০১৯।

সুরজিত বিশ্বাস, শিক্ষক, আমডাঙা উচ্চ বিদ্যালয়, উত্তর ২৪ পরগণা। ১৫ অক্টোবর, ২০১৯।

অধ্যাপক বিষ্ণুপদ নন্দ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা-বিজ্ঞান বিভাগ। ১৩ অক্টোবর, ২০২০।

অধ্যাপক মনোজিত মণ্ডল, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ইংরেজি বিভাগ। ১২ অক্টোবর, ২০২০।

সৈকত কর, সহসম্পাদক, শ্রুতিকল্প পত্রিকা। ১৭ অক্টোবর, ২০২০।

তারক হালদার, সহসম্পাদক, সূর্যমুখী পত্রিকা। ১৮ অক্টোবর, ২০২০।

সুভাষ দে, নাট্যপরিচালক, 'অন্যদেশ'। ১৯ অক্টোবর, ২০২০।

চন্দন মাইতি, ভিক্যাব সম্পাদক। ১৫ অক্টোবর, ২০২০।

সত্যজিত মণ্ডল, সম্পাদক, *স্পর্শনন্দন* পত্রিকা। ১৭ জুন, ২০১৯।

শ্রী বিশ্বজিৎ ঘোষ, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন ব্লাইণ্ড বয়েজ অ্যাকাডেমির অধ্যক্ষ। ২৫ জানুয়ারি, ২০১৯।

নারায়ণ গাঙ্গুলি, ব্লাইণ্ড পার্সন অ্যাসোসিয়েসনের সভাপতি। ৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯।

অমিয়বাবু, ব্লাইণ্ড পার্সন অ্যাসোসিয়েসনের অন্য সভ্য। ২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯।

কৌশিক গাঙ্গুলী, চিত্র পরিচালক, ২০ সেপ্টেম্বর,২০১৯।

অধ্যাপক ফাল্গুনী ভট্টাচার্য, বোলপুর, ১৫ আগস্ট.২০২০।

অভিধান

বিশ্বাস শৈলেন্দ্র সম্পা, সংসদ বাংলা অভিধান, সাহিত্য সংসদ: কলকাতা। ২০০৫।